বাংলাদেশের কালচার

আবুল মনসুর আহমদ

www.pathagar.com

বাংলাদেশের কালচার

আবুল মনসুর আহমদ

আহমদ পাবলিশিং হাউস

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রকাশক | মেছবাহউদ্দীন আহমদ
আহমদ পাবলিশিং হাউস
৬৬ প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রথম সংস্করণ | অক্টোবর ১৯৬৬
কার্তিক ১৩৭৩

সপ্তম মুদ্রণ | অক্টোবর ২০১১
আশ্বিন ১৪১৮

প্রচ্ছদ | কালাম মাহমুদ

কম্পিউটার কম্পোজ | ইয়াশা কম্পিউটার
২০ পি কে রায় লেন, বাবুবাজার, ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ | বেলাল অফসেট প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স
৭নং পি, কে, রায় লেন, (বাবুবাজার) ঢাকা-১১০০

মূল্য | **একশত আশি টাকা মাত্র**

BANGLADESH CULTURE—by Abul Mansur Ahmed, Published by Ahmed Publishing House, Dhaka-1100. First Edition : October 1966 & Seventh Edition : October 2011

Price : ***Tk. 180.00 Only.***

ISBN 984-11-0381-6

www.pathagar.com

লেখকের কৈফিয়ত

'পাক-বাংলার কালচার' বইটির নাম বদলাইয়া 'বাংলাদেশের কালচার' রাখিলাম। অভাবতঃ ও স্বভাবতঃই। 'পাক-বাংলা কথাটা' কোনও গুণ-বাচক শব্দ না। পরিচিতি-বাচক মাত্র। আগে পাক-বাংলা বলিতে যে ভূখণ্ড বুঝাইত, সেই ভূখণ্ডেরই বর্তমান নাম বাংলাদেশ। এ দেশ আজ একটা স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। রাষ্ট্রিক-কৃষ্টিক ও আর্থিক সকল বিষয়ে তার পরিচিতি ও এলাকা স্বকীয়তায় সুনির্দিষ্ট। এদেশের কালচার সম্পর্কে লেখা বইএর নাম, সুতরাং, দেশের নাম অনুসারেই হইবে প্রয়োজনের স্বাভাবিক কারণেই।

তেমনি আগের নামটাও ছিল স্বাভাবিক কারণেই। স্বাধীন হইবার আগে এ দেশের রাষ্ট্র নাম ছিল পূর্ব-পাকিস্তান। পাকিস্তানের একটা প্রদেশ মাত্র। আমাদের মতে তখনও এই ভূখণ্ডের নাম হওয়া উচিৎ ছিল বেংগল বা বাংলা। কমপক্ষে বেংগল (পি) বা পাক-বাংলা। কোনও এক ভূখণ্ড দুইভাগে ভাগ হইলে বৃহত্তর ভাগই পূর্বনামের ওয়ারিস হইয়া থাকে। ভারতবর্ষ বাটোয়ারার বেলা ভারত ইউনিয়নই পূর্ব নাম 'ইণ্ডিয়ার' ওয়ারিস হইয়াছিল। সেই নীতি অনুসারে বেংগল বাটোয়ারার সময়ও ঐ নামের ওয়ারিস আমরাই ছিলাম। কিন্তু আমাদের তৎকালীন গার্ডিয়ানরা তা চান নাই।

দ্বিতীয়তঃ বাংলা বাটোয়ারা হওয়ার সময় পাঞ্জাবও বাটোয়ারা হইয়াছিল। কিন্তু বাটোয়ারা দলিলে আমাদের পূর্ব-বাংলার মতই ওটাকেও 'পশ্চিম পাঞ্জাব' লেখা হওয়া সত্ত্বেও পাকিস্তানের নেতারা ওটাকে প্রথমে পাঞ্জাব (পি) মানে পাক-পাঞ্জাব বলিতেন। এখন অবশ্য শুধু 'পাঞ্জাব' বলিয়া থাকেন। ভারতও তাদের অংশকে প্রথমে পাঞ্জাব (আই) বলিতেন। অখন শুধু 'পাঞ্জাব' বলেন।

এ অবস্থায় আমাদের দেশকে রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে 'পূর্ব-পাকিস্তান' লিখিতে বাধ্য থাকা সত্ত্বেও কৃষ্টি-সাহিত্যিক ব্যাপারে আমরা 'পাক-বাংলা' বলিতেই যিদ করিতাম। কারণ বাংলাদেশ এমন একটা নাম-গোত্র-ঐতিহ্য-ইতিহাসহীন জনপদ নয় যে অপরের রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে যে-কোনও নাম গ্রহণ করিতে পারে।

নতুন নামের এই বই এ দুইটি নয়া প্রবন্ধ যোজনা করিয়াছি। দুইটিই স্বাধীনতার পরের লেখা। কাজেই তাতে বাংলাদেশ শব্দটা ব্যবহার করা হইয়াছে। পক্ষান্তরে আগের প্রবন্ধগুলিতে পাক-বাংলা শব্দটাই বজায় রাখা হইয়াছে। তাতে লেখাগুলির মর্মের দিক হইতে একসংগে দুইটা উদ্দেশ্য সফল হইবে। এক. প্রবন্ধগুলির শেষে উল্লিখিত রচনার সময়-কালের সাথে বক্তব্যের সংগতি থাকিবে। দুই. বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর এর কালচারেল স্বকীয়তা ও স্বাধীনতার যে প্রাণ ও রূপ দৃশ্যমান, পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় অংগরাজ্য হিসেবেও অবিকল তাই ছিল। কেউ দেখিয়াছেন, কেউ দেখেন নাই।

১লা ফাল্গুন
১৩৮০

আরজ গোজার
আবুল মনসুর আহমদ

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বাংলাদেশের কালচার	৯	—	৪০
সাহিত্যের প্রাণ, রূপ ও আংগিক	৪০	—	৬৯
ভাষা আন্দোলনের মর্মকথা	৭০	—	৯২
পাক-বাংলার রেনেসাঁ	৯৩	—	১০৪
শিক্ষার মিডিয়াম	১০৫	—	১১৬
আনন্দের জোয়ার ঈদুল ফিতর	১১৭	—	১২৩
আমার স্বপ্নের শহীদ মিনার	১২৪	—	১২৭
আমাদের ভাষা	১২৮	—	১৩৯
বাংলাদেশের কৃষ্টিক পটভূমি	১৪০	—	১৫০
বাংলাদেশের জাতীয় আত্মা	১৫১	—	১৬২

www.pathagar.com

বাংলাদেশের কালচার

কালচার কি?

আমাদের কালচারের কথা জানিতে হইলে আগে বুঝিতে হইবে কালচারটা কি? কালচারের প্রতিশব্দরূপে আমরা সাধারণত 'কৃষ্টি', 'সংস্কৃতি', 'তহ্যিব' ও 'তমদ্দুন' শব্দগুলি ব্যবহার করিয়া থাকি। ধাতুগত অর্থের দিক হইতে বিচার করিলে কিন্তু এর একটাও কালচারের প্রতিশব্দরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে না। তবে 'কৃষ্টি' শব্দটা কর্ষণ, কালটিভেশন বা চাষ অর্থে কালচারের পরিভাষারূপে ব্যবহার করা হয় বলিয়া অন্য দুইটি শব্দের চেয়ে এইটাই কালচারের বেশি কাছাকাছি–ইংরেজীতে যাকে বলা হয় রিফাইনমেন্ট, আরবীতে যাকে তাহযিব বলা হয়, সংস্কৃতি শব্দটা সেই অর্থে ব্যবহার করা যাইতে পারে। তমদ্দুন শব্দটা নাগরিক অর্থে কালচার অপেক্ষা সিভিলিযেশনের প্রতিশব্দ-রূপেই অধিকতর উপযোগী।

কিন্তু এসব বিতণ্ডা নিরর্থক। কারণ, খোদ কালচারের অর্থ লইয়াই ইংরাজী সাহিত্য এবং ইউরোপ ও আমেরিকার পণ্ডিতদের মধ্যে ঘোরতর মত-বিরোধ রহিয়াছে। সে মত-বিরোধ এত তীব্র যে বাংলায় আমরা ঐ তিনটি শব্দের যে-কোনও একটিকে স্বচ্ছন্দে কালচারের প্রতিশব্দরূপেই বেদেরেগ ব্যবহার করিতে পারি।

কালচারের সংজ্ঞা দেওয়া খুবই কঠিন। এত কঠিন যে উনিশ শতকের মধ্যভাগ হইতে বিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত পুরা একশ বছরের দীর্ঘ মুদ্দতে ইউরোপ-আমেরিকার দুইজন পণ্ডিতও এ ব্যাপারে একমত হইতে পারেন নাই। তার উপর অনেকেই আবার কালচার ও সিভিলিযেশনকে একই অর্থে ব্যবহার করিয়া বিষয়টাকে আরও জটিল ও সমস্যাটাকে আরও ঘোরালো করিয়া ফেলিয়াছেন। ফলে অবস্থা এই দাঁড়াইয়াছে যে, কালচারকে ডিফাইন করার আর কোনও উপায় নাই; বিশ্লেষণ দ্বারাই উহাকে বুঝিতে হইবে।

ইংরাজী সাহিত্যে কালচার শব্দটা প্রথম আমদানি করেন ফ্রান্সিস্ বেকন ষোল শতকের শেষদিকে। উহাকে ডিফাইন করার চেষ্টা করেন সর্বপ্রথম ম্যাথু আর্নল্ড ইংলণ্ডে এবং ওয়াল্ডু ইমার্সন আমেরিকায় উনিশ শতকের মাঝামাঝি; কিন্তু কালচার শব্দের যে অর্থে তাঁরা উহার সংজ্ঞা দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছিলেন শব্দটা বেশিদিন সে অর্থে সীমাবদ্ধ থাকে নাই। বিশ শতকের মাঝামাঝি রবার্ট এযরা পার্ক ও টেইলার প্রভৃতি মার্কিন পণ্ডিত এবং টার্নার ও লাস্কি প্রভৃতি ইংরাজ পণ্ডিতগণের লেখায় কালচার শব্দটা অনেক ব্যাপক ও গভীর অর্থে ব্যবহৃত হইতে শুরু করে। এর ফলে শব্দটা নতুন তাৎপর্য গ্রহণ করে। কিন্তু তাতে সমস্যা মিটে নাই। বরঞ্চ শব্দটা

www.pathagar.com

ব্যাপকতর ও গভীর হইয়াছে। সম্প্রতি পশ্চিমা সাহিত্যে 'কালচার' শব্দটা আরও ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হইতে শুরু করিয়াছে। সেখানে 'পলিটিক্যাল কালচার', 'এথিক্যাল কালচার', এসৃথেটিক কালচার', 'রিলিজিয়াস কালচার' ইত্যাদি কথার প্রচলন হইয়াছে। এসব কথা কিন্তু 'এগ্রিকালচার', 'হটি কালচার' বা 'ব্লাড কালচার' ইত্যাদি টার্মের মত অকৃষ্টিক কোন বিশেষ বিষয় বা বস্তু-জ্ঞাপক নয়। বরঞ্চ মানুষের মন ও মস্তিষ্ক বিকাশের বিশেষ স্তর-বোধক। তার মানে, কোনও সমাজ বা জাতির মনে কোনও এক ব্যাপারে একটা স্ট্যাণ্ডার্ড ব্যবহার-বিধি, মোটামুটি সার্বজনীন চরিত্র, ক্যারেক্টার, আচরণ বা আখলাকের রূপ ধারণ করিলেই সেটাকে ঐ ব্যাপারে ঐ মানবগোষ্ঠীর কালচার বলা হইয়া থাকে। এ অবস্থায় আজিকার পরিবেশে কালচার সিভিলিযেশনের সীমা-সরহদ্দ ঠিক রাখা এখন খুবই কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। তবু কালচার ও সিভিলিযেশন যে এক নয়, সেটা আমাদের বুঝিতে হইবে। সভ্য জগতের মনীষীরাও সে চেষ্টা করিতেছেন। কারণ এটা যুগের দাবি। জ্ঞান-বিজ্ঞানের ব্যাপ্তি ও যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রসারের দ্বারা দুনিয়াটা যতই ছোট হইতেছে, কালচারের অটনমির প্রয়োজনীয়তা ততই তীব্রভাবে অনুভূত হইতেছে। ফলে কালচার ও সিভিলিযেশনের সীমা নির্ধারণ অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। এ সীমা নির্ধারণ ডেফিনিশন দ্বারা সম্ভব নয়—বিশ্লেষণ দ্বারাই তা করিতে হইবে। এখানে সে চেষ্টাই আমি করিতেছি।

কালচার বনাম সিভিলিযেশন

সহজ কথায় ব্যষ্টি বা ইণ্ডিভিজুয়্যালের যা ব্যক্তিত্ব বা পার্সন্যালিটি, সমষ্টি বা কমিউনিটির তা-ই কালচার। আমরা যখন কোন একজন লোক সম্বন্ধে বলি : 'লোকটার পার্সন্যালিটি আছে', তখন আমরা সেই লোকটির এমন কতকগুলি গুণ-সমষ্টির দিকে ইশারা করি, যেগুলি ঐকান্তিকভাবে তার নিজস্ব এবং যারা দ্বারা সে অপর সাধারণ হইতে পৃথক। অথচ ঐ গুণ-সমষ্টি বা পার্সন্যালিটি ঐ লোকটির বিশেষত্ব নয়। কারণ পার্সন্যালিটি আরও অনেক লোকের আছে। পার্থক্য শুধু এই যে, সকলের পার্সন্যালিটি রূপে-গুণে এক নয়। ব্যক্তিত্বে-ব্যক্তিত্বে সুস্পষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে। এ পার্থক্যের দ্বারাই তাদেরে চিনা যায়। ঐ পার্থক্যটুকুই তাদের নিজস্বতা। নিজস্বতাই ঐ পার্থক্যের প্রাণ। ঐটুকুই ব্যক্তিত্ব।

ঠিক তেমনি, সকল লোক-সমষ্টিরই অর্থাৎ সব কমিউনিটি সমাজ বা জাতিরই একটা নিজস্ব সমবেত ব্যক্তিত্ব বা কর্পোরেট পার্সন্যালিটি আছে। তারই নাম ঐ লোক-সমষ্টি বা কমিউনিটির কালচার। এই লোক-সমষ্টি বা কমিউনিটিকে আমরা অবস্থা-ভেদে জাতি বা ন্যাশন, উপজাতি বা ন্যাশন্যালিটি, সমাজ বা সোসাইটি, এমন কি পরিবার বা ফ্যামিলি বলিতে পারি বলিয়া থাকি।

জাতি বা ন্যাশন শব্দটা ইদানিং বেশির ভাগ রাষ্ট্রীয় অর্থেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। নৃতাত্ত্বিক এথ্নিক্যাল বা র‍্যাশিয়াল অর্থে ততটা নয়। ধর্মীয় অর্থে ত নয়ই। একটি রাষ্ট্রের সব নাগরিক মিলিয়াই ন্যাশন বা রাষ্ট্রীয় জাতি, নৃতত্ত্ব, ধর্ম ও ভাষার দিক দিয়া এক না হইলেও। যেমন আমরা বাংলাদেশীরা এক রাষ্ট্রীয় জাতি বা ন্যাশন, যদিও নৃতত্ত্ব ধর্ম ও ভাষার দিক হইতে আমরা এক নই। অপর দিকে, রাষ্ট্রের নাগরিক না হইলে নৃতত্ত্ব ধর্ম ও ভাষার দিক হইতে এক গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের লোক হইয়াও এক

www.pathagar.com

ন্যাশন হয় না। যেমন পশ্চিম বাংলার লোকেরা ভাষা ও নৃতত্ত্বের দিক হইতে আমাদেরা গোষ্ঠী ও সমাজের লোক হইয়াও আমাদের সাথে এক জাতি বা ন্যাশন নয় এবং ভারতীয় মুসলমানেরা ধর্ম নৃতত্ত্ব ও ভাষার দিক হইতে এক গোষ্ঠী এক সমাজের লোক হইয়াও আমাদের ন্যাশনের লোক নয়।

কিন্তু এই রাষ্ট্রীয় জাতির পার্সন্যালিটি অর্থাৎ কালচার এক নাও হইতে পারে। একই ন্যাশনের ভিতরে একাধিক ন্যাশনালিটি থাকিতে পারে। তৎকালীন যেমন পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের লোকেরা একই রাষ্ট্রীয় ন্যাশনের অন্তর্ভুক্ত হইয়াও পৃথক ও স্বতন্ত্র ন্যাশনালিটি এবং পৃথক ও স্বতন্ত্র কর্পোরেট পার্সন্যালিটির অধিকারী ছিল। দুই অঞ্চলের কালচারও তাই স্বতন্ত্র ছিল।

কালচার ও সিভিলিযেশনের পার্থক্য

এইখানেই আমরা সভ্যতা বা সিভিলিযেশন হইতে কৃষ্টি বা কালচারকে আলাদা করিয়া দেখিবার মতো আলোর সন্ধান পাই। আগেই বলিয়াছি, কালচার আমাদের কর্পোরেট পার্সন্যালিটি বা সমবেত ব্যক্তিত্ব। এইবার আরেকটু সহজ করিয়া বলি-কালচার আমাদের সামাজিক আমিত্ব। আমরা যা আছি তা-ই কালচার। পক্ষান্তরে সভ্যতাটা কি? কালচারকে মানুষের ব্যক্তিত্বের সাথে তুলনা করিলে সিভিলিযেশনকে মানুষের সম্পদের সাথে তুলনা করা যায়। অর্থাৎ আমাদের যা আছে, তাই আমাদের সিভিলিযেশন। কথাটার আরও একটু তফ্‌সির করা দরকার। 'আমরা যা আছি' ও 'আমাদের যা আছে' কথা দুইটির মধ্যে যে মৌলিক প্রভেদ আছে, সেদিকে আমাদের নযর দেওয়া উচিত। কাজটা বেশি কঠিন নয়। আমার আমিত্ব ও আমার সম্পত্তির মধ্যে যে পার্থক্য সুস্পষ্ট, তা মনে রাখিলেই কালচারটা বোঝার কাজ সহজ হইবে। এই দিক হইতে একটু তলাইয়া বিচার করিলে এটাও স্পষ্ট হইয়া আসিবে যে, এই কারণেই এক জাতির একাধিক কালচার থাকিতে পারে বটে, কিন্তু একাধিক সিভিলিযেশন থাকিতে পারে না। অপর দিকে তেমনি বহু জাতির এক সিভিলিযেশন থাকিতে পারে বটে, কিন্তু এক কালচার থাকিতে পারে না। কারণ কালচারের নিজস্বতা বা জাতীয় বা জাতীয় রূপ থাকিতেই হইবে; পক্ষান্তরে সিভিলিযেশনের কোন জাতীয় রূপ থাকিতে পারে না। একটা দৃষ্টান্ত দিয়া কথাটা বুঝাইবার চেষ্টা করিব :

আমরা যখন মিসরীয়, আসিরীয়, ব্যাবিলনীয়, আর্য, গ্রীক, রোমান আরব বা চীনা সভ্যতার কথা বলি, তখন কোন ভৌগোলিক দেশের বা রাষ্ট্রীয় জাতির সভ্যতার কথা বুঝাই না—বুঝাই একটা যুগের সভ্যতা। শিক্ষা-দীক্ষায় জ্ঞান-বিজ্ঞানে, দর্শন-সাহিত্যে, শিল্প-বাণিজ্যে, কলা-কারিগরিতে মানুষের সামগ্রিক অগ্রগতির নামই সভ্যতা। মানবমনের ক্রমবিকাশের ইহা নিদর্শন। সে কারণে গভীরতা ও ব্যাপ্তিতে প্রসার লাভ সভ্যতার স্বভাব। বনের আগুনের মতো নিজের আলোকে ও দাহিকা শক্তিতে বিস্তার লাভই ইহার অন্তর্নিহিত জীবনী শক্তি। আগুন যেমন ইন্ধন হইতে ইন্ধনান্তরে ছড়াইয়া পড়ে, সভ্যতাও তেমনি জাতি হইতে জাত্যন্তরে ছড়াইয়া পড়ে। জ্ঞান যেমন শিক্ষক হইতে আরও বড় হইয়া ছাত্রের মধ্যে বিকশিত হয়, সভ্যতাও তেমনি শিক্ষক-জাতি হইতে শিষ্য-জাতিতে অধিকতর উন্নত ও প্রসারিত হয়। সভ্যতা ক্রমবিকাশমান। জ্ঞানের মতোই সে অক্ষয়, আগুনের মতই সে অনির্বাণ। কাজেই অতীতের ঐ সব সভ্যতার সাথে কোন একটা বিশেষ মানব-গোষ্ঠীর নাম সংযুক্ত

www.pathagar.com

থাকার অর্থ এই নয় যে, ঐ ঐ সভ্যতা শুধু ঐ ঐ মানব-গোষ্ঠীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। বস্তুত ঐ সব সভ্যতার ফল ঐ ঐ মানব-গোষ্ঠীর বাহিরের লোকেরাও ভোগ করিয়াছিল। প্রদীপ যার আংগিনাতেই জ্বলুক, পথচারীও সে আলোকের সুবিধা ভোগ করিবে।

একেবারে ঘরের কাছের নযির লওয়া যাক। বর্তমান যুগের সভ্যতাকে আমরা কিছুদিন আগে পর্যন্ত ইউরোপীয় সভ্যতা বলিতাম। ঐ সভ্যতার নেতৃত্ব এখন আমেরিকার হাতে চলিয়া যাওয়ায় উহাকে আমরা এখন ওয়েস্টার্ন সিভিলিযেশন বা পশ্চিমা সভ্যতা বলিয়া থাকি। মানব জীবনের সকল ক্ষেত্রে এই সভ্যতা অচিন্তনীয় উন্নতি বিধান করিয়াছে। পাকা রাস্তা, মোটরগাড়ী, রেলগাড়ী, হাওয়াই জাহাজ, পোস্ট-টেলিগ্রাম, টেলিফোন, রেডিও-টেলিভিশন ইত্যাদি যোগাযোগ ব্যবস্থায়, ক্যামেরা, মুভি ক্যামেরা, টেক্‌নিকালার, থ্রি ডাইমেনশন, মঞ্চ ও পর্দা ইত্যাদি চারুশিল্পে, রোটারি মেশিন, লাইনোটাইপ, মনোটাইপ ইত্যাদি। জ্ঞান ও শিক্ষা বিস্তারের সাজ-সরঞ্জামের আবিষ্কারে, শিল্প-সাহিত্যের উন্নতিতে, ইঞ্জেকশন-অপারেশন, রেডিওজলি, কার্ডিওলজি প্রভৃতি চিকিৎসা প্রণালীতে, স্টিলফ্রেমের শতাধিক তলার আকাশ-চুম্বী ইমারতে উঠানামার জন্য লিফট-এস্কেলেটোর স্থাপনায়, বিদ্যুৎ ও এটম শক্তিকে মানবের সেবায় নিযুক্তিতে, শূন্যলোকে গ্রহ-উপগ্রহ পরিভ্রমণের বাস্তব আয়োজনের সাফল্যে মানব-মনের যে অভাবনীয় বিকাশ লাভ ঘটিয়াছে এবং ফলে মানুষের বৈষয়িক জীবনে যে সব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এবং তাদের নৈতিক জীবনে যে উন্নতি (অথবা যদি বলিতে চান অবনতি) হইয়াছে, তার সামগ্রিক নামই বর্তমান যুগের সভ্যতা।—পশ্চিমা জাতিসমূহ এই সভ্যতার স্রষ্টা বলিয়া এর নাম পশ্চিমা সভ্যতা। কিন্তু তাই বলিয়া এই সভ্যতার ফল কি আমরা পূরবীরাও ভোগ করিতেছি না? পশ্চিমাদের আবিষ্কৃত যন্ত্রাদি ও তাদের তৈরী জিনিস-পত্র ব্যবহার করিয়াই শুধু আমরা সন্তুষ্ট থাকিতেছি না। নিজেরাও সে সব তৈরী করিতেছি। জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, আর্টে-সাহিত্যে, শিল্প-বাণিজ্যে, আমরা পশ্চিমাদের সমান ও মতন হইবার চেষ্টা করিতেছি। স্বয়ং পশ্চিমারাও আমাদের সব শিখাইবার ও আমাদের মান উন্নত করিবার জন্য সযত্নে ও সাগ্রহে চেষ্টা করিতেছে। ফলে এই সভ্যতার সুযোগ ও সুবিধা পশ্চিমাদের মতোই আমরাও ভোগ ও ব্যবহার করিতে পারিতেছি। যে যে পরিমাণে তা পারিতেছে, তার জীবনের মান ও মনের দিগন্ত সেই পরিমাণে উন্নত ও প্রসারিত হইতেছে। সেই হেতু ও সেই পরিমাণে দেশ ও জাতি-নির্বিশেষে গোটা দুনিয়ার মানুষ বর্তমান সভ্যতার অংশীদার। কাজেই পশ্চিমা সভ্যতাটা নামে পশ্চিমা ও অবদানে ইউরোপ-মার্কিন হইলেও আসলে এটা কোন এক জাতির বা জাতি-সমষ্টির সভ্যতা নয়, বর্তমান যুগের সভ্যতা। এইভাবে সভ্যতাটা আসলে যুগেরই বৈশিষ্ট্য কোন জাতি বা দেশের বৈশিষ্ট্য নয়। বর্তমান যুগের সভ্যতা সম্বন্ধে যা সত্য, অতীতের সভ্যতা সমূহ সম্বন্ধেও তা-ই সত্য ছিল।

কালচারের ধারক পাড়াগাঁ

কিন্তু কৃষ্টি সম্বন্ধে এ কথা বলা যাইতে পারে না। আগেই বলিয়াছি, কৃষ্টি সামাজিক ব্যক্তিত্ব। সামাজিকতা পল্লী-জীবনের বৈশিষ্ট্য। এই দিক হইতে কালচারের

www.pathagar.com

ধারক ও বাহক পল্লীগ্রাম। শহরে সামাজিক জীবনের অভাব। সেখানে প্রতিবেশিত্ব গড়িয়া উঠিতে পারে না। শহরের বাসিন্দাদের অধিকাংশই ভাসমান জনতা। আজ এ এখানে, কাল ও ওখানে। কারণ ব্যবসা-বাণিজ্য ও চাকরি-বাকরির সমাবেশ হইতেই শহরের পত্তন ও প্রসার। তাতে নিত্য-নূতন লোকের আমদানি। পুরাতনের রফতানি। ওদের মধ্যে প্রতিবেশিত্ব গড়িয়া উঠিবার সময়ই হয় না। শহরের বুনিয়াদী বাশিন্দাদের মধ্যে মহল্লায়-মহল্লায় যে একটা প্রতিবেশিত্ব চালু ছিল তাও ভাংগিয়া গিয়াছে বা যাইতেছে। শহরের উন্নতি শ্রীবৃদ্ধি ও পুনর্নির্মাণের বন্যায় ইনপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের প্রাস্থ্ বা ধাক্কায় ঐ সব যে কোথায় ভাসিয়া যাইতেছে, তার ঠিক-ঠিকানা নাই। পক্ষান্তরে পাড়াগাঁয়ে এই প্রতিবেশিত্ব স্বাভাবিক। সেখানে এক বাড়িতে একজনের অসুখ হইলে সারা গ্রামে রটিয়া যায়। শহরে পাশের বাড়িতে লোক মরিয়া গেলেও কেউ খবর রাখে না। পাশের বাড়িতে কে বা কারা থাকে, তাদের পরিবারে লোক কত, কে কি করে, অনেক সময় তাও আমরা জানি না। জানিতে পারি না। জানিবার অবসর নাই। শহরের সবাই আমরা কাজের লোক। অতিমাত্রায় ব্যস্ত। পারতপক্ষে কেউ পায়ে হাঁটিয়া চলে না। রিক্শা-ট্যাক্সি-মোটরে ছুটাছুটি। দৌড় ছাড়া গতি নাই। নষ্ট করিবার সময় নাই। এই পরিবেশে প্রতিবেশিত্ব বা আত্মীয়তা গড়িয়া উঠিতে পারে না। পরিচয় যা ঘটে, তা নিতান্ত বৈষয়িক—সংক্ষিপ্ত দুই দণ্ড বসিয়া আলাপ করিবার সময় নাই। যাদের আছে তারা ক্লাবে যায়। ক্লাব প্রতিবেশিত্ব নয়। কাজেই শহরবাসীর চাল-চলন, স্বভাব-চরিত্র, ভাব গতিক এক হইতে পারে না। ফলে শহরের বাশিন্দারা হয় মাল্টিকালার; শতরংগা; রং-বেরং এর লোক। পক্ষান্তরে পল্লীর লোকেরা হয় ইউনিকালার বা একরংগা। শহরের জনতার পরিবর্তন ঘটিতেছে প্রতিদিন, প্রতি ঘন্টায়, প্রতি মিনিটে। পল্লীর লোক দাদা-পরদাদার আমল হইতে চৌদ্দ পুরুষ ধরিয়া একই জায়গায় একই ধরনে বসবাস করিতেছে। এই কারণেই পল্লী-গ্রামের লোকদের মধ্যে সুখে দুঃখে হাসি-কান্নায় একটা আন্তরিক সমবেদনা ও আত্মীয়তা গড়িয়া উঠিয়াছে। এই আত্মীয়তা হইতে তাদের আনন্দে-উল্লাসে, আমোদ-প্রমোদে, শোকে-মাতমে, অভাবে-অনটনে, আচারে-ব্যবহারে, পোশাকে-পরিচ্ছেদে, চিন্তায়-ভাবনায়, প্রথায়-সংস্কারে, কাহিনী-কিংবদন্তিতে, এমন কি ভূত-প্রেত দর্শনে-শ্রবণে, একটা একাকারত্ব বা ইউনিফর্মিটি দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে। পল্লী-জীবনের অচঞ্চলতার মতই এই ইউনিফর্মিটি অচঞ্চল ও স্থায়ী। উপরে বর্ণিত সামাজিক আচারের সমাবেশ ও সমষ্টিই জাতির কালচার।

পল্লী-জীবনের ঐ ইউনিফর্মিটিই কালচারের বুনিয়াদ। এই জন্যই কালচারটা মূলত এবং প্রধানত পল্লীর সম্পদ। পল্লী জীবনই সে সম্পদের ধারক ও রক্ষক।

শহর কালচারের স্রষ্টা

অপর দিকে শহর শিল্প-বাণিজ্য, শিক্ষা-সাহিত্য ও রাষ্ট্র পরিচালনার কর্ম-কেন্দ্র। ঐ সব কাজ কর্ম উপলক্ষ্যে দেশ-বিদেশের হরেক রকমের লোকের সেখানে সমাবেশ। তাদের ধর্ম-ঈমান, আচার-অনুষ্ঠান, চিন্তা ভাবনা, খোরাক-পোশাক, চাল-চলন, বিদ্যা-বুদ্ধি এক নয়। এদের আলাপ-পরিচয় মিলামিশাও স্থায়ী নয়। এমন পরিবেশ ইউনিফর্মিটি ঐক্য ও আত্মীয়তা, এক কথায় কালচার, গড়িয়া উঠার অনুকূল নয়—সে কথা একটু আগেই বলিয়াছি।

www.pathagar.com

কিন্তু এর একটা ভাল দিকও আছে। নিত্য-নতুন লোকের আসা যাওয়া, কাজ-কর্মে তাদের আলাপ-পরিচয় ও পরস্পরের ভাবের আদান-প্রদান হয় শহরে। তাতে নিত্য-নতুন জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভ হয় তাদের। তাদের সকলের দৃষ্টিভংগিতেই আসে একটা উদারতা। এক জায়গায় বসিয়া বায়স্কোপে বিদেশে দেখার মতোই শহরের লোকেরা ঘরে বসিয়া দুনিয়া দেখে। নিত্য-নতুন সমস্যার সৃষ্টি ও সমাধান দেখে তারা চোখের সামনে। এইভাবে আসে তাদের মধ্যে নতুন চিন্তধারা। তাতে বিচার-বুদ্ধিতে তাদের আসে উদারতা। মনে আসে প্রসারতা। তারা লাভ করে বিদেশীর ভাল জিনিস গ্রহণ করিবার ক্ষমতা, আর নিজেদের খারাপ জিনিস বর্জন করিবার সাহস। পল্লী-জীবনে যেসব বিশ্বাস থাকে তাদের ঈমানের অংগ, শহর-জীবনে বিজ্ঞান-প্রভাবিত মুক্তবুদ্ধির বিচারে সে সবই হইয়া পড়ে নির্বোধ কুসংস্কার! তাই পাড়াগাঁয়ে যারা সন্ধ্যা বেলায়ই বাড়ির পাশের ছোট শেওড়া গাছটিতে ভূত-প্রেত দেখে, তারাই শহরে আসিয়া বড় বড় বটগাছে অমাবস্যার রাত্রেও ভূত-প্রেত দেখে না।

বহুদর্শনের ফলে শহরবাসীর এই যে মনের বিকাশ ও দৃষ্টির প্রসারতা, এটা তারা লাগাইতে চায় নিজের সমাজের ও দেশের কাজে। অপরের দেখাদেখি নিজের লোককে ভাল করিয়া তুলিবার প্রবল ইচ্ছা জাগে তাদের অন্তরে। তারা হইয়া উঠে রিফর্মিস্ট। তারা নিজেদের চাল-চলনে, আচার-ব্যবহারে, ঈদে-পার্বণে, এমনকি ধর্ম-বিশ্বাসে, এক কথায় নিজেদের কালচারে, সংস্কার প্রবর্তন করিয়া সেটাকে করিতে চায় অধিকতর ভব্য, শালীন সুন্দর। শিক্ষা-কেন্দ্র, সাহিত্য-সংঘ সংবাদপত্র—পত্রিকার অফিস, রংগমঞ্চ, ক্লাব-রেস্তরাঁ, মসজিদ-মন্দির, গির্জায় প্রাচুর্য থাকে শহরেই। এই সব জায়গা হইতেই নতুন নতুন ভাব চিন্তা জন্ম ও প্রসার লাভ করে। রাস্তাঘাট, ট্রেন, মোটরবাস, ডাক-তার ইত্যাদি যানবাহনের ক্রমবর্ধমান বিস্তারে ঐ সব নতুন চিন্তাধারা ছড়াইয়া পড়ে মফস্বলে। মফস্বলের লোকেরা সকল চিন্তা ও কাজে অনুকরণ ও অনুসরণ করে শহরবাসীকে। এইভাবে শহরে কালচার সৃষ্টি হইয়া বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছুরিত হয় পল্লী-জীবনে। শহরে করে যা সৃষ্টি, পল্লীকরে তা ধারণ ও পালন।

কালচার ও সিভিলিযেশনের সীমারেখা

অতএব দেখা গেল, শহর সভ্যতা-ভিত্তিক এবং পল্লী কৃষ্টি-ভিত্তিক—এ কথাও যেমন নিরাধারা বলা যায় না, সভ্যতা শহরবাসী এবং কৃষ্টি পল্লীবাসী—একথাও তেমনি চোখ বুঁজিয়া কওয়া যায় না। এই কারণেই সিভিলিযেশন ও কালচারে সুস্পষ্ট সীমারেখা টানা এত কঠিন।

এ ছাড়াও আরেকটা অসুবিধা আছে। এমন অনেক ব্যাপার আছে, যার খানিকটা কালচার, আর খানিকটা সিভিলিযেশন। উদাহরণস্বরূপ বিয়ার কথাটাই ধরা যাউক। বিয়া-প্রথাটা সভ্যতা। যে দেশ ও সমাজে বিবাহ প্রথা চালু নাই, সে দেশ ও সমাজকে সভ্য বলা যায় না। সমাজ বিজ্ঞানের ছাত্ররা জানেন যে, আদিকালে মানুষের মধ্যে বিবাহ-প্রথা ছিল না। সভ্যতা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রথা সভ্যতার অবিচ্ছেদ্য অংগ হিসাবে একরূপ আইনে পরিণত হইয়াছে। কাজেই বিবাহটা সভ্যতা। কিন্তু বিবাহের রসুম বা প্রণালী সভ্যতা নয়, কালচার মাত্র। বিয়ার রসুমের খুঁটিনাটি এক-এক দেশে এক-এক জাতিতে এক-এক রকম। এক দেশে দুলা-দুলহান নিজেরা দেখাশোনা ও

www.pathagar.com

কোর্টশিপ করিয়া বিয়া করে, আরেক দেশে দুলা-দুলহানের দেখাশোনা হয় না। তাদের বাপ-ভাই মুরুব্বিরাই বিয়া ঠিক করেন। এক দেশে প্রাপ্ত বয়স্কদের মধ্যে বিয়া হয়, আরেক দেশে কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে বিয়া হয়। এক দেশে বা এক জাতিতে বরপক্ষ দেয় কাবিন ও দেনমোহর, আরেক জাতিতে কন্যাপক্ষ দেয় পণ ও যৌতুক। এক দেশে পুরুষ-নারীকে বিয়া করে, আরেক দেশে নারী করে পুরুষকে। এক দেশে একই সময়ে একাধিক বিয়া করা বেআইনী, আরেক দেশে এক সঙ্গে চার বা তারও বেশি বিয়া করা যায়। এক দেশে তালাক বা বিবাহ-বিচ্ছেদের দস্তুর আছে, আরেক দেশে তা নাই। এক দেশে বিধবারা বিয়া করতে পারে, আরেক দেশে পারে না। এক দেশে আত্মীয়-অনাত্মীয় নির্বিশেষে যে কেউকে বিয়া করা যায়, আরেক দেশে তা চলে না—এই সব নিয়ম-কানুনের একটা সিভিলিযেশনের প্রশ্ন নয়, কালচারের প্রশ্ন মাত্র। তার মানে এই সব নিয়ম কানুনের পার্থক্যের দরুন কোন জাতি সভ্য বা অসভ্য বিবেচিত হয় না, বরং এ সবই বিভিন্ন সভ্য জাতির নিজ নিজ বিশেষ সামাজিক বা ধর্মীয় ব্যবস্থা; সুতরাং তাদের কালচারের অংগ।

যৌন-সমতার প্রশ্নটাও তাই। নারীকে নরের অধীন দাসী-বান্দী গৃহপালিত জীব বা পণ্য মনে করা অসভ্যতা। কি পারিবারিক সামাজিক জীবনে উভয়ের কর্তব্যের পৃথকীকরণটা অসভ্যতা নয়, কালচারের পার্থক্য মাত্র।

বিয়ার বেলা যেমন, জন্মের বেলায়ও তেমনি। সন্তান জন্মের সময় বিভিন্ন দেশে ও ভিন্ন–ভিন্ন জাতিতে বিভিন্ন প্রথা চালু আছে। কোনও দেশে ও জাতিতে সন্তানের জন্মে আকিকা দেওয়া হয় এবং আকিকা দেওয়ার সময়েই নাম রাখা হয়। আরেক দেশে সন্তানকে ধর্মস্থানে ধর্মযাজকের কাছে লইয়া যাওয়া হয় এবং সেখানেই তার নামকরণ হয়। এক দেশে প্রতিবছর সন্তানের জন্মবার্ষিকী পালন করা হয় এবং আত্মীয়-স্বজন তাকে উপহার-উপঢৌকন দেয়, আরেক দেশে সন্তানের জন্ম-তারিখটি আলগোছে ভুলিয়া যাওয়া হয়। এক দেশে ছেলেদের খৎনা করান হয়, আর এক দেশে হয় না।–এ সবই কালচারের অংগ, সিভিলিযেশনের অংগ নয়। কিন্তু সন্তান জন্মের সময় ছেলে–সন্তান রাখিয়া মেয়ে সন্তানকে নদীতে ভাসাইয়া দেওয়া হইলে তাকে আর কৃষ্টি–অকৃষ্টির প্রশ্ন বলা যায় না।—তা হইয়া পড়ে সভ্যতা-অসভ্যতার প্রশ্ন।

জন্মের সময় যা, মৃত্যুর সময়েও তাই। এর খানিকটা সভ্যতা, খানিকটা কৃষ্টি। যেমন ধরুন, মৃত্যুর পর লাশটার গোশত খাইয়া ফেলিলে বা শিয়াল-কুত্তার ও চিল-শকুনের খাওয়ার জন্য ফেলিয়া দিলে সেটা হইবে অসভ্যতা। আর সযত্নে সাড়ম্বরে সে লাশটারে সৎকার করাটা হইবে সভ্যতা। এই সৎকারেরও আবার বিভিন্ন রূপ হইয়া থাকে। বিভিন্ন দেশে ভিন্ন-ভিন্ন জাতিতে বিভিন্ন প্রণালীতে তা করা হয়। সে প্রণালীগুলি হইবে ঐ ঐ দেশ বা জাতির কালচার। এই ধরুন, কোন দেশে বা জাতিতে লাশ পুড়াইয়া ফেলা হয়; কোন দেশে বা জাতিতে তা মাটিতে পুঁতিয়া ফেলা হয়। পুড়াইয়া ফেলা ও পুঁতিয়া ফেলাও আবার ভিন্ন-ভিন্ন রকমের হইতে পারে। কেউ কাঠ-লাকড়িতে পুড়ায়, কেউ বিজলির তাপে পুড়ায়। পুঁতিবার বেলাও তেমনি এক জাতি লাশ সযত্নে ধুইয়া-মুছিয়া নয়া কাপড় পরাইয়া খুশবু লাগাইয়া দাফন করে; আরেক জাতি লাশটি কাঠের বাক্সে ভরিয়া মাটিতে চাপা দেয়। এক জাতি তাদের মৃত ব্যক্তিদেরে বিশালায়তনের ফুল-বাগিচাওয়ালা গোরস্থানে পৃথক পৃথক সমাধি দখল

www.pathagar.com

করিতে দিতেছে; আর এক জাতি তাদের মৃত ব্যক্তিদের স্বল্পায়তনের শ্মশানঘাটের ছাই হইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে বাধ্য করিতেছে। এ সবই বিভিন্ন জাতির বা মানব-গোষ্ঠীর কালচারের অংশ। সিভিলিযেশনের সংগে এ সবের কোন সম্পর্ক নাই। কিন্তু এই কালচারই একদিন সিভিলিযেশনের প্রশ্ন হইয়া উঠিতে পারে। বৈজ্ঞানিক গবেষণায় যদি ভবিষ্যতে প্রমাণিত হয় যে, এই দুই প্রথার কোনও একটি বা উভয়টি মানব-স্বাস্থ্যের পক্ষে অকল্যাণকর, তখন উহা আর কালচারের প্রশ্ন থাকিবে না; হইয়া উঠিবে উহা সিভিলিযেশনের প্রশ্ন। দৃষ্টান্তস্বরূপ সতীদাহের কথা বলা যায়। মৃত স্বামীর চিতায় বিধবা পত্নীকে পুড়াইয়া ফেলা একদা কোন কোন জাতির কালচারের অংগ ছিল। কিন্তু উহা সিভিলিযেশনের পরিপন্থী বিবেচিত হওয়ায় এখন পরিত্যক্ত হইয়াছে। কাজেই দেখা গেল, এই সব ব্যাপারের খানিকটা কালচার আর খানিকটা সিভিলিযেশন।

মানুষের ভাষা উপাসনা-প্রণালী এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিরও খানিকটা কালচার,আর খানিকটা সিভিলিযেশন। বর্ণমালাযুক্ত ভাষা মানুষের সভ্যতার নিদর্শন; কিন্তু হরফের আকৃতি ও ডাইনে-বামে উপরে নিচে লেখার প্রণালী কালচারের নিদর্শন। গির্জা-মন্দির-মসজিদে প্রার্থনা-উপাসনা করা, রোযা-নামায পড়া, সন্ধ্যা-আহ্নিক করা, বুকে ক্রুস ঝুলান, ধর্মস্থানে গমন, কবর যিয়ারত, এমনকি পীরের দরগায় শিরনী ও কালীবাড়িতে কবুতর মানত করা ইত্যাদি ইত্যাদি সবই মানুষের কালচারের অংগ। সিভিলিযেশনের সংগে এর কোন সম্পর্ক নাই; অর্থাৎ এই সব ক্রিয়া-কলাপ এইরূপে করিলে সভ্যতা হইবে, আর ঐ ধরনে করিলে তা অসভ্যতা হইবে, এমন কোন কথা নাই। কিন্তু এই সব কালচারের প্রতিপালনে পূজা-অর্চনা বা ইবাদত-বন্দেগি করিতে গিয়া উপাস্য দেবতার ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য প্রাণী বলি দিলে উহা আর কালচারের প্রশ্ন থাকে না, হইয়া পড়ে তা সিভিলিযেশনের প্রশ্ন।

ধর্ম ও কৃষ্টির সীমারেখা

এইখানে ধর্ম ও কৃষ্টির সীমারেখা সম্বন্ধে দুই একটা কথা নিতান্ত প্রাসংগিক হইয়া পড়িতেছে। কারণ উপরে যে সব ক্রিয়া-কলাপের দিকে ইশারা করা হইল তার অনেকগুলিই ধর্মীয় অনুষ্ঠানের অংগ। রিলিজিয়ান ও কালচারের বাউণ্ডারি নির্দেশ এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। কালচার ও সিভিলিযেশনের সীমা নির্ধারণই ইহার প্রতিপাদ্য। তবু কালচারের কথা বলিতে গেলে ধর্মের কথা স্বতঃই আসিয়া পড়ে বলিয়া এখানে অতি সংক্ষেপে ধর্ম ও কালচারের সীমা নির্দেশের চেষ্টা করিতেছি।

ধর্ম ও কৃষ্টির সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ ও নিবিড়; কিন্তু তা হইলেও দুইটা এক বস্তু নয়। এক কথায় বলা যায় ধর্ম কালচারের নির্যাস; পোটেনটাইযড্ কালচার দার্শনিক ম্যালিনস্কির ভাষায় 'মাস্টার ফোর্স অব হিউম্যান কালচার'। কাজেই ধর্মের সবটুকুই কালচার, কিন্তু কালচারের সবটুকুই ধর্ম নয়। সহজে বুঝিবার জন্য কালচারকে গাছের সংগে তুলনা করিলে ধর্মকে গাছের ফলের সঙ্গে তুলনা করিতে হয়। গাছ হইতে রিলিজিয়ান ও রিলিজিয়ান হইতে কালচারের উৎপত্তি। গাছ কিন্তু ফলের মত নিটোল ও অনাবিল নয়। তেমনি ভাল-মন্দ ও ফুল-কাঁটা লইয়াই কালচার।

www.pathagar.com

কালচারের ব্যাপকতা

এমনিভাবে মানুষের গৃহনির্মাণ পোশাক-পাতি, রান্না-বান্না, খেলা-ধূলা, নাচ-গান, মায় ওয়ারিসী আইন-কানুন পর্যন্ত সব ব্যবস্থার মধ্যেই খানিকটা কালচার ও খানিকটা সিভিলিযেশন রহিয়াছে। মানুষ আদিকালে বনে-জংগলে-গুহায় বাস করিত। স্থায়ী বাসগৃহ নির্মাণ করিয়া তারা সভ্য হইয়াছে। স্থপতি বিদ্যার উৎকর্ষ সাধন করিয়া অধিকতর সভ্য হইয়াছে। কাজেই আবাসগৃহ নির্মাণ সভ্যতা। কিন্তু স্থাপত্যের রূপ কি হইবে, দালান-ইমারত চূড়াওয়ালা বা গম্বুজওয়ালা হইবে, না চৌকোণা বা চ্যাপ্টা হইবে, ইট-পাথরের হইবে, না কাঠ বাঁশের হইবে—এ সব কালচারের ব্যাপার। কাপড় পরা-না-পরাটা সভ্যতার প্রশ্ন। কিন্তু কি ধরনের পোশাক পরা হইবে, প্যান্ট না পাজামা, কোট না কোর্তা, শাড়ি-সেলওয়ার, না স্কার্ট-গাউন—সেটা কালচারের প্রশ্ন। মাছ-গোশত-তরকারি রাঁধিয়া খাইবে, না কাঁচা খাইবে-এটা হইবে সভাতার প্রশ্ন। কিন্তু কি প্রণালীতে রান্না করিবে, কোন্টা খাইবে, আর কোন্টা খাইবে না, কোন্টা হালাল, কোন্টা হারাম, কি ধরনের পাক-প্রণালী পছন্দের, পেস্টিপ্যাটিস ভাল, না রসগোল্লা-সন্দেশ ভাল—এ সব কালচারের প্রশ্ন। খেলা-ধূলাকে মানুষের কর্মজীবনের স্বাভাবিক অংগ স্বীকার করা সভ্যতা। কিন্তু খেলার বিভিন্ন রূপ : ফুটবল না রাগবি, ক্রিকেট না বেসবল, পলো না ঘোড়দৌড়, হকি না ডাংগুলি-এসব সভ্যতার প্রশ্ন নয়, কালচারের প্রশ্ন মাত্র। সংগীত ও নৃত্যকে চারুশিল্পের অন্তর্গত করা সভ্যতা। কিন্তু নাচ-গানের বিষয়বস্তু, ধরন ও প্রণালীটা কালচারের ব্যাপার। সম্পত্তির মালিকানার স্বীকৃতি সভ্যতার নিদর্শন। কিন্তু সে সম্পত্তির ওয়ারিস নির্ধারণ ও বন্টন-প্রণালীটা কালচার মাত্র।

কালচারের উৎস

উপরের আলোচনা হইতে ইহা প্রমাণিত হইতেছে যে, যে মন ও মস্তিষ্ক মানুষকে অন্যান্য জীব-জন্তু হইতে পৃথক করিয়াছে, সেই মনের বিকাশের নাম কালচার, মস্তিষ্কের বিকাশের নাম সিভিলিযেশন। আগের আলোচনা হইতে এটাও স্পষ্ট হইয়াছে যে, এই নির্ধারণও নিক্তির ওজনে নিখুঁত নয়, মাত্র মোটামুটিভাবে সত্য। সভ্যতা বুদ্ধির বস্তু বলিয়াই সে নিজের জোরে রাজ্য জয় করে। প্রসার ও বিস্তার লাভ করে। হৃদয়ের সাথে সভ্যতার সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য নয়। তাই গ্রহণকারীকে অন্তর দিয়া সভ্যতা গ্রহণ করিতে হয় না। তার কোনও দরকারও নাই। এ্যারোপ্লনকে শয়তানের কল বলিয়াও অনেকে হাওয়াই জাহাজে চড়িয়া হজ করিতে যাইতেছেন।—অন্যান্য সব সম্পদের মতোই সভ্যতার সাফল্য তার প্রয়োজনে।

আজিকার যান্ত্রিক সভ্যতাই তার প্রমাণ। প্রয়োজনের তাকিদেই সারা দুনিয়া এই পশ্চিমা সভ্যতা গ্রহণ করিয়াছে। মস্তিষ্কের ব্যাপার বলিয়া ইহা গ্রহণ করিতে কারও কোন অসুবিধা হয় নাই। দুনিয়ার সব দেশেই ইহা খাপ খাইয়া গিয়াছে। প্রকৃতির বিধানেই ইহা ঘটিয়াছে। কথাটা সহজে বুঝিবার জন্য আমরা সভ্যতাকে ইমারতের সংগে তুলনা করিতে পারি। আর কালচারকে তুলনা করিতে পারি এবং আগেই করিয়াছি, গাছের সংগে। ইমারত মাটি হইতে রস গ্রহণ করে না। কাজেই যে-কোন

www.pathagar.com

সরঞ্জামের যে-কোনও প্লানের ইমারত যে-কোনও দেশে নির্মিত হইতে পারে। কিন্তু গাছকে মাটি হইতে রস সংগ্রহ করিয়া বাঁচিতে হয়। সেজন্য যে-কোনও গাছ দুনিয়ায় যে কোনও দেশে লাগান যায় না। মাটি রস সংগ্রহের উপযোগী না হইলে চারা লাগাইলেও তা বাঁচে না।

কালচার সম্বন্ধেও এই কথা। যে-কোন দেশের কালচার, তা যতই সুন্দর হউক না কেন, অন্য যে-কোন দেশে চালান যাইবে না। স্থানীয় রসের অভাবে তা মারা যাইবে। কারণ আগেই বলিয়াছি কালচারটা মনের বস্তু, মস্তিষ্কের বস্তু নয়। এই দিক হইতে বিচার করিয়া বলা যায় সিভিলিযেশন একটা র‍্যাশনাল কনস্ট্রাকশন; আর কালচার একটা ইমোশন্যাল গ্রোথ।

ঠিক এই কারণেই দুনিয়ার লোককে যত সহজে পশ্চিমা সভ্যতা গ্রহণ করান গিয়াছে, তত সহজে পশ্চিমা কৃষ্টি গ্রহণ করান যায় নাই। সভ্যতা প্রসার লাভ করে বিজয়ীর বেশে। পশ্চিমা জাতিসমূহ রাজ্য বিস্তারে ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারে তিনশ' বছর ধরিয়া সারা দুনিয়ায় প্রভুত্ব করিয়াছে। এই উপলক্ষে তারা জগতবাসীর কাছে নিজেদের সভ্যতা প্রচার করিয়াছে। বিশ্ববাসী তা গ্রহণও করিয়াছে।

নিজেদের সভ্যতার সাথে সাথে পশ্চিমারা নিজেদের কালচার প্রচারে চেষ্টাও কম করে নাই। কিন্তু শহরের মুষ্টিমেয় লোক ছাড়া সাধারণভাবে দুনিয়ার সব দেশের জনগণ পশ্চিমা কালচার গ্রহণ করে নাই। শাসক জাতির কালচারের প্রবল স্রোতের মুখেও তারা নিজেদের কালচার মজবুত হাতে ধরিয়া রাখিয়াছে। এটা মানুষের দর্প নয়, প্রকৃতির দর্প। সব দেশের মাটি পশ্চিমা কালচারের চারা গাছের রস যোগাইতে পারে নাই বলিয়াই এইরূপ ঘটিয়াছে।

বৈচিত্র্য অপরিহার্য

এটা কি অন্যায় হইয়াছে? পশ্চিমা কালচার গ্রহণ না করিয়া পূরবীরা কি ভুল করিয়াছে? এটা কি তাদের কুসংস্কারী মনোভাবের জন্য হইয়াছে? এটা কি তাদের সংস্কার-বিরোধী নস্টালজিয়া? তারা কি জানে না, কি জিনিস তারা হারাইতেছে? না, প্রকৃত অবস্থা তা নয়। মানব জাতির কল্যাণের খাতিরেই তা ঘটিয়াছে। যে বৈচিত্র্যে বিশ্বের সৌন্দর্য নিহিত, স্রষ্টার কারিগরির অসাধারণত্বের যা নিদর্শন, তারই খাতিরে প্রকৃতি এরূপ ঘটাইয়াছে।

ধরুন, এমন যদি না হইত, দুনিয়ার সব জাতি যদি পশ্চিমা কালচার গ্রহণ করিত, তবে অবস্থা কি দাঁড়াইত? সভ্যতার দিক হইতে দুনিয়া যেমন একাকার হইয়া গিয়াছে, কালচারের দিক হইতেও তেমনি সব জাতি একরংগা হইয়া যাইত। দেহের রং অবশ্য এক হইত না। কিন্তু মনের রং এক হইয়া যাইত। তাতেও কার কি লোকসান হইত?

মানবতার লোকসান হইত দুই দিক হইতে। প্রথমত দুনিয়ার বৈচিত্র্য নষ্ট হইত। বিভিন্ন জাতির জাতীয় বৈশিষ্ট্যের অবসান ঘটিত। হাজার ফুলের বাগিচা যে দুনিয়া, সেটা পরিণত হইত এক রংগা গেন্দা ফুলের ক্ষেত্রে। দুনিয়ার সব জাতি নকল পশ্চিমা জাতিতে পরিণত হইত।

www.pathagar.com

লাখ লোকের সমাজের মধ্যে দুই-চারজন মাত্র ব্যক্তিত্বসম্পন্ন থাকিয়া বাকী সব লোক ব্যক্তিত্বহীন হইলে সমাজের অবস্থা যা দাঁড়াইবে, দুনিয়ার সব জাতি নিজ নিজ কালচারের স্বকীয়তা বিসর্জন দিয়া পশ্চিমা কালচার গ্রহণ করিলে বিশ্ববাসীর অবস্থা দাঁড়াইবে ঠিক তাই।

দ্বিতীয়ত দুইচারজন লোক বা শ্রেণীবিশেষ বাদে সমাজের আর সব লোক ব্যক্তিত্বহীন হইলে সে সমাজ সচেতন সমবেত গণ-জীবন থাকিবে না, হইয়া যাইবে রাখালের পরিচালনায় একপাল গরু। স্বকীয় কালচার বা ব্যক্তিত্বহীন জাতিসমূহ ঠিক তেমনি পশ্চিমা রাখালের অধীনে গরুর পাল হইয়া যাইত। ফলে পশ্চিমা জাতিসমূহ ছাড়া আর সব জাতি হারাইত স্বাধীন চিন্তা, কর্মোদ্যম ও সৃষ্টির অভিলাষ। বিশ্ব সভ্যতায় তাদের কোনও অবদান থাকিত না। কার্যত তারা পরিণত হইত প্রাণহীন যন্ত্রে।

কাজেই দেখা গেল, লোক-সমাজে আদর-কদর মান-ইয্যৎ পাইতে হইলে যেমন ব্যক্তিত্বের অধিকারী হইতে হয়, তেমনি বিশ্ব-সমাজে আদর-কদর ও মান-মর্যাদা পাইতে হইলে আমাদের জাতিকেও হইতে হইবে সমবেত ব্যক্তিত্বের, মানে নিজস্ব কালচারের অধিকারী। নিজস্ব কালচারের প্রয়োজন এইখানেই।

বৈচিত্র্য স্বাভাবিক

মনে রাখা দরকার, ব্যষ্টির ব্যক্তিত্ব যেমন, জাতির ব্যক্তিত্বও তেমনি, কদাচ নিখুঁত, ক্রটিহীন হইতে পারে না। মারিয়া-পিটিয়া যেমন ব্যক্তিত্ব হয় না, ছাঁচে ঢালিয়া তেমনি কালচার হয় না। আগেই বলিয়াছি, কালচারটা ডিযাইন করা কনস্ট্রাকশন নয়। ওটা গাছের মতই ন্যাচারেল গ্রোথ। বলা যায় ওটা প্রকৃতির তৈরী নদী। মানুষের হাতে-কাটা খাল নয়। দুই কূল ছাপিয়া দুই পাড় ভাংগিয়া ইচ্ছামতো চলাই নদীর ব্যক্তিত্ব। কৃত্রিম খালের মতো তার দুই পাড় শানে-বাঁধা নয়। এই জন্যই দোষে-গুণে যেমন ব্যক্তিত্ব, ভাল-মন্দেই তেমনি কালচার। দুনিয়ার সব কালচারের শুধু গুণগুলি বাছিয়া লইয়া একটা নিখুঁত সুন্দর কালচার গড়িবার চেষ্টা করিয়া দেখুন, পারিবেন না। সেটা কালচার হইবে না, হইবে বড় জোর কালচারের ল্যাবরেটরি। মিউযিয়াম হইবার সম্ভাবনাই বেশি।

এর কারণও সুস্পষ্ট। মানুষ ফেরেশতা নয়। দোষে-গুণেই তারা মানুষ। তাদের এ দোষ-গুণের বিশেষত্ব এই যে এক দিক হইতে যেটা দোষ, আর এক দিক হইতে সেটাই সবলতা। দরুন, মানুষের রাগের কথা।এক সময়ে এটা দোষ। কিন্তু সময়ান্তরে এটাই গুণ। নিষ্ঠুরতারই আর এক নাম বীরত্ব। কাপুরুষতাকেই সময়বিশেষে সহিষ্ণুতা বলা হয়। আহাম্মকির সাধু নাম সরলতা।

কালচারের বেলাও তাই। একের জন্য যা দোষ, অপরের জন্য তাই গুণ। এটাই তাদের পার্থক্য। এই পার্থক্যটুকুই যার তার বৈশিষ্ট্য। হুবহু ব্যষ্টির ব্যক্তিত্বের মতোই। একটা দৃষ্টান্ত লওয়া যাউক। হাত-পা, চোখ-মুখ, নাক-কান, খানা-পিনা, হাগা-মুতা এবং জন্ম-মৃত্যু কোনও ব্যাপারেই জানোয়ার ও মানুষের মধ্যে কোনও পার্থক্য নাই। মন ও মস্তিষ্কের দোহাই দিয়া তাহাদের মধ্যে যে পার্থক্য করি, তাও বড় ক্ষীণ। বানরের বেলায় সে পার্থক্যের সীমা কোথায়। শুধু মন-মস্তিষ্কের নয়, তাদের অন্তরও আছে। তাহারা ও হাসে-কাঁদে। ভাষাও তাদের একটা আছে।

www.pathagar.com

বৈশিষ্ট্য কি?

তথাপি মন-মস্তিষ্ক ও অন্তরের এক স্তরে জানোয়ার ও মানুষের মধ্যে একটা পার্থক্য আছে। সে পার্থক্য স্থূল দৃষ্টিতে যতই ক্ষীণ হউক না কেন ঐ পার্থক্যটুকুই মানুষের নিজস্বতা। ঐ টুকুই তার বৈশিষ্ট্য।

ব্যক্তিত্ব ও কালচারের বেলাও অবিকল তাই সত্য। হাজার বিষয়ে এক ও সদৃশ হইয়াও সামান্য দুই-এক বিষয়ে তারা পৃথক স্বতন্ত্র ও অসদৃশ। দেখা যাইবে সবই ত এক। তবে আর পার্থক্যটা কি? হাঁ, আছে। ঐ যে মানুষের ভিড়ের মধ্যে মাত্র এক ইঞ্চি বেশি লম্বা একটা লোক দেখা যাইতেছে, ঐ দৈর্ঘ্যটুকুই তার বিশেষত্ব। হাতে পায়ে রং চেহারায় কথাবার্তায় সব ব্যাপারেই আর সবার সাথে তার মিল আছে। কারণ সেও মানুষ। মানুষ না হইয়া সে যদি একটা খুঁটি বা উট হইত, তবে তার উচ্চতা তার বৈশিষ্ট্য হইত না।

তেমনি আগে কালচার হইতে হইবে। তারপর আসিবে কালচারের বৈশিষ্ট্য। সব কালচারের মধ্যে ঐক্য মিল ও সাদৃশ্য থাকিবে হাজার। আর পার্থক্য থাকিবে মাত্র দুই একটি। ঐ পার্থক্যটুকুই তাদের বৈশিষ্ট্য। অপরের চোখে বা বিজ্ঞানের বিচারে সে পার্থক্যটুকু তুচ্ছ হইতে পারে। কিন্তু ঐ কালচারের জন্য তুচ্ছ নয়। খুব ছোট দৃষ্টান্ত দিয়াই বিচার করা যাউক। মুসলমানের নূরের দাম হিন্দু-খৃষ্টানের কাছে যা, হিন্দুর টিকির দাম মুসলিম-খৃষ্টানের কাছে তাই। আবার খৃষ্টানের ক্রসের দামও হিন্দু-মুসলমানের কাছে তুচ্ছ। ইহুদি-মুসলমানরা তাদেরা ছেলেদের কেন খৎনা করায় এটা হিন্দু-খৃষ্টানরা বুঝিতে না পারিলেও ইহুদি মুসলমানরা কিন্তু কাজটাকে তাদের কালচারের ফাণ্ডামেন্টাল মনে করে। বিশ্ব-কবি রবীন্দ্রনাথ পোশাকে অত বাবু ও চেহারায় অত সুন্দর হইয়াও মোচ দিয়া তাঁর অমন সুন্দর মুখখানা ঢাকিয়া রাখিতেন। সে জন্য আমরা তাঁর মুসলমান-খৃষ্টান ভক্তদের অন্তরে দুঃখের অন্ত ছিল না। সম্রাট শাহজাহান ও স্যার সৈয়দ আহমদের মতো না হউক, মার্কস-এংগেল্‌সের মতো মোচ তিনি রাখিলেন না কেন? কারণ ওটা কালচার।

ঠিক তেমনি দাড়ি-গোঁফের বেলা হিন্দু-খৃষ্টানেরা এত বিলাসী ক্লিনশেভার হইয়াও বগলতলা ও নাভির নিচে সম্বন্ধে অত সঞ্চয়ী কেন, মুসলমানরা তা বুঝে না। পোশাক-পাতিতে অত টাকা-পয়সা খরচ করিয়াও পশ্চিমা মেয়েরা পিঠ ও হাঁটুর নিচ ঢাকিবার কাপড়ের পয়সা জুটাইতে পারে না কেন, আমরা পূরবীরা তার কারণ খুঁজিয়া পাই না।

পক্ষান্তরে আমরা আমাদের মেয়েদের অত-অত কাপড়ে আপাদমস্তক ঢাকিয়া রাখি কেন, তা বুঝাও পশ্চিমাদের পক্ষে কম কঠিন নয়। পশ্চিমাদের ক্লাব-লাইফ ও ঢিলা-দাম্পত্য জীবন দেখিয়া তাদের মেয়েদের জন্য আমরা কত আফসোস করি। কিন্তু আমাদের এক সংগে একাধিক বিবি লইয়া ঘর করিতে দেখিয়া পশ্চিমারাও আমাদের নারীজাতির জন্য কম আফসোস করে না। আমরা মুসলমানরা আরবী-ফারসীতে সুন্দর-সুন্দর অর্থপূর্ণ নাম রাখি। হিন্দুরা সংস্কৃত-হিন্দীতে সুন্দর অর্থজ্ঞাপক নাম রাখে। কিন্তু পশ্চিমা খৃষ্টানরা জ্ঞানে-বিজ্ঞানে ও সভ্যতা-ভব্যতায় অত উন্নত হইয়া যা তা অর্থহীন ও কদর্য নাম রাখিতে লজ্জা পায় না। আমরা যাকে অখাদ্য মনে করি, অনেক সভ্যজাতি তাই খায় পরম লযযতের সাথে।

www.pathagar.com

বিজ্ঞানী দার্শনিকের কাছে এ সব ব্যাপারে যতই ছোট হউক না কেন, এ সবের মধ্যেই নিহিত কালচারের পার্থক্য। আসলে এ সবের সমষ্টির নামই কালচার। এই সব ব্যাপার দিয়াই আমাদের কালচারের বিচার করিতে হইবে। পাক-বাংলার কালচারেরও মাপকাঠি হইবে ইহাই। আসুন, এখন সে বিচার করা যাউক।

পাক-বাংলা বনাম গোটা বাংলার কালচার

প্রথমেই একটা ব্যাপার পরিষ্কার করিয়া লওয়া যাক। গোটা বাংলার কালচার না বলিয়া শুধু পাক-বাংলার কালচার বলিলাম কেন? করণ এই, বাংলার কালচার বলিয়া কোনও কালচার নাই। কথাটা প্রথম দৃষ্টিতে ভ্রান্ত মনে হইবে। বাংলা একটা দেশ। বাঙ্গালী একটা জাতি। এটাই স্থূল সত্য। কারণ দেশ, গোত্র, ভাষার দিক হইতে বাংলার বাশিন্দারা একটা জাতি। এই জাতির একটা জাতীয় কালচার থাকার কথা। কিন্তু সত্য কথা এই, বাংলায় কোনও জাতীয় কালচার নাই। বাংলা সেদিন বৃটিশ ভারতের এবং তারও আগে মোগল ভারতের প্রদেশ ছিল বলিয়াই বাঙ্গালীরা স্বাধীন জাতি হিসাবে গড়িয়া উঠিতে পারে নাই এবং সেই কারণে বাঙ্গালীদের কোনও জাতীয় কালচার নাই, ব্যাপারটা তা নয়। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা ছাড়াও মানব-গোষ্ঠীর মধ্যে জাতীয় কালচার গড়িয়া উঠিতে পারে। বাংলায় জাতীয় কালচার গড়িয়া না উঠার কারণ রাষ্ট্রীয় পরাধীনতা নয়, সামাজিক বিচ্ছিন্নতা। এটা সবাই জানেন যে, সমাজই কালচারের নার্সারি জননী বা সূতিকাগার। বাংলার মানুষের সমাজ একটা নয়, দুইটা। সে দুইটা সমাজ এক্সক্লুসিভ। তাদের মধ্যে খাওয়া-পরা, বিবাহ-শাদি ইত্যাদি সামাজিক মিল নাই। তাই এগারশ' বছর এক দেশে বাস করিয়া একই খাদ্য পানীয় খাওয়াও তারা দুইটা পৃথক সমাজ রহিয়া গিয়াছে। এক সমাজের লোক জন্মিয়া খৎনা করিয়া নিজস্ব সমাজে বাস করিয়া মরিয়া গোরস্তানে যায়, অপর সমাজের লোক অশৌচান্ত ও উপনয়ন করিয়া নিজের সমাজে বাস করিয়া মৃত্যুর পর শ্মশানে যায়। ফলে এই দুইটি সমাজে দুইটা প্যারালেল কালচার গড়িয়া উঠিয়াছে। জাতীয় কালচার গড়িয়া উঠে নাই। বাংলা ভাগের মধ্যে দুইটা কালচার নিজ-নিজ আশ্রয় স্থল খুঁজিয়া পাইয়াছে। পাক-বাংলার কালচার অর্থে বিভক্ত বাংলার পূর্বাঞ্চলের কালচার বুঝাইতেছি।

আমাদের সভ্যতা

রাষ্ট্রীয় জাতি হিসাবে আমরা নতুন। মাত্র আঠার বৎসর আগে আমাদের পয়দায়েশ। যত বিভ্রান্তি এইখানেই। আমাদের চিন্তার যত অস্বচ্ছতা, যত অপরিচ্ছন্নতা, সব শুরু হয় এইখানে। আমরা ভুলিয়া যাই, রাষ্ট্রীয় জাতি হিসাবে আমরা নতুন হইলেও সভ্য মানুষ ও কৃষ্টিমান জাত হিসাবে আমরা শিশু নই। আমাদের মাতৃভূমির নাম পাক বাংলা। এটা প্রাচীন সমতট দেশ। হঠাৎ জলধি হইতে ভাসিয়া-উঠা চরভূমি নয়। অন্তত দুই হাজার বছরের প্রাচীন কাহিনী ইহার ইতিহাসের পৃষ্ঠা উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে।

আধুনিকতম ধর্মের উম্মত হিসাবে, তৎকালীন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সভ্য জাতি হিসাবে,আমরা প্রায় সাতশ' বছর এই দেশ পার্শ্ববতী দেশসমূহ কৃতিত্বের সংগে শাসন করিয়াছি। সে শাসন বিদেশী বিজয়ীর বেশে উচ্চাসনে বসিয়া করি নাই। এ দেশকে

www.pathagar.com

মাতৃভূমি জ্ঞান করিয়া জনগণের সাথে মিশিয়া তাদের মধ্য হইতে তাদেরই নেতা হিসাবে খাদেম হিসাবে সে শাসন করিয়াছি। জীবন শেষে জনগণের সাথেই মাতৃভূমির মাটিতে মিশিয়া আছি।

এই মুদ্দতে বাংলাদেশ ছিল শিক্ষা-সভ্যতার পীঠস্থান—শিল্প-বাণিজ্যের কেন্দ্র কৃষ্টি-স্থপতির লীলাভূমি। চীন-আরব-গ্রীক-রোমান প্রভৃতি সভ্য জাতির পণ্ডিতগণের তীর্থক্ষেত্র। আজ হইতে মাত্র তিনশ' বছর আগেও পাক-বাংলা তৎকালীন সভ্য জগতের দরবারে উচ্চ আসনের অধিকারী ছিল। নবাব শুজা শায়েস্তা খাঁর আমলে ফরাসী চিকিৎসক বার্নিয়ার ও ব্যবসায়ী টেভোনিয়ার এবং ইংরাজ পরিব্রাজক রালফ্ ফিশ্ ব্যাপকভাবে পাক-বাংলা পরিভ্রমণ করিয়া এদেশের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছিলেন। তারা দেখিয়াছিলেন, পাক-বাংলা তৎকালে বিভিন্ন দেশে চাউল চিনি সুতি কাপড়, রেশমী কাপড়, জবক্ষার, আফিম ও লবণ রফতানি করিত। ঐসব জিনিস এ দেশে এত সরস ও সস্তা ছিল যে, বিদেশ হইতে বড়-বড় সওদাগর বিশাল-বিশাল জাহাজে করিয়া এসব জিনিস নিতে আসিতেন। ষোল শতকের মাঝামাঝি ভিনিশীয় পরিব্রাজক সিযার ফ্রেডরিক পাক-বাংলা ভ্রমণ করিয়া লিখিয়াছিলেন : "এখানকার সন্দ্বীপ বন্দর জন-বহুল এক বিশাল বাণিজ্য-কেন্দ্র। এই বন্দরে প্রতিদিন গড়ে দুইশ' জাহাজ লবণ বোঝাই হইয়া বিদেশ গমন করে। এখানকার জাহাজে নির্মাণ-কৌশল এত সুন্দর ও কাঠ এত মজবুত যে, ইস্তাম্বুলের সুলতান আলেকযান্দ্রিয়ার বদলে এখন তাঁর রাজ্যের প্রয়োজনীয় সমস্ত জাহাজ এইখান হইতে তৈয়ার করাইয়া থাকেন।"

আমাদের কালচার

পাক-বাংলার সভ্যতা ও শিল্প-বাণিজ্যিকে আমরা মুসলমানরা এতখানি উন্নত করিয়াছিলাম। সেই সংগে পাক-বাংলার কালচারকেও আমরা নানা ফুলে-ফলে ও রূপে-গন্ধে সুসজ্জিত ও সুরভিত করিয়াছিলাম। এটা আমরা একদিনে করি নাই। বাংলার মাটির সাথে আমাদের সম্পর্ক হাজার বছরেরও বেশি কালের। পুরা সাড়ে ছয়শ' বছর আমরা এই দেশের শাসক ছিলাম। তার মধ্যে প্রায় তিনশ' বছর আমরা স্বাধীন বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা শাসন করিয়াছি। এই মুদ্দতে আমরা বাংলাকে নিজস্ব জাতি-নাম, ভাষা ও সাহিত্য দিয়াছিলাম। সে ভাষা ও সাহিত্যের মধ্য দিয়া বাঙ্গালীত্বকে নতুন মর্যাদা, তার ভাষায় নতুন সুর, তার গলায় নতুন জোর দিয়াছিলাম। কৃষ্টি সভ্যতা শিল্প-বাণিজ্য ও শিক্ষা-সাহিত্যে সভ্য জগতের দরবারে বাংলাদেশকে করিয়াছিলাম সুপ্রতিষ্ঠিত। পাক-বাংলার শিল্প-সাহিত্যে ও কৃষ্টি-সভ্যতার হাজার বছরের এই মুসলিম ছাপ সুস্পষ্ট দীপ্তিমান।

প্রাকৃতিক আনুকূল্যও মুসলমানদের এই সাফল্যের সহায়ক ছিল। কি নৃতত্ত্বের দিক হইতে, কি ভাষা-কৃষ্টির দিক দিয়া পাক-বাংলা আর্য-ভারত হইতে বরাবরই ছিল পৃথক। আর্যরা কোনও দিন পারে নাই বাংলা জয় করিতে। প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতেই এ দেশ দ্রাবিড়দের দখলে ছিল। দ্রাবিড়রা বর্ণাশ্রম-ধর্মী।—আর্য ধর্মের চেয়ে বর্ণ-বিরোধী সাম্যবাদী বৌদ্ধধর্মের দিকেই বেশি আকৃষ্ট হয়। বাংলার পাল রাজারা বৌদ্ধ ছিলেন। তাঁদের আমলে এ দেশের জনসাধারণের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম, দ্রাবিড়ী কৃষ্টি ও বৌদ্ধসংস্কৃত ভাষার প্রচলন ছিল। পাল রাজার বাংলাদেশকে শুধু আর্য-কৃষ্টি ও সংস্কৃত

www.pathagar.com

ভাষার হাত হইতেই বাঁচার নাই, তাঁদের কেউ-কেউ মগধ পর্যন্ত দখল করিয়া আর্য-ধর্ম ও সংস্কৃত ভাষাকে বাংলার সীমানার বাহিরে বহুদূরে ঠেলিয়া দিয়াছিলেন।

পাল রাজাদের পরে সেন রাজারা যখন বাংলার নিজস্ব ভাষা ও কৃষ্টি দমন করিয়া ইহার উপর আর্য-কৃষ্টি ও সংস্কৃত ভাষা চাপাইবার অপচেষ্টা শুরু করেন, ঠিক সেই মুহূর্তে বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্ণাশ্রমবিরোধী বৌদ্ধধর্ম সাম্যবাদী ইসলামের সাহায্য ও সহযোগিতায় চূড়ান্ত ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা পায়। ইসলামী ছাপ লাইয় বাংলায় নয়া কৃষ্টি-জীবন গড়িয়া উঠা শুরু হয়। মুসলিম আমলে একটানা সাড়ে ছয়শ' বছর ধরিয়া চলিতে থাকে এই নয়া কৃষ্টি জীবন সৃষ্টির কাজ। তা এমন দানা বাঁধে যে মুসলিম শাসনের অবসানের পরেও উনিশ শতকের শেষ দিন অবধি দীর্ঘ একশ' বছর ধরিয়া সে কৃষ্টি–সাহিত্যের প্রভাব অক্ষুণ্ন থাকে।

নবাগত ইংরাজ শাসকরা তাদের সাম্রাজ্যবাদী কূটনৈতিক তাকিদে ও দেশ শাসনের সুবিধার খাতিরে হিন্দু-মুসলিম–বিরোধ সৃষ্টি প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে প্রচলিত ভাষা-কৃষ্টি–সাহিত্যের বিরুদ্ধে হিন্দুদের উস্কানি দেয়। বাংলা কৃষ্টি-সাহিত্যকে ইসলামী ছাপমুক্ত এবং বাংলা ভাষাকে আরবী ফারসী শব্দ বর্জিত বিশুদ্ধ আর্য ভাষা করিবার পরামর্শ দেয়। বাংলা ভাষাকে সংস্কৃতের কন্যা সাজাইবার অলঙ্কারাদির নির্মাণ-কার্য শুরু হয় এই সময় হইতে। এ কাজ শুরু করে ইংরাজরা একাই। সরকার ও মিশনারীদের সমবেত শক্তি নিয়োজিত হয় এই শুদ্ধিকরণে।

পুরা একশ' বছরের অবিশ্রান্ত চেষ্টায় বিশ শতকের গোড়ার দিকে এই সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের বিষময় ফল ফলিতে শুরু করে। প্রচলিত বাংলা ভাষা ও হাজার বছরের কৃষ্টি-সাহিত্যের বিরুদ্ধে এ্যাংলো-হিন্দু অভিযান সফল হয়। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পিতা, বাংগালী জাতির মেজরিটি মুসলমান এই অভিযানের মোকাবেলায় রুখিয়া দাঁড়ায়। ক্রমে মুসলিম-কৃষ্টির সাথে রিভাইভ্যালিস্ট হিন্দু-কৃষ্টির এবং প্রচলিত বাংলা যবানের সাথে সংস্কৃতীকৃত নব্য বংগ ভাষার সংঘাত বাধে। এই সংঘাতের শেষ পরিণাম পাকিস্তানের সৃষ্টি। পাক-বাংলার কৃষ্টির ইহাই পটভূমি।

তিনটি মুদ্দা কথা

একটি আলোচনার গোড়াতেই তিনটা মুদ্দা কথা বুঝিতে হইবে : এক, সাড়ে ছয়শ' বছরের মুসলিম শাসন বাংলায় কৃষ্টি-সাহিত্যের যে গৌরবময় ঐতিহ্য সৃষ্টি করিয়াছিল, তার সবটুকুই শাহী-নবাবী কালচার ছিল না। তার বেশির ভাগেরই একটা জাতীয় প্রাণ ও গণরূপ ছিল। বাদশাহি যাওয়ার পরও একশ' বছর এইটাই বাঁচিয়া ছিল। দুই, বিদেশী শাসকরা স্বদেশী প্রতিবেশীদের সহায়তায় দেড়শ' বছর ধরিয়া যে কৃষ্টি-সাহিত্যের বিরুদ্ধে সমবেত অভিযান চালাইয়াছিল, সেটা ছিল এরই বিরুদ্ধে। তিন, এই অবলুপ্ত জাতীয় কৃষ্টির রেনেসাঁ সাধনে তাকে যুগোপযোগী করিয়া আমাদের জাতীয় ব্যক্তিত্বকে সঞ্জীবিত করার দুর্নিবার তাকিদেই পাকিস্তানের সৃষ্টি। আরও সংক্ষেপে তিনটি কথা এই : আমরা কি ছিলাম? কি হইয়াছি? কি হইব?

আমরা নির্ভয়ে দাবি করিতে পারি, বাঙালী মুসলমানরা একটি সমৃদ্ধশালী ঐতিহাসিক কালচারের উত্তরাধিকারী প্রাচীন সভ্য জাতি। কালচার ঐতিহ্যহীন একটা

www.pathagar.com

ভূঁইফোঁড় জাতি আমরা—এমন কথা পরম শত্রুও বলিতে পারিবে না। নয়া রাষ্ট্রীয় জাতিত্বের দোহাই দিয়া অমন অজুহাত আমরা নিজেরাও দিতে পারি না। ইতিহাস সাক্ষ্য দিতেছে, বাংগালী মুসলমানরা ধর্ম ও সমাজ-জীবনের সকল ক্ষেত্রে তাদের বিশ্বাসে-ঈমানে, আচারে-অনুষ্ঠানে, আদবে-কায়দায়, খোরাকে-পোশাকে, জন্মে-মৃত্যুতে, শাদি-গমিতে, পরবে–উৎসবে, আমোদে-প্রমোদে, খেলায়–ধূলায়, নাচে-গানে, আর্টে-সাহিত্যে, শিল্পে–বাণিজ্যে, বীরত্বে-মহত্বে, যুদ্ধে-শান্তিতে, কামানে-বন্দুকে, অস্ত্রে-শস্ত্রে, দালানে-ইমারতে, ইনসাফে-আদালতে, আইনে-কানুনে একটা ব্যাপক ও সামগ্রিক, উদার ও উন্নত কালচার গড়িয়া তুলিয়াছিল।

সে কালচার শুধু মুসলমানের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে নাই। অমুসলমান বাংগালীর মধ্যেও পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। ফলে তা পাইয়াছিল একটা জাতীয় সত্তা ও সার্বজনীন রূপ। যুগের দাবিতে দেশজ পরিবেশে জাগরণের প্রেরণায় সামাজিক কল্যাণ ও রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনের তাকিদে ন্যাচারেল গ্রোথের মতোই সে কালচার ধীরে-সুস্থে গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই জন্যই তা পাইয়াছিল জাতীয় রূপ। ইতিহাস এও সাক্ষ্য দিতেছে যে বিদেশী শাসকরা তাদের রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনেই আর্য রিভাইভ্যালিযমের উস্কানি দিয়া আমাদের হাজার বছরের প্রতিবেশীকে শত্রুভাবাপন্ন করিয়া তুলিয়াছিল এবং তাদেরই সহায়তায় রাজশক্তির দমন-নিষ্পেষণের দ্বারা সে কালচারের ধ্বংসাভিযান চালাইয়াছিল। এমনিভাবে রাজ–রোষে আমাদের কালচারের অপমৃত্যু ঘটে; বার্ধক্যের দরুন তার স্বাভাবিক মৃত্যু হয় নাই।

সে নিধন-যজ্ঞের কথা ইতিহাস-পাঠকরা জানেন। শাসকরা কেমন করিয়া কলমের এক খোঁচায় প্রচলিত রাষ্ট্র-ভাষার পরিবর্তন করিয়া যুগ যুগান্তের শাসক–বিচারকদেরে অফিস-আদালত হইতে বাহির করিয়া রাস্তার ধূলায় নামাইয়া দেয়, শিক্ষা-নীতি পাল্টাইয়া কেমন করিয়া তারা হাজার বছরের ইন্টেলিজেনশিয়াকে নিরক্ষর মূঢ়ের জাতে পরিণত করে, রিযাম্পশন পলিসির নামে কিরূপে তারা এক কালের সম্পদশালী অভিজাত সম্প্রদায়কে দীনহীন পথের কাংগালে রূপান্তরিত করে, ইতিহাসের ছাত্ররা তার সব খবরই রাখেন। এটা কালচার রক্ষার পরিবেশ ছিল না। মুসলমানদের আত্মরক্ষাই যখন একরূপ অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল, তখন কালচার রক্ষার প্রশ্নই উঠে না।

আজিকার প্রশ্ন

কিন্তু আজ? আজিকার কৈফিয়তটা কি? এত বড় সম্পদশালী ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী প্রাচীন জাতি হইয়াও যদি আমরা আজ কালচারে গরীব হই, আঠার বছরের স্বাধীনতার পরেও যদি আমরা কৃষ্টির স্বকীয়তায় প্রতিষ্ঠিত হইতে না পারিয়া থাকি, তাবে সে দোষ দিব আমরা কাকে? বাদশাহি যাওয়ার সাথে সাথেই আমাদের কালচারের শাহী রূপটুকু যে গিয়াছে, সেটা বড় কথা নয়। বাদশাহি থাকিবার জিনিসও নয়। এ যুগের তন্ত্রও সেটা নয়। আমরা সবাই নবাব-বাদশাও ছিলাম না। সবাই আমরা নবাব-বাদশার বংশধরও নই। আমরা মুসলিম জনসাধারণ মুসলিম শাসনামলেও আর দশজনের মতোই প্রজাসাধারণই ছিলাম। কাজেই মুসলিম আমলের কালচারের শাহী

www.pathagar.com

রূপ নয়, গণ রূপটাই বড় কথা। ঐ রূপেই ছিল সেটা আমাদের কালচার। ওটারই আমরা উত্তরাধিকারী। তারই রক্ষণ ও বিকাশনই আমাদের দায়িত্ব। কাজেই আমাদের বুঝা দরকার, সেটার রূপ কি ছিল, কি হইয়াছে, আর কি হইতে হইবে।

আগের আলোচনা হইতে এইটুকু নিশ্চয় পরিষ্কার হইয়াছে যে, মানুষের ধর্মোৎসবে, আচারে-অনুষ্ঠানে, নামে-নিশানায়, খোরাকে-পোশাকে আর্টে-সাহিত্যে, নাচে-গানে ও আদবে-কায়দায়ই তাদের কালচারের গণরূপ প্রতিফলিত ও বিকশিত হয়। কাজেই আমাদেরও কালচারের ঐতিহ্য ও বর্তমান এ সবের মধ্যেই সন্ধান করিতে হইবে।

প্রথমেই ধরুন ধর্মোৎসবের কথা। ধর্মোৎসবই সকল জাতির কৃষ্টিজীবনের সবচেয়ে প্রশস্ত ও উর্বর ক্ষেত্র। ধর্ম ও কৃষ্টির সম্পর্ক যে গাছ ও ফলের সম্পর্কের মতোই ঘনিষ্ঠ, সে কথা আগেই বলিয়াছি। বস্তুত ধর্মীয় অনুষ্ঠানের স্কেলিটন ঘেরিয়া সামাজিক আচার-আচরণ ও আমোদ-প্রমোদের যে লহু-গোশত ও রগ-রেশা গড়িয়া উঠে, তার সমষ্টির নাম ধর্মোৎসব।

এই ধর্মোৎসবের বিকাশ ও বিস্তৃতিই কালচারের ইনফ্রাস্ট্রাকচার। এই সব উৎসবের প্রথম গুণ এই যে, এতে পুণ্যার্জন ও আনন্দ উপভোগ এক সংগে করা চলে। শেষ পর্যন্ত ধর্মোৎসবের ধর্মটুকু যে উৎসবের মধ্যে তলাইয়া যায়, তাতেও মানবজাতির লোকসান হয় না। কারণ ধর্মের দিক হইতে তারা যা হারায়, কৃষ্টির দিক হইতে লাভ করে তার চেয়ে অনেক বেশি। বস্তুত স্থপতি-ভাস্কর্য শিল্প-সংগীত ও কাব্য সাহিত্যের জন্মই এইখানে। ওদের দ্বিতীয় গুণ এই যে, ওসবের আয়োজন করে অবশ্য মুষ্টিমেয় ধনী-লোক, কিন্তু আনন্দটা ভোগ করে ধনী-নির্ধন সকলে। তৃতীয় গুণ এই যে, এই সব উৎসবে অন্য ধর্মের লোকদেরেও আকৃষ্ট করে এবং তাদের ভোগেও লাগে। ফলে তারা পরিণত হইতে পারে জাতীয় উৎসবে। মসজিদ মন্দির গির্জার বাইরে যে উৎসব যতটা প্রসারিত হয়, জাতীয় রূপ পাইবার সম্ভাবনা হয় তার তত বেশি।

ধর্মানুষ্ঠান ও আর্ট

এই সব কালচারেল অনুষ্ঠানের আনন্দোৎসবের মধ্যে দিয়াই জাতির সমবেত মন বিকশিত হয়। মানুষের আনন্দ-পিপাসু অতৃপ্ত মন আনন্দরসের আবেহায়াতের তালাশে অজানা স্বপ্নের দেশে উড়িয়া যায় কল্পনার বোর্‌রাকের ডানায় চড়িয়া। মন-পবনের নাওয়ে চড়িয়া মাশুক শাহযাদীর তালাশে সে পার হইয়া যায় সাত সমুদ্দুর তের নদী।

এই মানসিক এ্যাডভেনচারেই মানুষ সাক্ষাৎ পায় নিত্য-নতুন সত্য-সুন্দরের। তাকেই তারা বাঁধিয়া রাখিতে চায় আর্টে-সাহিত্যে। সুরতের সংগে সিরতের, বহিরাকৃতির সাথে অন্তর-প্রকৃতির, ব্যক্তের সাথে সত্যের এপিয়ারেন্সের সাথে রিয়্যালিটির সার্থক সমন্বয় ঘটানই আর্টের কাজ। এই সমন্বয়ের সার্থকতা রসসৃষ্টিতে। তার সাফল্য সত্য ও সুন্দর লাভে। উভয়ের সমন্বয়ে যা, হয় তাই সত্য-সুন্দর। এটাই সুফী ধর্মের সাফল্য। সমস্ত কৃষ্টি-সংস্কৃতির চরম উৎকর্ষ। কারণ সত্য ছাড়া সুন্দর নাই। সুন্দর ছাড়া সত্য নাই। সত্যহীন সুন্দর নিম্নস্তরের রস মাত্র। আর সুন্দরহীন সত্য অকিঞ্চিৎকর ঘটনা মাত্র।

www.pathagar.com

এই সত্য সুন্দরের অস্তিত্ব গোড়াতে থাকে মানুষের কল্পনায়। আজিকার কল্পনাই আগামীকালের বাস্তব। আজ যা সত্য, গতকাল তাই ছিল অসত্য। আজিকার ধর্ম, গতকাল ছিল অধর্ম, দণ্ডনীয় পাপ। সমস্ত ধর্ম-প্রবর্তক ও সত্য-আবিষ্কারকের জীবনই এর প্রমাণ। সত্য ও সুন্দর লাভের চিরন্তন ইতিহাসই এই। বর্তমানে অতৃপ্তিই মানসিক এ্যাডভেনচারের বুনিয়াদ। বাস্তবের বাইরে যাওয়ার নামই কল্পনা। এ যেন শূন্যে আসমানে স্পেসে লাফ দেওয়া। একমাত্র অতৃপ্ত ক্ষিধাই এমন সাংঘাতিক ঝুঁকি নিতে পারে। কাজেই যে জাতির এ ক্ষিধা নাই, সে অসুস্থ। যে জাতির কল্পনা নাই সে মৃত। দুনিয়াকে দিবার কিছু নাই তার।

এই স্বপ্ন কল্পনাকে গণ-জীবনে প্রয়োগ সার্থক ও সফল করার প্রধান, এমন কি প্রায় একমাত্র পথ ধর্মোৎসবের আনন্দোল্লাস। হিন্দুর দুর্গোৎসব জন্মাষ্টমীর, বৌদ্ধের মাঘী-পূর্ণিমার, খৃস্টানের বড়দিনের আনন্দোৎসবের জীবন-প্রাচুর্যে তা সুস্পষ্ট। কিন্তু পাক-বাংলার গণ জীবনে সে আনন্দোল্লাস কই? কোথায় ঈদ? কোথায় মোহররম। এ সব উৎসব-পরবে পাক-বাংলার মনের আকাশে জীবন-প্রাচুর্যের লক্ষ তারকা জ্বলিয়া উঠে কি। আমাদের জীবন-সাগরে কর্ম-চঞ্চল্যের ঝড় উঠে কি? আমাদের দেহের শিরায়-শিরায় নবজীবনের দ্যোতনার বিদ্যুৎ-প্রবাহ ছুটে কি? প্রাণ-রসের উচ্ছলতায় আমরা ফাটিয়া পড়ি কি? প্রাণের প্রাচুর্য ত কোথাও দেখি না। যা কিছু প্রাচুর্য সবই ত দেখি খানা-পিনায়। শুধু পোলাও-কোর্মা আর সিমাই-যর্দা-সিমাই-যর্দা আর পোলাও-কোর্মা এই আমাদের কৃষ্টি-সংস্কৃতি? আমাদের কালচার কি শেষে খানা-পিনায় সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িল?

ঈদুল-ফিতরের নযির

ঈদুল-ফিতরের কথাটাই ধরা যাক। এই ঈদ আসে ত্রিশ দিন রোযার পরে। রোযার ত্রিশ দিনকে যদি সংযম কৃচ্ছ্র সাধনার মুদ্দত ধরা যায়, তবে রোযা-শেষের ঈদের দিনে প্রাণ-প্রাচুর্যের বাঁধ-ভাংগা বন্যায় আমাদের জীবনের দুকূল ছাপাইয়া পড়া উচিত।

ঈদ অর্থ আনন্দোৎসব। কিন্তু আমাদের ঈদ আর তা নাই। ধর্মোৎসবের ধর্মটুকু উৎসবের উল্লাসের নিচে চাপা পড়ার নযির আছে দুনিয়ায় অনেক। কিন্তু ধর্মের নিচে উৎসব চাপা পড়ার নযির দুনিয়াতে মাত্র একটি। তা আমাদের ঈদ। আনন্দ-উল্লাসের উন্মত্ততায় আমরা খোদাকে ভুলিয়া না যাই—এই উদ্দেশেই ঈদ উৎসবের শুরুতে দুই রাকাত সুন্নত নামাযের বিধান করা হইয়াছিল।

তার কারণ ছিল। উল্লাসের উন্মত্ততায় সব উৎসবই আখেরে পাপাচারের ভৈরবীচক্রে পরিণত হয়। ইতিহাসের শিক্ষা এই। তাই ঈদে এই সাবধানতা অবলম্বন করা হইয়াছিল। ঈদের সমাবেশকে ইবাদতের জমাতে পরিণত করার উদ্দেশ্য তাতে ছিলনা।

সেইজন্যই এতে নমাযের অনেক আহকাম ও আরকান—যথা : অযু, আযান একামত ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হয় নাই। হায়েযওয়ালী মেয়েদেরেও ঈদের জমাতে শামিল হওয়ার তাকিদ এই কারণেই করা হইয়াছে। গৌরবের যুগে মুসলমানরা ঈদের উৎসবকে ঈদরূপেই পালন করিয়াছে। স্বাধীন ও প্রগতিশীল মুসলিম রাষ্ট্রসমূহে আজো

www.pathagar.com

তাই করা হইতেছে। বাংলা ও ভারতে মুসলিম আমলে আমরাও ঈদকে জাতীয় আনন্দোৎসব হিসাবেই পালন করিতাম।

এই আনন্দোৎসবকে আমরা প্রার্থনা-সভায় পরিণত করিয়াছি আমাদের পতনের যুগে। স্বভাবতই এটা ঘটিয়াছে। সাময়িক বিপদেও মানুষ তার আনন্দোৎসবকে সংক্ষিপ্ত ও সঙ্কুচিত করে। স্থায়ী বিপদে ত কথাই নাই। দুর্দিন দীর্ঘস্থায়ী হইলে মানুষ অদৃষ্টবাদী ও অতিরিক্ত ধার্মিক হইয়া পড়ে আমরাও তাই হইলাম। প্রায় দুই-দুইশ' বছর কি বিপদটাই না গেল আমাদের উপর দিয়া! জান-মাল, মান-ইযযৎ কিচ্ছু ছিল না। সর্বাত্মক যুলুমে প্রাণ রাখিতেই আমাদের প্রাণান্ত! আনন্দোৎসব করিব কখন? তাই ঈদের দিনের ধর্মের যে বিধানটুকু না করিলেই নয়, সেইটুকু শুধু করিলাম, পারিলে ময়দানে গিয়া নয় ত মসজিদেই। আর বেশির ভাগ ঘরের কোণে বসিয়া বিপদ-তারণ আল্লাহ দরগায় কান্নাকাটি করিয়া কাটাইলাম দুই-দুইশ' বছর। এই সময়েই আমাদের জীবন হইতে গেল স্বাচ্ছন্দ্য, সমাজ হইতে গেল উৎসব, ঘর হইতে গেল আনন্দ। সেই সঙ্গে গেল আর্ট ও সাহিত্য। আর্ট-সাহিত্য–সংস্কৃতি কাকে বলে, তা যেন আমরা ভুলিয়াই গেলাম। আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনের সর্বাপেক্ষা উর্বর ক্ষেত্র ঈদ-পর্ব সৃজনীশক্তির দিক দিয়া হইয়া গেল বন্ধ্যা। আমাদের আর্টে–সাহিত্যে নামিয়া আসিল সন্ধ্যা।

নিরানন্দের পরিণতি

ফলে, আজ আমাদের ঈদে আনন্দ নাই, আছে বেদনা। সংস্কৃতি নাই, আছে বিকৃতি। উল্লাস নাই, আছে আর্তনাদ। আনন্দের ক্ষিধা মানুষের পেটের ক্ষিধা ও যৌন ক্ষিধার মতোই তীব্র। সুস্থ ও স্বাভাবিক পথে নির্মল আনন্দ না পাইলে মানুষ পাপের পথে গিয়াই আনন্দ উপভোগ করে। তার উপর পরবাদিতে মানুষের আনন্দ-ক্ষুধায় আসে জোয়ার। এই সময় সাংস্কৃতিক আনন্দ-অনুষ্ঠানে সে ক্ষুধার তৃপ্তি না ঘটাইলে মানুষ কুপথে গিয়া সে পিপাসা মিটাইবেই। আমাদের জীবনে তাই হইতেছে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের নির্মল আনন্দের অভাবে ঈদের দিনের প্রাণের জোয়ার থামাইতেছি আমরা সিনেমা দেখিয়া, কুস্থানে গিয়া এবং ক্লাবে 'ঈদবল' নাচিয়া। এটা বেদনার ও বিকৃতির নযির।

আর্তনাদের নযিরটা আরও প্রত্যক্ষ। মুসলমানদের মধ্যে কত যে বিকলাংগ, কুষ্ঠরোগী ও বেকার ভিক্ষুক ছেলে-বুড়া নারী–পুরুষ আছে, তার প্রদর্শনী করি আমরা ঈদের দিনে, সদর রাস্তায় ঈদের ময়দানে। বিকলাংগ, কুষ্ঠরোগী ভিক্ষাজীবী কমবেশী অপরাপর জাতির মধ্যেও আছে। ধর্মস্থানে দান-খয়রাত উপলক্ষে তাদের ভিড়ও হয় নিশ্চয়ই। কিন্তু জাতীয় আনন্দোৎসবের অনুষ্ঠানে এদের বীভৎস ভিড় হওয়ার ব্যবস্থা বোধ হয় আর কোনও জাতিতে নাই। সমাজ-দেহে ঘা–পাঁচড়া অল্পবিস্তর সব জাতিতেই আছে। বিশেষত শোষণবাদী ধনতন্ত্রী সমাজ দেহে তা বেশি করিয়াই থাকে। কিন্তু জাতীয় আনন্দোৎসবের দিনে ঘটা করিয়া তার প্রদর্শনী খুলে না কেউ। সভ্য মানুষ শরীরের খোস-পাঁচড়া মলম-পট্টি দিয়া ঢাকিয়াই রাস্তায় বাহির হয়। দেহের ঘা বড় ও বিদকুটে করিয়া গুপ্তস্থানের ঘা কপালে ছড়াইয়া ক্ষতের ডিমনস্ট্রেশন করে শুধু

www.pathagar.com

তারাই পরের দয়ার উদ্রেক করিয়া ভিক্ষা করিয়া খাওয়া যাদের পেশা। যে জাতি ভিক্ষাকে কালচারে সমুন্নত করিয়াছে, তারা ছাড়া আর কেউ এটা পারে না। আমরা পারি, পারি বলিয়াই আমাদের কচি শিশু ছেলে-মেয়েরা ভিক্ষাকে পেশা করিয়াছে। ঈদের দিনে এইসব বিকলাংগ ভিক্ষুকের যে সমবেত আর্তনাদের জবাবে আমরা দুহাতে ফেৎরো-যাকাতের পাই-পয়সা বিলাইয়া কড়ির মূল্যে বেহেশত কিনিতেছি, সেটা আসলে ভিখারির আর্তনাদ নয়, আমাদের কৃষ্টি-সংস্কৃতিরই আর্তনাদ।

আমাদের তরুণরা এটা তীব্রভাবে অনুভব করে বলিয়াই তারা সম্প্রতি ঈদ রিইউনিয়নের আয়োজন করিতেছে।

এটা শুভ সূচনা। কিন্তু এখনও এ অনুষ্ঠান খানা-পিনাতেই সীমাবদ্ধ। একে সাংস্কৃতিক অলংকার পরাইয়া আমাদের প্রমাণ করিতে হইবে যে, মুসলমানের কালচারের চৌহদ্দি পেট নয়।

মোহররমের জীবন-প্রাচুর্য

একমাত্র মোহররম পর্বেই মুসলমানেরা অন্যান্য কালচার গ্রুপের সাথে খানিকটা প্রতিযোগিতা করিয়াছে। প্রাক-স্বাধীনতা যুগে ঢাকার জন্মাষ্টমী ও কলিকাতার বড়দিনের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিত একমাত্র কলিকাতার মোহররম। দশ লক্ষ মুসলমানের এই উৎসব পঞ্চাশ লক্ষ বাশিন্দার কলিকাতা নগরীকে পায়ের বুড়া আংগুলে খাড়া রাখিত দশ-দশটা দিন।

তৎকালে বাংলার শহরে-বন্দরে পাড়াগাঁয়ে দশ দিন ধরিয়া ঢাকঢোল-সানাই ও কাড়া-নাকাড়া-দামামার গুরু-গম্ভীর আওয়ায আসমান-ফাটাইয়া পাতাল কাঁপাইয়া ঘোষণা করিত : এই আসিয়াছে মুসলমানের উৎসব মোহররম।

প্রতি গাঁ-মহল্লা হইতে এক বা একাধিক আখড়া বাহির হইত। লাঠি-তলোয়ার, সড়কি-বল্লম ও ছুরি-রামদাও ইত্যাদি খেলার বুক কাঁপানো সাংঘাতিক প্রতিযোগিতা করিত তারা। হাজার-হাজার লোক অবাক-বিস্ময়ে দেখিত সে অস্ত্রের খেল্।

কাতল্-মন্যিলেরা দিন যতই ঘনাইয়া আসিত খেলোয়াড় ও দর্শকদের উত্তেজনা-উদ্দীপনা ততই বাড়িয়া যাইত। যেন 'দিকে দিকে চলে কুচকাওয়াজ' সত্য-সত্যই। এ যেন 'শহিদী সেনারা' সত্য-সত্যই সাজিয়াছে। যেন নিজ কানে শুনিতেছি : উর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল, নিম্নে উতলা ধরণী তল।' কাজেই 'চল্‌রে চল্' না বলিয়া যেন উপায় নাই। খেলা-রত চলমান আখড়ার পিছনে পিছনে চলিত উদ্দীপিত জনতা।

আখড়াগুলি ক্রমে জমায়েত হইত শহরে-বন্দরে। কাতলের দিনে সমবেত আখড়াসমূহের বাছাই করা খেলোয়াড়দের মধ্যে হইতে দ্বন্দ্বযুদ্ধ প্রতিযোগিতা। সে কি রোমাঞ্চকর লড়াই! মুগ্ধ বিপুল জনতা দেখিত সে অস্ত্র চালনার উস্তাদি। দর্শকরা চাঁদা করিয়া শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়দের দিত খেলাত-পুরস্কার।

বড়দের এই প্রাণ-মাতানো সাহসিকতার খেলা দেখিয়া ছোট ছোট ছেলেরাও কাঠের তলোয়ার, তালপাতার ঢাল ও টিনের ঢোল বানাইয়া এযিদ-ইমামের লড়াই করিত।

আখড়ার লাঠিখেলা ছাড়াও আগের দিনে বিভিন্ন পর্ব উপলক্ষে পাড়াগাঁয়ে ঘোড়দৌড়, নৌকা-বাইচ, ডন-কুস্তি-কসরত ও হরেক রকম বীরত্বপূর্ণ খেলা হইত।

www.pathagar.com

পর্বোপলক্ষ্যেই সমবেতভাবে এইসব খেলা হইত বটে, কিন্তু এ সবের প্রস্তুতি চলিত প্রায় সারা বছরই।

তাতে আমাদের মধ্যে একটা জংগী ঐতিহ্য ও সামরিক কালচারও গড়িয়া উঠিয়াছিল। এইসব অনুষ্ঠানে মুসলিম-বাংলার আকাশ-বাতাস জীবন-প্রাচুর্যে মুখরিত হইয়া উঠিত। শুধু স্বদেশবাসী ভিন্ন সমাজের লোকেরাই নয়, বিদেশী আগন্তুক ও পরিব্রাজকেরাও বুঝিত মুসলিম-বাংলার গণ-জীবনে কৃষ্টির প্রাণ-প্রাচুর্য রহিয়াছে এবং সেটা জীবন্ত। কিন্তু দুর্ভাগ্য, আজ আর তা নাই।

চিত্র-শিল্পে

জাতির স্বপ্ন-কল্পনাকে যাঁরা তুলির পোঁচে মূর্তিমান বাস্তব করিয়া তুলেন, তাঁরা চিত্রকর। কৃষ্টির এই ক্ষেত্রে আমরা অতীত-ভুলা। এই সেদিন যয়নুল আবেদিনের আবির্ভাবের আগে পর্যন্ত পাক-বাংলার চিত্র-জগতে ছিল অমাবস্যার অন্ধকার। অসামান্য প্রতিভার অধিকারী হইয়াও যয়নুল ও তাঁর শাগরিদরা যে তাঁদের প্রাপ্য মর্যাদা ও উৎসাহ হইতে বঞ্চিত হইতেছেন, চিত্র-বিদ্যা মুসলিম কালচারের বিরোধী-এই ভ্রান্ত ধারণাই তার মূল কারণ।

চিত্র-বিদ্যার বিরুদ্ধে শরিয়তী কড়াকড়ি থাকার ফলে মুসলিম কৃষ্টিতে তা বিকশিত হইতে পারে নাই-এ ধারণা ভুল। বস্তুত কোন ধর্মের সনাতনীরাই চিত্র-বিদ্যার পূর্ণ বিকাশকে সুনযরে দেখেন নাই। অন্যান্য সমাজের মতই মুসলিম সমাজেও চিত্র-শিল্পীরা সনাতনীদেরে ভক্তিভরে এড়াইয়া চলিয়াছিলেন এবং তাঁদের অমতেই নিজেদের সৃজনী-প্রতিভাকে তুলির রেখায় বাঁধিয়াছেন।

মুসলিম শাসকদের প্রায় সকলেই চিত্র-শিল্পের উৎসাহদাতা ছিলেন। তার নযিরে ইতিহাসের পৃষ্ঠা ভর্তি। দামেশক-বাগদাদের খলিফা, স্পেনের সুলতান, পারস্যের শাহ এবং দিল্লীর সম্রাট ও বাংলার নবাবদের অনেকেই চিত্র-শিল্পের মুরুব্বি ছিলেন। বাগদাদের খলিফা মতাওয়াক্কেল 'আলেফ লায়লা'কে সচিত্র করিয়াছিলেন। দিল্লীর বাদশাহ হুমায়ুন আমির হামযার বিজয় কাহিনীকে সচিত্র করিবার জন্য পঞ্চাশ জন চিত্র-শিল্পী নিয়োগ করিয়াছিলেন। তাঁরা দুই হাজার চিত্রের এই কাহিনী সমাপ্ত করেন।

বাংলার মুসলমান চিত্র-শিল্পীরা সতর-আঠার শতকেই লায়লী-মজনু, শিরি-ফরহাদ, শাহনামা, আমির হামযা, জংগনামা, শহীদে-কারবালা, ইউসুফ-যোলেখা, সয়ফুল-মুলুক, সোনাভান ইত্যাদি অনেক পুঁথিকে সচিত্র করিয়াছিলেন। পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে আমরা ছেলেবেলায় এইসব পুস্তক সচিত্র দেখিয়াছি। আমাদের তৎকালীন মুরুব্বিরা সকল দিক হইতে 'পাক্কা মুসলমান' হইয়াও এইসব চরিত্র কিতাব ঘরে রাখিতে ও পড়িতে আপত্তি করিতেন না। বিশ শতকের তৃতীয় দশকের ছাপাতেই এই সব ছবি প্রথম পরিত্যক্ত হয়, বোধ হয়, খেলাফত আন্দোলনের কালে, আলেম-ওলামাদের চাপে।

কাজেই চিত্র-শিল্পে পাক-বাংলার নিজস্ব কোনও ঐতিহ্য নাই, এ কথা বলা চলে না। যয়নুল আবেদিনের আবির্ভাব তাই যুগ-প্রবর্তন হইলেও আকস্মিক নয়। যয়নুলের প্রতিভা আমাদের ঐতিহ্যকে বিপুল সম্ভাবনার রাজপথে তুলিয়া দিয়াছে এতে কোন সন্দেহ নাই। পাকিস্তান হাসিলে শিল্প-সাহিত্যের যে একটি মাত্র ক্ষেত্র

www.pathagar.com

আমাদের সাংস্কৃতিক রেনেসাঁ নিশ্চিতরূপে আশাজনক প্রমাণিত হইয়াছে, তা যয়নুলের নেতৃত্বে চিত্র-শিল্প। সাংস্কৃতিক স্রষ্টাদের মধ্যে যয়নুলই আজো এক মাত্র শিল্পী যার দৃষ্টি আসমানে, কিন্তু পা জমিনে।

সংগীত শিল্পে

আমাদের নিজস্ব কালচারকে যাঁরা সংগীতে ঝংকৃত করিতে পারিতেন, তাঁদের মধ্যে নজরুল ইসলাম ও আলাউদ্দিন আজ হিন্দুস্থানে; আব্বাসুদ্দিন ও খসরু আজ পরলোকে। মোমতায-আলিমরা তরুণদের কাছে অবহেলিত—ঐ সংগে ভাটিয়ালি-মুর্শিদিও। তরুণরা রবীন্দ্র সংগীতের ছায়ানটে আধুনিক গানের নিক্কণ তুলিতেই মত্ত। এদের ধারণা পাক-বাংলার স্বকীয় কোনো গীতি-ঐতিহ্য নাই।

এ ধারণা নিতান্ত ভ্রান্ত। আসলে পাক-বাংলার স্বকীয় গীতি-ঐতিহ্য গৌরবময়। পাক-ভারতের প্রায় হাজার বছরের মুসলিম গীতি-ঐতিহ্যেরই এটা একটা মহিমময় অধ্যায়। পাক-ভারতের সে গীতি-ঐতিহ্য বিশ্ব-মুসলিম সভ্যতার আরব-পারস্য তুর্কী ঐতিহ্যেরই অবিচ্ছেদ্য অংগ।

মুসলিম দুনিয়ার সংগীত

আট শতক হইতে আঠার শতক পর্যন্ত একটানা একটি হাজার বছর আরব পারস্য ও ভারতের মুসলমানরা তদানীন্তন সভ্য-জগতে সংগীত শিল্পের নেতা, সংগীত-শাস্ত্রের শিক্ষক ও সংগীত-বিজ্ঞানের আবিষ্কর্তা ছিলেন। এই যুগের মুসলিম মনীষীদের অনেকেই আজও সংগীতের ইতিহাসে অমর হইয়া আছেন।

আরবের আল-কাতিব ও আল-কিন্দি, পারস্যের আলফারাবী ইবনেসিনা, আবুল ফয়েয ইসহাক, আবুল ফয়ায ইস্পাহানী, সুফী সাধক ইমাম আল-গাযযালী, স্পেনের আল-খলিল এবং ইবনে কিরমান ও ভারতের আমির খসরু ও মিয়াঁ তানসেনের নাম সংগীত-শিল্পের সাথে চিরদিন অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত থাকিবে। এইসব মনীষী ও তাঁদের শাগরিদদের অনেকেই সংগীত, সুর, তাল, রাগ-রাগিনী ও বাদ্যযন্ত্র সম্পর্কে বড়-বড় বই-পুস্তক রচনা করিয়া গিয়াছেন। সেসব বই আজও সংগীত-শাস্ত্রের অথরিটি বলিয়া স্বীকৃত।

পাঠান আমলে সংগীত

বাংলায় আরবী সংগীতের চর্চা শুরু হয় সুলতান বগরা খাঁর আমল হইতে। তিনি ও তাঁর পুত্র শাহযাদা কায়কোবাদ সংগীতের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কায়কোবাদ পরে দিল্লীর সম্রাট হইলে আমির খসরু তাঁর সভাকবি ও গায়ক হন। কায়কোবাদের পর সম্রাট আলাউদ্দীন খিলজী দিল্লীর সিংহাসন দখল করিলে আমির খসরু তাঁরও সভাকবি ও গায়ক থাকেন। আমির খসরুর সংগীদের মধ্যে হাসান-সনযিরও নামযাদা উস্তাদ ছিলেন।

খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্‌তী, সেলিম চিশ্‌তী, নিযামুদ্দিন আউলিয়া প্রমুখ সুফী-দরবেশগণও উস্তাদ সুর-শিল্পী ও সাধক গায়ক ছিলেন। নিযামুদ্দিন আউলিয়া ইবাদতের

www.pathagar.com

সময় সামা (গান) গাইতে গাইতে তন্ময় হইয়া পড়িতেন। তাঁর সময়ে তাঁর পরে সূফীরা সকলেই সামা (গান) গাইতেন। সেলিম চিশ্‌তী চিশতিয়া তরিকার গানের প্রবর্তক।

মোগল আমলে সংগীত

পাঠান আমলের মতই মোগল আমলেও সংগীত-চর্চা শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে। সম্রাট আকবরের দরবারে পঁয়ত্রিশ জন বিখ্যাত গায়ক ও বাদকের সমাবেশ হয়। তানসেনের নাম সবাই জানেন। তাঁর যোগ্য সহযোগী আরও অনেক ছিলেন। মোগল সম্রাটদের সকলেই এমনকি সম্রাট আওরংগযেবও সংগীতের সমঝদার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। পাঠান ও মোগল সম্রাটদের শাহী দরবারে নর্তকীদের নাচ ও গানের প্রচলন ছিল। সম্মানিত মেহমানদের অভ্যর্থনার জন্য নাচ-গানের বিশেষ ব্যবস্থা হইত।

সংগীতের হাজার রাগ-রাগিনীর ও শত শত বাদ্য-যন্ত্রের আরবী-ফারসী নামেই হাজার বছরের মুসলিম প্রভাব দেদীপ্যমান। সুস্পষ্ট আরবী-ফারসী নাম ছাড়াও আরও অনেকগুলি প্রচলিত নাম আরবী-ফারসীর অপভ্রংশ মাত্র। পাক–বাংলা ভারতের অধুনা-প্রচলিত রাগ-রাগিনীর অধিকাংশের আবিষ্কার্তা আমির খসরু। তাঁর আবিষ্কৃত সুরে তাঁরই রচিত গানসমূহ আজও মুখে–মুখে গীত হয়। ঐ সব গান এখনও উর্দু-হিন্দী সংগীতের মূল্যবান সম্পদ বলিয়া সুধীসমাজে স্বীকৃত।

বাদশাহী আমলের পরেও ইংরাজ আমলের একশ' বছর ধরিয়া পাক-ভারতীয় সংগীতে মুসলিম নেতৃত্ব বজায় ছিল। হিন্দু সংগীত-বিশারদ বিশ্ববিশ্রুত বিষ্ণুনারায়ণ ভারতখণ্ডে মুসলমানদের কাছে সংগীতের এই ঋণের কথা স্বীকার করিয়াছেন।

পাক বাংলায় সংগীত চর্চা

পাক-বাংলার মুসলমানদের মধ্যে মুসলিম আমলের শেষ দিন পর্যন্ত সংগীতের কদর ও আদর ছিল অপরিমিত। তার প্রমাণ পাওয়া যায় পুঁথি সাহিত্যে। অনেকগুলি পুঁথিতেই ঘটনা–বর্ণনার মধ্যে বিবরণের সাথে সংগতিপূর্ণ গান দেওয়া আছে। শিরোনামায় সুর ও তালের উল্লেখ আছে। এতে ধরিয়া লওয়া যায় শায়েররা নিজেরা গায়ক ছিলেন অথবা অন্তত তাল ও রাগ-রাগিনীর সহিত পরিচিত ছিলেন। ষোল শতকের লেখা দৌলত উযির বাহরাম খাঁর 'লায়লি–মজনু', সতর শতকের লেখা আলাওলের 'রাগনামা' ও 'রাগ-মালা', সৈয়দ আয়েনুদ্দিনের 'তালনামা', দানেশ কাযীরা 'সৃষ্টি পত্তন', আলি রাযার 'ধ্যানমালা', জীবন আলীর 'রাগ-তালের পুঁথি', ইত্যাদি পুস্তক তৎকালে বাংলায় মুসলমানদের সংগীত-চর্চার প্রমাণ। পরবর্তীকালে আলী মিয়ার 'রাগনামা' ও তাহের মোহাম্মদের 'তালনামা'য় রাগ–তালসহ অনেক শায়েরের গানের পদ দেওয়া আছে। শেখ চাঁদ, সৈয়দ আয়েন উদ্দিন, সৈয়দ মুর্তযা, নাসির উদ্দিন, ফৈয়ায ও আলাওলের নাম তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। সৈয়দ মুর্তুযার 'তালনামা' নামে একটি গানের বইও আছে। এঁরা ছাড়া উনিশ শতকের প্রথম ভাগে 'চম্পা গাযীর গানের বই' নামে একটি বই পাওয়া যায়। চম্পা গাযী চাটগাঁর পটিয়া থানার লোক। গানের উস্তাদ ছিলেন তিনি।

www.pathagar.com

পতনের যুগ

এই আলোচনায় দেখা গেল, গান শরিয়ত-বিরোধী এই যুক্তিতে মুসলমানদের মধ্যে সংগীত-চর্চা ছিল না, এটা ভ্রান্ত ধারণা। বাংলাতেই ইহা সীমাবদ্ধ। আসলে মুসলিম শাসনামলে এবং তার পরেও অনেক দিন পাক-বাংলাতে সংগীত-চর্চা নবাব দরবারে সুধী-মজলিসে ও জনসমাজে সমানভাবে কৃষ্টির সমাদৃত ও সম্মানিত অংগ ছিল। তবু যে পাক-বাংলায় এই ভ্রান্ত ধারণা ও সত্য-সত্যই সংগীতের প্রতি একদা বিরূপ ভাব সৃষ্টি হইয়াছিল, তার ঐতিহাসিক সংগত কারণ আছে।

ইংরাজ শাসকদের সর্বাত্মক জুলুমবাজি ও বর্বর অত্যাচারের স্টিম রোলার বাংলার মুসলমানদের উপরই চলে সবচেয়ে বেশি। ওহাবী আন্দোলন ও সিপাহী গণ-বিপ্লবের আকার ধারণ করে পাক-বাংলাতেই। যালেম ইংরাজ শাসকদের যুলুম-নিপীড়ন যত বাড়ে, বিপ্লবী নেতৃবৃন্দের মধ্যে অস্টারিটি ও কৃচ্ছ্রসাধনার সংকল্প হয় তত দৃঢ়। ওহাবী মতবাদ একটা সংস্কারবাদ। এঁরা ছিলেন বিশুদ্ধচারী বা পিউরিটানিস্ট। ভোগ-বিলাসিতা এঁরা নিজেরা সম্পূর্ণ বর্জন করিয়াছিলেন। জনগণকে দিয়াও করাইয়াছিলেন। আরাম-আয়াস ও ভোগ-বিলাসিতাই মুসলমানদের পতনের কারণ : এই সত্যকে নেতারা জেহাদী পরিবেশের দরুন মাত্রাতিরিক্তরূপে প্রয়োগ করিয়াছিলেন। এইরূপ কড়াকড়ি ও বাড়াবাড়ির ফলে গোটা মুসলিম সমাজ হইয়া পড়ে পিউরিটানিস্ট। অন্যান্য আমোদ-প্রমোদের জঞ্জালের সাথে সংগীত-শিল্পেরও বনবাস হয়।

কিন্তু মরে না। নিশ্বাস-প্রশ্বাস ও হাসি-কান্নার মতো সংগীতও মানুষের স্বাভাবিক অপ্রতিরোধ্য বৃত্তি। কোন কিছুতেই তা বন্ধ করা চলে না। সংগীতের বেলাও তা চলিল না। গৃহে ও ভদ্র সমাজে বর্জিত হইয়া সংগীত তাই পথে-ঘাটে মাঠে-ময়দানে ও বনে-জঙ্গলে বাঁচিয়া থাকিল।

জাতীয় কৃষ্টির উপাচার হিসাবে সংগীতের মর্যাদার দিক দিয়া পাক-বাংলার ইতিহাসের গত একশ' বছর একটা নিদারুণ অন্ধকার যুগ হইয়া গেল এইরূপে।

আনন্দদায়ক অপরাধ

কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, ঐ অন্ধকার যুগের আগে আমাদের গীতি-ঐতিহ্য গৌরবময় ছিল না। আর এটাও ঠিক নয় যে, ঐ অন্ধকার যুগেও আমাদের মধ্যে সংগীতের প্রাণ ছিল না। প্রাণ ছিল নিশ্চয়ই। কারণ ওটা প্রকৃতির বিধানেই অমর। কিন্তু সে প্রাণ স্পন্দিত হইত সভ্য শহরিয়া সফিস্টিকেটেড সমাজের মার্জিত পরিবেশের বাহিরে, পাড়াগাঁয়ের সরল অমার্জিত প্রাকৃতিক আবহাওয়ায়। সেখানে বাউল, ভাটিয়ালী, মারফতি, মুর্শিদি, জারিগান, সারিগান, কবিগান, বিচারগান ও ঘাটু ভাসান ইত্যাদি রুচি-কুরুচির ভালমন্দ অভিব্যঞ্জনার মধ্যে মানব হৃদয়ের স্বাভাবিক ফুকার ধ্বনিত হইতে থাকে। আর এদিকে নবাব-জমিদাররা ঐ একই কারণে নটি-বাইজী লইয়া প্রমোদ-উদ্যান বা প্রাসাদের রুদ্ধদ্বার কক্ষে সংগীতের ক্ষুধা মিটাইতে থাকেন।

ফলে গত একশ' বছর আমাদের জাতীয় জীবনে সংগীত-শাস্ত্র বিন্দুমাত্র উন্নতি লাভ করে নাই—শিল্প হিসাবেও না, আমাদের কৃষ্টির উপাচার হিসাবেও না।

www.pathagar.com

সংগীতের মতো একটা উচ্চশ্রেণীর মহান কৃষ্টিক ললিতকলা আমাদের সমাজে একটা আনন্দদায়ক অপরাধরূপে বাঁচিয়া থাকে দীর্ঘ একশটা বছর।

সুবেহ্—সাদেক

বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকেই এই অন্ধকার যুগের অবসানের সুবেহ-সাদেক দেখা দেয়। এই সময়ে খিলাফত ও প্রজা-আন্দোলনের মাধ্যমে সংগীত এতদিনের ঘোমটা মেলিয়া মুসলিম জনসমাবেশে হাযির হয় গযল ধর্ম-সংগীত কৃষক-শ্রমিকের গান ও আযাদির গানরূপে। সেখানেও প্রথম-প্রথম হার্মোনিয়ামযোগে গযল গাওয়ায় আপত্তি উঠে। কিন্তু সব আপত্তি সূর্যোদয়ে কুয়াশা কাটার মতই দূর হইয়া যায় নযরুল ইসলাম, গোলাম মোস্তফা, জসিমুদ্দিন ও আব্বাসুদ্দিনের আবির্ভাবে।

সংগীতের এই পাবলিক এপিয়ারেন্স বাংলাদেশের কৃষ্টির ইতিহাসে অতীব গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। নবাব-জমিদারের দরবারে লাখ্নৌভী দিল্লীওয়ালা উস্তাদদের উচ্চাংগের সংগীতের জলসাটা বড় কথা নয়। বড় কথা সামজিক কৃষ্টির অংশ হিসাবে গণ-জীবনে সংগীতের প্রতিষ্ঠা। এটাই ঘটে নযরুল-আব্বাসের আবির্ভাবে। নিতান্ত সংগীত বিরোধী আলেমরাও এই সময়ে সংগীতের সমঝদার হইয়া উঠেন। একটা ঘটনার উল্লেখ করার লোভ সংবরণ করিতে পারিতেছি না।

কলিকাতায় হক সাহেবের বাসায় মিলাদের মহফিল। আরবী-উর্দুতে যথারীতি মিলাদ পড়া হইয়া যাওয়ার পরে, কিন্তু মিঠাই–মতিচূর বন্টনের আগেই, হক সাহেব আব্বাসুদ্দিনকে গান গাহিতে বলিলেন। আব্বাসুদ্দিন পাশের কামরায় হার্মোনিয়াম লুকাইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। হক সাহেবের ডাকে তিনি সেলামালেকুম বলিয়া দরবারে বসিলেন। তাঁর সংগী হার্মোনিয়ামটি আনিয়া আলগোছে তাঁর সামনে বসাইলেন। 'তওবা–আসতাগফেরুল্লা' বলিতে বলিতে আলেমরা এবং তাঁদের দেখাদেখি আরও অনেকে মজলিস ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িলেন। হক সাহেবের সানুনয় বিনীত অনুরোধে অবশেষে তাঁরা বারান্দায় বসিয়া মতিচূর-মিহিদানা গ্রহণ করিতে রাযী হইলেন। খাঞ্চা-খাঞ্চা মতিচূরের পুলিন্দা আসিতে লাগিল। আলেমরা সাগ্রহে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

হঠাৎ কামরার ভিতর হইতে আব্বাসুদ্দিনের মিঠা-দরায গলা ভাসিয়া আসিল : 'তোরা দেখে যা আমিনা মায়ের কোলে।' অল্পক্ষণের মধ্যে আলেম সাহেবেরা মিঠাই বিতরণের গণ্ডগোল বন্ধ করিতে বলিলেন। কান পাতিয়া আব্বাসুদ্দিনের গলা শুনিতে লাগিলেন। এক-এক করিয়া সবাই চুপে-চুপে কামরায় প্রবেশ করিলেন। মিঠাই বিতরণ বন্ধ থাকিল।

গানশেষে হক সাহেব আলেম সাহেবদেরে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন : 'কেমন লাগল মৌলবী সাহেবেরা? মিলাদ শরীফে এমন চোখের পানি ফেলিয়াছেন কোনোদিন?' হক সাহেবের গলা কাঁপিয়া উঠিল। সত্যই তাঁর চোখে পানি ছলছল করিতেছিল। আলেমদের চোখেও তাই।

আশ্চর্য? না, আশ্চর্য হইবার কিছু নাই। আলেমরাও হৃদয়বান মানুষ। আগুনের কাছে মোম যা, সংগীতের কাছে মন তাই। মহামনীষী বার্নার্ড শ' তাই বলিয়াছিলেন : 'গানে যাদের মন গলে না, তারা খুনী।' যে সমাজে গান-বাজনা নাই, সে সমাজ শুধু নিরানন্দ নয়, নিষ্ঠুরও। সে সমাজে সুকুমার বৃত্তি জাগ্রত ও বিকশিত হইতে পারে না।

www.pathagar.com

নৃত্য-শিল্প

আমাদের কালচারকে নাচের মাধ্যমে মূর্তিমান করার অসাধারণ প্রতিভা লইয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন যে বুলবুল চৌধুরী, জাতির দুর্ভাগ্যহেতু তাঁর অকালমৃত্যু ঘটিয়াছে। নযরুল ইসলামের কবি জীবনের নিদারুণ অবসানে আমাদের কালচারেল জীবনে যে অপূরণীয় ক্ষতি হইয়াছে, বুলবুলের অকাল-মৃত্যুতে আমাদের কালচারেল ক্ষতির পরিমাণ তার চেয়ে কোনও অংশে কম নয়। পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী কায়েদে-মিল্লাত লিয়াকত আলী খান বুলবুলের নৃত্যানুষ্ঠান দেখিয়া গদগদ কণ্ঠে বলিয়াছিলেন : 'বুলবুল, তুমি পাকিস্তানী কালচারের প্রাণ।' কথাটার এক হরফও অতিশয়োক্তি ছিল না।

গোটা পাকিস্তানের বিশেষত পাক-বাংলার কালচারে বুলবুলের অবদানের ঐতিহাসিক গুরুত্ব এইখানে যে, বুলবুল নৃত্য-শিল্পকে মুসলিম সমাজে পাংক্তেয় করিয়া গিয়াছেন। মুসলিম কালচারের অংগরূপেই, শুধু পিওর আর্টরূপে নয়। ফাইন আর্ট যতই উচ্চাংগের হউক, আর্ট-সাধক যতই বিশ্ববিখ্যাত হউন, জাতীয় কৃষ্টির সাথে তাঁর আর্টের নাড়ীর যোগ সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত তিনি জাতীয় আর্টিস্ট হইবেন না, তাঁর আর্টও জাতীয় আর্ট হইবে না। বুলবুল তাঁর নৃত্য-শিল্প ও আমাদের জাতীয় কৃষ্টির মধ্যে অচ্ছেদ্য নাড়ীর যোগ স্থাপন করিয়াছিলেন। এইখানেই বুলবুলের মৌলিকতা। এখানেই তিনি যুগ-প্রবর্তক।

আমাদের জাতীয় কৃষ্টির পরিপূর্ণতার জন্য ছিল এটা অত্যাবশ্যক। গান ছাড়া যেমন মানুষের কথা বলা পূর্ণতা লাভ করে না, নাচ ছাড়া তেমনি মানুষের পথ চলা পূর্ণতা লাভ করে না। গান যেমন বলার তালা, নাচ তেমনি চলার তাল। তালই বিশ্ব-দুনিয়ার, অতএব মানুষের গোটা জীবনের, ওজন কানুন ও কাওয়ায়েদ, নিয়ম শৃঙ্খলা ও সংযম, গ্রামার মেথড সিস্টেম। বেতাল হইলে ব্যক্তি-জীবন যেমন জাতির জীবনও তেমনি কক্ষচ্যুত ও বিপর্যস্ত হইয়া পড়ে।

তাই প্রাকৃতিক নিয়মেই মানুষ মাটিতে পড়িয়াই, তারও আগে মায়ের পেটেই, তাল শিখিতে শুরু করে। বস্তুত মানুষ হাত পা নাড়িতে শিখে কথা বলার আগে। অতএব আগে নাচ, পরে গান।

এই তালের সাধনা চলে মানুষের জীবনের শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত অবিশ্রান্তভাবে। মানুষ তার সুখে-দুঃখে হাসিকান্নায় ক্রোধ-শান্তিতে প্রেম-ঘৃণায় খানা-পিনায় সর্ব অবস্থায় গায়ও যেমন নাচেও তেমনি।

কাজেই গানের মতোই নাচও আমাদের ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনের, অতএব জাতীয় কৃষ্টির, অবিচ্ছেদ্য অংগ। এ দুই-এর সমন্বয় ঘটিয়াছিল আমাদের পল্লী-জীবনে জারিগানে ও সারিগানে।

পাবলিক এন্টারটেনমেন্ট

জাতীয় কৃষ্টির অন্যতম প্রধান ও জনপ্রিয় বিকাশ পাবলিক এন্টারটেনমেন্ট বা আমোদ-প্রমোদ। নাটক সিনেমা ম্যাজিক সার্কাস গীতিনাট্য ইত্যাদি হরেক রকমে জাতির সৃষ্টিধর্মী প্রতিভা বিকশিত ও গণ-চিত্তের আনন্দ-ক্ষুধা পরিতৃপ্ত হইয়া থাকে। এ

www.pathagar.com

সবে এখন আমাদের আছে কি? রোজ দুই-তিন বেলা লক্ষ লক্ষ লোক যে সিনেমা দেখে তাতে আমাদের নিজস্ব কালচারের স্থান কতটুকু? ভাগ্যিস সরকার সম্প্রতি বিদেশী ছবির উপর নিষেধ ও নিয়ন্ত্রণ জারি করিয়াছেন।

এই নিষেধ ও নিয়ন্ত্রণের আগের অবস্থা কি ছিল, একবার চিন্তা করিয়া দেখুন ত। প্রতি ছবিঘর হয় ইংরেজী নয় ত পশ্চিম বাংলার ছবি। ও সবের স্রষ্টাও আমরা নই; অভিনেতা-অভিনেত্রীও আমরা না। আমাদের জীবনের আলেখ্য ও আদর্শের রূপায়ণও ততে নাই। তবু লক্ষ লক্ষ দর্শক ও-সব দেখিবার জন্যই হুড়াহুড়ি করে। কেন করে?

জনতার দোষ কি? তারা আনন্দের পিয়াসী। তাদের এই আনন্দের সাধ মিটাইতে হইবেই। সে দায়িত্ব শিল্পীদের। শিল্পীরা তা করিবেন আমাদের নিজস্ব ভাষায় স্বকীয় কালচারের রূপায়ণে।

রংগমঞ্চ

সিনেমা-জগতে বরঞ্চ সম্প্রতি কিছুটা উন্নতি হইয়াছে, কিন্তু রংগমঞ্চে আমরা একদম অনুপস্থিত। খোদ রাজধানীর বুকেই একটিও রংগমঞ্চ নাই, অন্যান্য শহর ত দূরের কথা। ভাল নাটকের বইও একরূপ নাই বলিলেই চলে। ফলে এখানে-ওখানে কালেভদ্রে আমাদেরা উৎসাহী তরুণরা যে দুই একখানা বই মঞ্চস্থ করে তাও পশ্চিম বাংলার নাট্যকারদের লেখা। আমাদের জীবন-আলেখ্য তাতে নাই। অনেকগুলিই আমাদের কালচার বিরোধী।

রংগমঞ্চেই জাতির কৃষ্টি-জীবন দানা বাঁধিয়া ধরা দেয়। জীবন্ত হয়। কাজেই মঞ্চের অভাব ঐ দানা বাঁধার কাজটাই পিছাইয়া দেয়। জীবন্ত হওয়া ত পরের কথা। হেলা-অবহেলায় জাতীয় জীবনের রসের উৎসই শুকাইয়া যায়।

নিষ্ঠুর সত্য কথা এই যে, কাগযে-কলমে আমরা যতই বড়াই করি না কেন, জারিগান সারিগান ভাটিয়ালি ভাওয়ালি ভাওয়াইয়া বহু দিন আগে হইতেই আমাদের জাতীয় কৃষ্টির অংগ হইতে খসিয়া পড়িয়াছে। আব্বাসুদ্দিনের ও তাঁর শাগরিদদের গলায় শুধু রেকর্ডে বাঁচিয়া আছে মাত্র। তাও ব্যবসায়ীদের উদ্যোগে, আমাদের কৃষ্টিক চেষ্টায় নয়। নাচ ও আর রেকর্ডে দেখান যায় না, তাই তা মৃত।

শরমের কথা

কিসের জন্য জানি না, কার দোষে জানি না আমাদের সমাজ-জীবন হইতে নিঃশেষে বিসর্জন দেওয়া হইয়াছিল কালচারের সবচেয়ে সুকুমার মধুর সবচেয়ে স্নিগ্ধ সবচেয়ে সজীব সবচেয়ে প্রাণবন্ত প্রকাশ যে নাচ-গান তাকেই। আব্বাসুদ্দিন ও বুলবুলের অসামান্য প্রতিভাও তার সম্যক পুনরুদ্ধার ঘটাইতে পারে নাই। কে কবে পাক-বাংলার মুসলিম কৃষ্টি-জীবনে এই ভেণ্ডালিযম চালাইয়াছিল, সে বিতর্কে সময়ে নষ্ট না করিয়া অবিলম্বে তার পুনরুদ্ধারের কাজে লাগিয়া যাইতে হইবে। তা না করিলে বেশিদিন আমরা কৃষ্টিহীনতার লজ্জা ঢাকিয়া রাখিতে পারিব না। বাংগালী হিন্দু সাহিত্যিকদের কেউ কেউ ইতিমধ্যেই রসিকতা করিয়া বলিতে শুরু করিয়াছেন যে, বাংগালী মুসলমানদের মধ্যে যে একটিমাত্র কালচার আছে, তার নাম এগ্রিকালচার।

www.pathagar.com

একটি মাত্র সাম্প্রতিক ঘটনার উল্লেখ করিয়া আমার কথাটা প্রমাণ করিব। সেদিন রুশ দেশের এবং কয়েক বছর আগে চীন দেশের কালচারেল মিশন পাকিস্তান আসিয়াছিলেন। শিল্পীদের অধিকাংশই ছিলেন মুসলমান। তাঁরা নিজেদের দেশের নিজস্ব কালচারের নাচ দেখাইয়াছেন। ঐ সংগে আমাদের কালচারের নাচ বলিয়া পাক-বাংলার ঝুমুর ও পশ্চিম পাকিস্তানের খটক ও পাঞ্জাবী নাচ দেখাইয়াছিলেন। নিশ্চয়ই আমাদের আর্ট কাউন্সিলের পরামর্শেই তাঁরা তা করিয়াছিলেন। খটক নাচ ও পাঞ্জাবী নাচ সত্য-সত্যই পাকিস্তানী কালচারের অবিচ্ছেদ্য অংগ। পাঠান ও পাঞ্জাবী মুসলমানরা তাদের বিভিন্ন উপলক্ষে দল বাঁধিয়া ঐ সব নাচ নাচিয়া থাকে।

কিন্তু ঝুমুর নাচ? এটা কি পাক-বাংলার মুসলিম কালচারের অংগ? পাক-বাংলার সীমান্তের অবহেলিত অমুসলমানদের কালচারের ধ্বংসাবশেষকে আমাদের কালচার বলিয়া চালাইয়া বিদেশীদের ফাঁকি দিতে পারি, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে ফাঁকিতে কি আমরা নিজেরাই পড়িব না?

ন্যাশনাল স্টেজ

সৌভাগ্যের বিষয়, গত কয়েক বৎসর ধরিয়া ঢাকার রেডিও কর্তৃপক্ষ পাক-বাংলার কৃষ্টি–উৎসবের আয়োজন করিয়া আসিতেছেন। তাতে তাঁরা আমাদেরা পল্লী-জীবনের নিজস্ব কালচারের হারান মানিক পুনরুদ্ধারের সাধু প্রচেষ্টা চালাইতেছেন।

তাঁদের ধন্যবাদ। এটা শুভ সূচনা। কিন্তু উৎসবটা বার্ষিক। স্বভাবতই এর ফল সাময়িক ও ক্ষণিক। সতত ক্রিয়াশীল নয়। সম্প্রতি টেলিভিশনও এ কাজ শুরু করিয়াছেন। কিন্তু তার ফলও সংকীর্ণ এলাকায় সীমাবদ্ধ।

অতএব এ সাধু চেষ্টাকে সতত ক্রিয়াশীল রাখিয়া ও এর এলাকা প্রসারিত করিয়া এই উদ্যমকে জনপ্রিয় করিতে হইলে অবিলম্বে আমাদের ন্যাশনাল স্টেজ নির্মাণ করিতে হইবে।

কয়েক বছর আগে সরকার এ বিষয়ে উদ্যোগী হইয়াছিলেন। তৎকালীন গভর্নর শেরে-বাংলা ফযলুল হক একটি স্টেজ উদ্বোধন করিয়াছিলেন। আর কালবিলম্ব না করিয়া সেটা সমাপ্ত করা দরকার। এদিকে সরকার চিন্তানায়ক ও লেখক–সমাজকে ঐক্যবদ্ধভাবে উদ্যোগী হইতে হইবে।

মোবাইল স্টেজ

স্থায়ী স্টেজ ছাড়াও আমাদের কালচারের মিশনারিরূপে মোবাইল ও ওপেন-এয়ার স্টেজের প্রবর্তন করিতে হইবে। হিন্দুদের যাত্রা পার্টি যেমন। এদের কৃষ্টিক মূল্য অপূরণীয়। মুসলমান বীর-বীরাংগনা, পীর-মুর্শিদ ও রাজা-বাদশাদের জীবনের শিক্ষামূলক ঘটনা অবলম্বনে সোজা ভাষায় সহজ আর্টের সবল চরিত্রের নাটক অভিনয় করিয়া বেড়ানোই হইবে ব্যবসা। আনন্দ ও সংস্কৃতির তালাশে পয়সা খরচ করিয়া গ্রামবাসীর শহরে আসার বদলে আনন্দ ও সংস্কৃতি নিজেরাই জনগণের দুয়ারে যাইবে এদের মাধ্যমে।

www.pathagar.com

ন্যাশনাল স্পোর্টস

কালচারের সবচেয়ে চঞ্চল ও জনপ্রিয় অংশ জাতির জীবনের সবচেয়ে প্রাণবন্ত উচ্ছ্বাস যে খেলা-ধূলা, তাতেও আমরা পরাজিত। আমাদের নিজস্ব খেলা-ধূলাকে আধুনিক করিবার চেষ্টা করি নাই বলিয়াই আমাদের এই দুর্দশা। বিদেশী ফুটবল, ক্রিকেট টেনিস, ব্যাডমিন্টন ইত্যাদি খেলা আমাদের জাতীয় ক্রীড়ার স্থান দখল করিয়াছে।

বিদেশী বলিয়াই আমি এ সবের নিন্দা করিতেছি না। বর্জন করিবার পরামর্শও দিতেছি না। আমার আপত্তি অন্য কারণে ও অন্য দিকে। আমার বক্তব্য এই যে, ঐ সব খেলা-ধূলা আমরা পরাধীনতার আমলে বিনা-বিচারে চোখ বুজিয়া গ্রহণ করিয়াছি। আমাদের জন্য উপযোগী ও গ্রহণযোগ্য কি না তার বিচার করি নাই। কিন্তু এখন করা উচিত।

হকির বিরুদ্ধে আমার কিছুই বলিবার নাই। কারণ এটা আমাদের ডাংগুলি খেলার উন্নত সংস্করণ। বিদেশী নয়। বিদেশী খেলাকে জাতীয় খেলা-ধূলার আকারে গ্রহণ করিবার সময় জনসাধারণের কথা ভাবিতে হইবে। খেলার খরচ ও মাঠের আয়তনের কথা অবশ্যই বিবেচনা করিতে হইবে। এই বিচার হকির সাথে ফুটবলও আমাদের জাতীয় খেলা হইতে পারে; হইয়াছেও তাই। কিন্তু ক্রিকেটের মত ব্যয়সাধ্য অভিজাত খেলা আমাদের দেশে চলিতে দিতেছি কেন? রাজভাণ্ডার-উজাড় করা খরচ ছাড়াও এই খেলা লক্ষ লক্ষ লোককে এক নাগাড়ে কয়েকদিন ধরিয়া সারাদিন নিষ্কর্মা করিয়া রাখে। এই কারণে বৃটিশ সাম্রাজ্য ছাড়া দুনিয়ার আর কোনও দেশ ও জাতি এটা গ্রহণ করে নাই। শুধু আমরাই পাক-ভারতের গতকালের গোলামরা এই ব্যয়বহুল ও সময়ের অপচয়কারী নকল ভদ্রতা বজায় রাখিতেছি। ইনডোর ও মেয়েদের খেলার জন্য ভলিবল, টেনিকট, ব্যাডমিন্টন গ্রহণ করা যাইতে পারে। এ সবে খরচ অল্প। ব্যায়ামও হয় খুব।

সর্বোপরি, আমাদের নিজস্ব খেলা-ধূলাকে আধুনিক রূপ দিয়া পুনর্জীবিত করিতে হইবে। এ বিষয়ে আমাদের স্পোর্টস ফেডারেশনের দায়িত্ব অসীম ও গুরুতর। তাঁরা ইতিমধ্যে হাডুডু-কবাডি প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এটা আশার কথা। তাঁরা ধন্যবাদের পাত্র। এটাকে আধুনিক করিয়া প্রতি জেলায় এ খেলার ব্যাপক ও বিপুল জনপ্রিয়তা হাসিলের সংঘবদ্ধ চেষ্টা তাঁদেরই করিতে হইবে।

শিল্পী-সাহিত্যিকের দায়িত্ব

কিন্তু গোটা জাতায় কালচারের ইমারত সাহিত্য। অতএব সাহিত্যিকরা সে কালচারের আর্কিটেক্ট। উপরে বর্ণিত জাতীয় কৃষ্টির বিভিন্ন রূপকে যুগোপযোগী করিয়া পুনর্জীবিত করিতে হইলে সাধক চিন্তা-নায়ক সাহিত্যিকদেরই তা করিতে হইবে।

এই আসল কাজেই কিন্তু আমরা আজও আত্ম-অচেতন পরানুকারী রহিয়া গিয়াছি। চরম দুর্ভাগ্য এই যে, আমরা যে পরানুকারী তা বুঝিতে পারিতেছি না। মনের এই গোলামিকে আমরা উদার প্রগতিশীলতা ও বিশ্বজনীনতা ধরিয়া নিয়া গর্ববোধ করিতেছি। এই মানসিক দাসত্বের মোহ আমাদিগকে কাটাইয়া উঠিতে হইবে।

www.pathagar.com

স্বকীয়তা ও গুণগ্রাহিতার, আত্ম-সম্মান ও গুণীর সম্মানের, উদারতা ও হীনমন্যতার পার্থক্য বুঝিতে ও তাদের সীমারেখা চিনিতে হইবে।

মানুষের আত্মমর্যাদাবোধই তার কালচারের প্রাণ। তার আত্মবিশ্বাসই ওর শক্তি। এই দুইটা যাদের নাই, কালচারের ব্যাপারে তারা পরগাছা মাত্র। কালচার-প্রীতি দেশাত্মবোধ ও বাপ-মা ভক্তির মতই ইমোশনের বস্তু, যুক্তিবাদ ও দর্শন-বিজ্ঞানের ব্যাপার নয়। কিন্তু কালচার-প্রীতির এ ইমোশন সহজাত নয়, অর্জিত। বেহালার তারে আঘাত করিয়া যেমন সুর আনিতে হয়, তেমনি হৃদয়ের তারে আঘাত করিয়া এই ইমোশন আনিতে হয় কবি-সাহিত্যিকরাই সে সুর-শিল্পী।

নিজের মর্যাদা মানে যে পরের অমর্যাদা নয়, অপরের অমর্যাদা করিয়া কেউ যে মর্যাদাবান হয় না, পরকে অভদ্র বলা যে ভদ্রলোকের খাসিয়ত নয়, পরকে তাচ্ছিল্য করার মানে যে আত্মবিশ্বাস নয়, জাতির অন্তরে এই সূক্ষ্ম শালীনতাবোধ সৃষ্টির দায়িত্বও কবি-সাহিত্যিকের। এটা তারাই পারে। আর কেউ না।

এই সুর-শিল্পীরা যদি নেশা খাইয়া আত্মভোলা হয়, তবেই প্রাকৃতিক দুর্যোগ চাবুক মারিয়া তাদেরে আত্মস্থ করে। সম্প্রতি পাক–ভারত যুদ্ধ আমাদের কৃষ্টি জীবনে তাই করিয়াছে। আমরা শুধু নিজের কালচারই ভুলিয়া থাকি নাই, নিজের দেশকে পর্যন্ত ভুলিয়া ছিলাম। দেশের মাটি ও তার নদ-নদী, তার সবুজ মাঠ, পাখীর গান, মাতৃভূমির সন্তান ও তাদের মুখের বুলি, তাদের সুখ-দুঃখ ও আশা-আকাঙ্ক্ষা আমাদের কবি–প্রাণে স্পন্দন জাগাইতে এবং লেখকের কলমে গতি যোগাইতে পারে নাই।

আমরা কলিকাতার কৃষ্টি পশ্চিম-বাংলার পরিবেশ ও শান্তি-নিকেতনের রচনাভংগি নকল করিয়া সুখী ও বিদগ্ধ হইতেছিলাম। রবীন্দ্রনাথকে আমাদের জাতীয় কবি আখ্যা দিয়া রবীন্দ্র–সংগীতের সাগরে ডুব পাড়িতেছিলাম।

কাজেই আমাদের প্রকাশকরা পশ্চিম-বাংলার পুস্তক রিপ্রিন্ট করিয়া, বিক্রেতারা তা বেচিয়া এবং পাঠকরা তা গো-গ্রাসে গিলিয়া পাক-বাংলাকে পশ্চিম-বাংলার কৃষ্টিক উপনিবেশ, তার্থিক সীমান্ত প্রদেশ ও সাহিত্যিক বজায় করিয়া রাখিয়াছেন। আর আমাদের কবি সাহিত্যিকরা রাস্তার পাশে দাঁড়াইয়া অসহায় দর্শকের মতই এই বেচা-কেনা দেখিতেছিলেন।

ঘুম-ভাংগা দামামা

এমন সময় যুদ্ধের দামামা বাজিয়া উঠিল। আমাদের তন্দ্রা-টুটিল সরকার কয়েক শ্রেণীর রবীন্দ্র-সংগীত বন্ধ ও পশ্চিম-বাংলার বই-পুস্তক ও ছায়াছবি নিষিদ্ধ করিলেন। তবেই আমাদের জ্ঞান হইল। আমাদের রেডিও-টেলিভিশন ও সংবাদপত্রে গানে–কবিতায় ছায়াছবিতে দেশাত্মবোধ ও কৃষ্টিক স্বকীয়তা ঝংকৃত হইতে লাগিল।

দেশের জাগরণের পক্ষে এটা নবযুগ, কালচারের দিক হতে এটা সুবেহসাদেক, কিন্তু কবি-সাহিত্যিকদের জন্য এটা গৌরবের কথা নয়। এই গুণে আমরা সরকারী হস্তক্ষেপকে সাহিত্যিক রেজিমেন্টেশন বলিতে পারি না। যুদ্ধ-বিগ্রহের মতো বিপর্যয় দরকার হয় জনগণের সমবেত চেতনা উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য। কবি-সাহিত্যিকদের জন্য তার দরকার হইবে কেন? তাঁরা যে চিন্তা-নায়ক। দূরে দেখা যে তাঁদের পবিত্র দায়িত্ব।

www.pathagar.com

পশ্চিম-বাংলা যে আমাদের দেশ নয়, কলিকাতার কৃষ্টির সাহিত্য যে আমাদের কৃষ্টি-সাহিত্য নয়, শান্তিনিকেতনী ভাষা যে আমার ভাষা নয়, এই সূক্ষ্ম তত্ত্ব হৃদয়ংগম করিতে জনগণের সময় লাগিতে পারে, কিন্তু চিন্তানায়কদের লাগিবে কেন?

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকবি হইয়াও পাক-বাংলার জাতীয় কবি নন? বাংলাদেশ ভাগ হওয়ার পর এটা রাষ্ট্রীয় সত্য হইয়াছে নিশ্চয়ই। কিন্তু বিভাগ-পূর্ব বাংলাতেও এটা সাহিত্যিক সত্য ছিল। পাকিস্তান হওয়ার তিন বছর আগে ১৯৪৪ সালে কলিকাতার বুকে দাঁড়াইয়া এক সভাপতির ভাষণে আমি বলিয়াছিলাম : "বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথের বিশ্ব ভারতীয় বিশ্বে কতবার শারদীয়া পূজায় 'আনন্দময়ী মা' এসেছে গিয়েছে, কিন্তু একদিনের তরেও সে বিশ্বের আকাশে ঈদ মোহররমের চাঁদ উঠেনি।"

বিশ্ব-কবি বনাম জাতীয় কবি

এটা-বিশ্ব-কবি রবীন্দ্রনাথের প্রতি অশ্রদ্ধা-অসম্মানের কথা নয়। সত্য কথা। রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি হইয়াও বাংলার জাতীয় কবি নন। বাংলার জাতীয় কবি নন তিনি এই সহজ কারণে যে বাংলায় কোনও 'জাতি' নাই। আছে শুধু হিন্দু-মুসলমান দুইটা সম্প্রদায়। তিনি বাংলার জাতীয় কৃষ্টির প্রতীক নন এই সহজ কারণে, যে এখানে কোনও জাতীয় কৃষ্টিই নাই। এখানে আছে দুইটা কৃষ্টি : একটা বাংগালী হিন্দু-কৃষ্টি অপরটি বাংগালী মুসলিম-কৃষ্টি। সমগ্র বাংলায় মেজরিটি ছিল মুসলমান। মেজরিটি দেশবাসীর সাথে নাড়ীর যোগ না থাকিলে কেউ জাতীয় কবি হইতে পারেন না। বিশ্বের কাছে তিনি যত বড়ই হউন। এটা পশ্চিম-বাংলার কৃষ্টি-সাহিত্যের প্রতি অবজ্ঞাও নয়। রবীন্দ্রনাথ বিশ্ব-কবি হিসাবে আমাদের নমস্য। সর্ব অবস্থায় তা থাকিবেন। যুদ্ধেও থাকিবেন, শান্তিতেও থাকিবেন। এই খানেই সীমা-রেখার সূক্ষ্ম জ্ঞানের প্রয়োজন। ভারতের সংগে যুদ্ধ বাধিলেই রবীন্দ্রনাথের গান-কবিতা নিষিদ্ধ হইবে এটাও যেমন দূষণীয়; শান্তি হইলেই রবীন্দ্র-পূজা শুরু হইবে এটাও তেমনি দূষণীয়।

পশ্চিম-বাংলার সাহিত্য উন্নত সাহিত্য হিসাবে নিশ্চই আমাদের অনুকরণীয়; কিন্তু তা আমাদের নিজের সাহিত্য নয়। অমন মোহ যদি থাকে তবে তা ঝাড়িয়া ফেলিতে হইবে আমাদিগকে অবিলম্বে আমাদের নিজস্ব জাতীয় ঐতিহ্য ও কৃষ্টির রিডিস্কভারি করিতে হইবে আমাদের নিজের দেশে। পাক-বাংলার গত সাতশ' বছরের ইতিহাস আবার পড়িতে হইবে নতুন জাতির মন লইয়া। সে রিডিসকভারির রূপায়ণেই আমাদের জাতীয় সাহিত্য রচিত হইবে নয়া যিন্দিগির বাণী বহন করিয়া। বাংগালী হিন্দুর রেনেসাঁ যুগের মতো আমাদের মধ্যেও বাংগালী মুসলিম রেনেসাঁর বংকিম-রবীন্দ্র ও রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জন্ম হইতে হইবে।

রিভাইভ্যাল নয়, রেনেসাঁ

তরুণরা ভুল বুঝিবেন না। এটা পিছন ডাক নয়। এটা সামনে চলার আহ্বান। রিভাইভ্যাল নয়, রেনেসাঁ।—এটা বাদশাহি আমলে বা খিলাফত যুগে ফিরিয়া যাওয়ার পরামর্শ নয়। ওটা হইবে অবাস্তব। ভ্রান্ত মরীচিকা। দুনিয়া আজ প্রগতি ও সাধনার পথে

www.pathagar.com

অনেক—অনেক দূর আগাইয়া গিয়াছে। আমাদেরও সে প্রগতির নাগাল ধরিতে হইবে। তার শরিক হইতে হইবে। কাজেই গতি হইবে আমাদের অতিদ্রুত। আমাদের কালচারকেও আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক হইতে হইবে। এটা ফিউডাল যুগ নয়, গণতন্ত্রের যুগ। আমাদের কালচারকেও তাই গণ-ভিত্তিক হইতে হইবে। এটা কৃষি-যুগ নয়, এটা শিল্প-যুগ। কাজেই জনগণও আজ আর শুধু কৃষক নয়, তারা মিল-মজুরও বটে। শিল্পও আর শুধু আর্বান ইণ্ডাস্ট্রী নয়, রুরাল ইণ্ডাস্ট্রীও তার শক্তিশালী শরিক। কালচারের ধারক যে পল্লীগ্রাম, তাও আর আগের পল্লী নাই। শহর ও পল্লীর ব্যবধান দ্রুত সংকীর্ণ হইতেছে। কালচার ও সিভিলিযেশনের মধ্যে তাই নতুন করিয়া সমঝোতা হইতেছে।

পাক-বাংলার কৃষ্টিক রেনেসাঁ হইবে এই পরিবেশে। সে কৃষ্টি-সাহিত্যের ইমারত গড়িয়া উঠিবে আধুনিক মাল-মসলাতেই। তার বুনিয়াদ হইবে পাক-বাংলার মাটিতে। রূপ-রস-গন্ধে হইবে তা অপূর্ব। সে কৃষ্টি-সাহিত্য রূপে হইবে বাংগালী, রসে হইবে তা মুসলিম, আর গন্ধে হইবে তা বিশ্বজনীন।

২৪শে মাঘ, ১৩৭২ সন।

www.pathagar.com

সাহিত্যের প্রাণ রূপ ও আংগিক

সাহিত্যের সরহদ্দ

সাহিত্যের দুই রূপ : বড় ও ছোট—বিশাল ও সংকীর্ণ। বিশাল রূপে ভাষায় প্রকাশিত মানব-মনের গোটাটাই সাহিত্য। এই হিসাবে বাজার-দরের রিপোর্ট, ওষুধের বিজ্ঞাপন, স্কুল-কলেজের পাঠ্য-পুস্তক, ভূগোল-ইতিহাস, বীজগণিত, পাটীগণিত, বিজ্ঞান-দর্শন, সংবাদপত্র, গল্প-কবিতা, নাটক, সংগীত, নভেল সবই সাহিত্য।

আর, সংকীর্ণরূপে সাহিত্য একটি আর্ট। আর্টের মধ্যেও এটি সবচেয়ে সংকীর্ণ, সীমাবদ্ধ আর্ট। অন্যান্য আর্ট সাহিত্যের মতো বাঁধাধরা গন্ডি ও নিয়ম-কানুনের অধীন নয়। চিত্র-ভাস্কর্য, গান-বাজনাও আর্ট। গল্প-কবিতা, নাটক-উপন্যাসও আর্ট। কিন্তু চিত্রাদি শ্রেণীর আর্ট গল্পাদি শ্রেণীর আর্টের মতো আক্ষরিক ভাষায় প্রকাশ হয় না। তাদের নিজস্ব শ্রেণীর আর্টের মতো আক্ষরিক ভাষায় প্রকাশ হয় না। তাদের নিজস্ব ভাষা আছে। ফলে চিত্র-ভাস্কর্য ও গান-বাজনার যে স্বাধীনতা আছে, গল্প-কবিতা ও নাটক উপন্যাসের সে স্বাধীনতা নাই।

ধরুন, মাইকেল এঞ্জেলোর সময়ে ও মোগল আমলে চিত্রের যে রূপ ও আংগিক ছিল, পিকাসো ও হফম্যানের আমলে তা থাকে নাই। ভারতবর্ষেই অল্পদিন আগেও চুগতাই ভবানী লাহার আমলে চিত্রকলার যে রূপ ও আংগিক ছিল, অবনীন্দ্র নাথ, যামিনী রায় ও যয়নুল আবেদিনের আমলে তার সম্পূর্ণ রূপান্তর ঘটিয়াছে। ভাস্কর্যেও তেমনি। গ্রীক-ইটালিতে ও অজন্তা-ইলোরার আমলের ভারতবর্ষে ভাস্কর্যের যে রূপ ও আংগিক ছিল, বর্তমান যুগে তা নাই। ক্লাসিক্যাল মিউযিক আধুনিক সংগীতের বেলাও এমনি বিপুল পরিবর্তন ঘটিয়াছে।

পরিবর্তনের সীমাবদ্ধতা

পক্ষান্তরে, সাহিত্যের বিরাট পরিবর্তন ঘটিয়াছে বটে কিন্তু নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে। কালিদাস, বিদ্যাপতি, সাদী, ফেরদৌসী, হোমার, ভার্জিল, মিলটন, শেক্সপিয়ারের আমলের সাহিত্য হইতে রবীন্দ্র, নজরুল, জয়েস, ইলিয়টের সাহিত্যের মধ্যে আমরা যে পরিবর্তন দেখি, সেটা চিত্র-ভাস্কর্যের মতো অতটা বিপ্লবাত্মক নয়। তার মানে, সাহিত্যিকরা সাহিত্যের প্রাণে রূপ ও আংগিকে বিপ্লব আনিবার চেষ্টাই করেন নাই তা নয়। চেষ্ট তাঁরা করিয়াছেন খুবই।

আধুনিক কাব্য-বাদীরা বিশেষত তাঁদের সিম্বলিস্ট ও ইমেজিস্টরা অতীতের সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্পর্কচ্ছেদের প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন। এতটা করিয়াছেন যে, আমরা প্রবীণরা আধুনিকদের কবিতা বুঝি না। আমরা বুঝি না বলিয়াই ওদের কবিতা কাব্য হয় না, তা

www.pathagar.com

নয়। কাব্যের রূপ ও আংগিক সম্বন্ধে তরুণদের মত আমাদের মত হইতে সম্পূর্ণ পৃথক বলিয়াই তাঁদের কবিতা আমাদের কাছে অর্থহীন।

কাব্য অর্থে আমরা বুঝি বিবরণ, আর নবীনরা বুঝেন মূর্তি বা প্রতীক। তাঁদের মতে কাব্যের উদ্দেশ্য প্রতীক গড়া, বিবরণ দেওয়া নয়। গদ্য ও পদ্যের যে পার্থক্য আমরা করি, নবীনরা তা করেন না! তরুণরা বলেন ও পার্থক্য অর্থহীন ও অনাবশ্যক।

কাজেই সাহিত্যিকরা সাহিত্যকে অতীতের বাঁধন-মুক্ত করিবার চেষ্টা কম করেন নাই। কিন্তু সম্পূর্ণ মুক্ত করিতে পারেন নাই। পারেন নাই এই জন্য যে, এটা সম্ভব নয়। চিত্রকর ও ভাস্করের অগ্রগতি হইতে অনুপ্রেরণা লাভ করিয়াই সম্ভবত কবিরা এ কাজে হাত দেন। কিন্তু চিত্রকর ও ভাস্করের সাফল্যেই কবিদের সাফল্যের গ্যারান্টি নয়।

সাহিত্যের প্রকাশ হরফে

কারণ চিত্র-কলায় ও ভাস্কর্যে যা সম্ভব, কাব্যে-সাহিত্যে তা সম্ভব নয়। এমন কি, সংগীতে যা সম্ভব, সাহিত্যে তাও সম্ভব নয়। সাহিত্যেরা প্রকাশ-বিকাশ হরফের ভাষায়। চিত্র-ভাস্কর্য-সংগীতের প্রকাশ হরফের ভাষায় নয়। হরফের ভাষা মানে ভাষার হরফ। আপনি আধুনিক কবিতাই লেখেন, আর প্রাচীন মহাকাব্যই লেখেন, অমিত্রাক্ষরই লেখেন আর পয়ার সনেটই লেখেন, লিখিতে হইবে আপনাকে হরফের মাধ্যমেই এবং হরফে-গঠিত শব্দের মিছিলেই। অ আ ক খ-র উচ্চারণ, তাদের সমন্বয়ে গঠিত শব্দ : মানুষ-গরু নদী-পর্বত ও চন্দ্র-সূর্যের অর্থ, চণ্ডীদাস-রবীন্দ্রনাথ, কায়কোবাদ, নযরুল ইসলামের আমলে যা ছিল, আধুনিক সুধীন দত্ত, বিষ্ণু দে, আহসান হাবিব ও ফররুখ আহমদের আমলেও ঠিক তাই আছে। এটাই কাব্য-লেখকদের স্বাধীনতার সীমারেখা। যা কিছু করা, এর মধ্যেই করিতে হইবে। চিত্র-ভাস্কর্যের স্বাধীনতা কিন্তু সীমাহীন।

সংগীতেরও তাই। লেখায় আপনি পাখের কলম ফেলিয়া ফাউনটেন পেন ধরিতে পারেন, কিন্তু কলম ফেলিয়া কোদাল ধরিতে পারেন না। চিত্রকর কিন্তু সূচ্যগ্র তুলি ফেলিয়া ব্রাশ ধরিতে পারেন। সে ব্রাশ রাজ-যোগালিয়ার ব্রাশের মতো মোটা হইতেও পারে। ভাস্করও তেমনি নরুন ফেলিয়া কুড়াল ধরিতে পারেন। গায়কও তেমনি লাঠি দিয়া সরোদ বাজাইতে পারেন।

সাহিত্যে পিকাসো-বিপ্লব অসম্ভব

কাজেই চিত্রকর-ভাস্করের অনুকরণে যিনি কাব্যেও পিকাসো-বিপ্লব আনিতে চাহিবেন, তিনি ব্যর্থ হইতে বাধ্য। যদি কেউ সফল হনও এর কিছু একটা সৃষ্টি করেনও, তবে সেটা অন্য কোনও ভাল জিনিস হইবে, কিন্তু কাব্য হইবে না।

তাই বলিয়া আমি এ কথা বলিতেছি না যে, আর্টরূপী সাহিত্যের গল্প-কবিতা-নাটক-নভেল ছাড়া অন্য কোনও রূপ হইতে পারে না। বরঞ্চ আমি মনে করি, সাহিত্যের আরও অনেক রূপ হইতে পারে এবং হওয়া উচিতও। আমার বক্তব্য শুধু এই যে, কবিরা চান আর না চান, তাঁদের পায়ে ভাষার অর্থাৎ হরফ ও শব্দের বেড়ি থাকিবেই।

www.pathagar.com

হরফ ও শব্দ বেড়ি এই জন্য যে, কবি-গল্পীদের ব্যবহৃত শব্দগুলি রাস্তার লোকেও ব্যবহার করে এবং একই অর্থে ব্যবহার করে। রাস্তার লোক আর্টের বিশ্লেষণ জানে না। কিন্তু আর্টের তারা সমঝদার। শুধু সমঝদার নয়, তারা ভাষার স্রষ্টাও। মাঠে-ঘাটে হাটে-বাজারে নদী-বন্দরে প্রতিদিন তারা নিত্য নতুন শব্দ তৈয়ার করিতেছে। সাহিত্য সেইসব গ্রহণ করিয়া নিজের অংগের শোভা বাড়াইতেছে।

সাহিত্যের পরে আসে অভিধান। অভিধানও সে সব শব্দকে নিজের কোলে স্থান দেয়। প্রাচীন প্রকৃতিবাদ অভিধান ও আধুনিক চলন্তিকাই তার প্রমাণ। চলন্তিকাও যে সর্বাধুনিক নয়, তার প্রমাণ আমাদের বাংলা একাডেমী একটি সর্বাধুনিক নয়, তার প্রমাণ আমাদের বাংলা একাডেমীএকটি সর্বাধুনিক অভিধান রচনায় হাত দেওয়া আবশ্যক বোধ করিয়াছেন। এটাই স্বাভাবিক। জীবন্ত ভাষায় গ্রোথ আছে, ওটা স্থানু জিনিস নয়। ওর শব্দ–সম্পদও প্রতিদিন বাড়িয়া চলিয়াছে। শোনা যায়, গত পঞ্চাশ বছরে ইংরাজী ভাষায় পঁচিশ হাজার নতুন শব্দ ঢুকিয়াছে। ঢুকিবেই ত। এটাই ত ইংরাজি ভাষার জীবনের লক্ষণ।

এর দ্বারা আমি এটাই দেখাইতে চাই যে, ভাষা জনগণের দ্বারা প্রভাবিত, সাহিত্য ভাষার দ্বারা প্রভাবিত। এর ফলে চিত্র–ভাস্কর্য যে শরাফতি দাবি করিতে পারে, সাহিত্য তা পারে না, মানে, চিত্র ও ভাস্কর্য আইভরি টাওয়ারে বাস করিতে পারে, কিন্তু সাহিত্য তা পারে না। এটাই সাহিত্যের এলাকার চৌহদ্দি।

স্থান ও কালের প্রভাব

এই চৌহদ্দি স্থান ও কালের দ্বারা নির্ধারিত প্রসারিত ও সংকুচিত হয়। স্থান ও কালের একটাও বাদ দেওয়া চলে না। দিলে সাহিত্য ব্যর্থ হয়। আমি যে স্থানে বাস করি, আমার পরদাদাও সেই স্থানেই বাস করিতেন। শুধু এই কারণে তাঁর সাহিত্য আমার সাহিত্য হইতে পারে না। কারণ পরদাদা যে যুগে বাস করিতেন, আমি সে যুগে বাস করি না।

ঠিক তেমনি, আমি যে যুগে বাস করি, ইংলণ্ড, আমেরিকা, রুশ, জাপানের লোকেরাও সেই যুগে বাস করে। শুধু এই কারণে তাদের সাহিত্য আমার সাহিত্য হইতে পারে না। কারণ তারা যে স্থানে বাস করে, আমি সে স্থানে বাস করি না। যাদের সাথে আমার স্থান ও কাল দুইটাতেই মিল আছে, শুধু তাদের সাহিত্যই আমার সাহিত্য হইতে পারে।

এখানে বলিয়া রাখা ভাল যে, সাহিত্যের এই স্থানিক ও কালিক রূপ বিশ্ব-সাহিত্যের ফাণ্ডামেন্টালের বিরোধী নয়। ব্যক্তিত্ব বা পার্সনালিটি যেমন সার্বজনীনতা বা ইউনিভার্সেলিটির বিরোধী নয়, সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তাই। বরঞ্চ ব্যক্তিত্ববিহীন মানুষের যেমন সার্বজনীনতা থাকিতে পারে না, স্বকীয়তাবিহীন সাহিত্যেও তেমনি কোনও বিশ্বরূপ থাকা সম্ভব নয়।

আমাদের সর্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আর্ট ক্রিয়েটিভ আর্ট হইতে পারে, তবেই যদি তা বাস্তব হয়। বাস্তব মানে ফটোগ্রাফ না। ফটোগ্রাফ না হইয়াও আর্ট বাস্তব হইতে পারে, যদি তার কন্‌টেন্ট ও ফর্ম একাত্ম হয়। একদিকে যেমন কুরূপা নীতি-বাক্যের দলা আর্ট নয়, অপরদিকে তেমন সারহীন রূপসী মাকালও আর্ট নয়। বাহির ও অন্তরের রসোত্তীর্ণ সমন্বয়ের নামই আর্ট। তাই ক্রিয়েটিভ আর্টের ফর্ম ও কন্‌টেন্ট

www.pathagar.com

অবিভাজ্য। এই কারণেই জীবনের সাথে ঘনিষ্ঠতাই আর্টের প্রাণ। প্রাণবস্তু হইবার জন্য এই কারণেই সাহিত্যের স্থানকে ঘনিষ্ঠ আরও ঘনিষ্ঠ হইতে হয়। দেশ ও সমাজ হইয়া তাকে ব্যক্তিতে আশ্রয় নিতে হয়। সত্যিকার সাহিত্যের বিচারে ব্যক্তি ছাড়া সমাজ ও দেশ নাই। ঠিক তেমনি, সেই কারণে সাহিত্যের কাল যুগ-বছর মাস হইয়া এখনত্বে 'নাউনেসে' রূপান্তরিত হয়। এই রূপান্তরে সাহিত্য তার বিশ্বজনীনতা হারায় না।

পক্ষান্তরে সাহিত্যের এই ঘনিষ্ঠ রূপান্তর না ঘটিলে গণ-জীবনে সে পুরাপুরি ঘনিষ্ঠ হয় না। তাতে আর্টরূপী সাহিত্যের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়। গণ-জীবন-নিরপেক্ষ পিওর আর্ট আইভরি টাওয়ারে বাস করিতে পারে। মিউযিয়মের আর্টও আর্ট, বর্তমানের আর্ট ও আর্ট। বেশকম শুধু এই যে, একটা মৃত, আরেকটা জীবন্ত।

ব্যক্তির প্রভাব

সাহিত্যকে কাল ও স্থানের প্রভাবে আসিতে হয় আরেক কারণে। সাহিত্য আসলে ফিলিং (অনুভূতি), ইমোশন (ভাবাবেগ) ও ইমাজিনেশনের (কল্পনার) রূপায়ণ। এই ফিলিং ইমোশন ও ইমাজিনেশন গোড়াতে নিশ্চয়ই ব্যক্তির। ব্যক্তি স্থান ও কালের একটি ইউনিট।

সত্য বটে, সাহিত্যে রূপায়িত এইসব বৃত্তি যত বেশি লোকের বৃত্তি হইবে, সাহিত্য হইবে তত বেশি জাতীয় এবং তত বেশি হইবে তার সার্বজনীন হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু গোড়াতে এসব বৃত্তিকে ব্যক্তির বৃত্তি হইতেই হইবে। যত বড় বিশ্ববাণীই প্রচারিত হউক না কেন, সেটা হইবে ব্যক্তির মুখ দিয়া এবং সে ব্যক্তি কথা বলিবে একটি জায়গায় দাঁড়াইয়া একটি সময়ে।

এই ব্যক্তিটি লেখক, জায়গাটি তার দেশ, সময়টি তার বর্তমান। ব্যক্তি স্থান ও কালের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রূপায়িত হয় ভাষায়। লেখক যে বাণীটি প্রচার করিবে সেটি হওয়া চাই তার অন্তরের কথা। শ্রোতাদের সেটি বুঝা চাই। তাদেরও হওয়া চাই সেটি অন্তরের কথা। কাজেই লেখক যে ভাষায় লিখিবে সেটি হওয়া চাই তার দেশের ভাষা।

বর্তমান দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক সমারসেট মম কিছুদিন আগে এশিয়া ভ্রমণ করিয়াছেন। ভ্রমণ শেষ করিয়া ইংলণ্ডে ফিরার পথে এক বিবৃতিতে তিনি বলিয়াছেন : 'পরম পরিতাপের বিষয়, এশিয়ার সাহিত্যকরা তাঁদের মাতৃভাষায় সাহিত্য সাধনা না করিয়া বিদেশী ইংরেজী ভাষায় করিতেছেন। এতে তাঁদের মনীষা সম্যক পরিস্ফুট হওয়ার সুযোগ পাইতেছে না।' মি মম এই কথাটা বলিয়াছেন কতিপয় এশিয় সাহিত্যিকের মনোভাবের প্রতিবাদে। এঁরা মি. মমকে বলিয়াছিলেন, তাঁদের মাতৃভাষা উন্নত সাহিত্য সৃষ্টির যোগ্য নয়। মি. মমের মতে তাঁদের ধারণা ভ্রান্ত। সাহিত্যের উন্নতিতেই ভাষার উন্নতি, ভাষার উন্নতিতে সাহিত্যের উন্নতি নয়।

সাহিত্যই ভাষার আভিজাত্য

কথাটা অতীব সত্য। ভাষা সাহিত্যকে আভিজাত্য দেয়। বাংলা ভাষা অভিজাত ছিল বলিয়া রবীন্দ্রনাথ এ ভাষায় লেখেন নাই, রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন বলিয়া বাংলা অভিজাত ভাষা হইয়াছে।

www.pathagar.com

ভাষা সম্বন্ধে যা সত্য, শব্দ সম্বন্ধেও সেই কথা। কারণ ভাষা মানেই শব্দ। ভদ্র সাহিত্যে স্থান পাওয়ার আগে ভাষা থাকে অভদ্র ভাষা। সাহিত্যে স্থান পাওয়ার পর তার চাষাত্ব ঘুচে, সে হয় ভদ্র। ঠিক তেমনি, শব্দের বেলায়ও তাই ঘটে। সাহিত্যে স্থান পাওয়ার আগে পর্যন্ত শব্দ থাকে অভদ্র অশালীন ভালগার স্ল্যাং। সাহিত্যে স্থান পাওয়ার পর হয় ওটা ভদ্র শালীন ইডিয়ম।

সাহিত্যের পক্ষে এটা বড়লোকী কৃপা-করুণা নয়। এটা পারস্পরিক। জনগণের মুখের ভাষাকে স্থান দেওয়ার আগে পর্যন্ত সাহিত্য থাকে আইভরি টাওয়ারের সাহিত্য। সে ভাষাকে নিজের বুকে স্থান দিয়া সাহিত্য জাতির বুকে নামিয়া আসে। তখন হয় সে জনগণের সাহিত্য। আভিজাত্য ও কৃষ্টি-সভ্যতার অজুহাতে জনগণের জীবন বাদ দিয়া সাহিত্য হইতে পারে না যে কারণে, অশালীনতা ও ভালগারিটির অভিযোগ জনগণের মুখের ভাষাকে সাহিত্য হইতে বাদ দেওয়া যায় না ঠিক সেই কারণে।

উপরের আলোচনায় আমরা দেখিলাম, সাহিত্যের প্রাণ তার রূপ তার আংগিক সব কয়টি নিহিত আছে জনগণের জীবনে। জনগণের জীবন-ক্ষুধা সাহিত্যের প্রাণ, জনগণের জীবন-চিত্র সাহিত্যের রূপ, জনগণের ভাষা সাহিত্যের আংগিক। এই তিনটি পাল্লার ওজনে যে সাহিত্য টিকিল না; সে সাহিত্য গণ-সাহিত্য বা জাতীয় সাহিত্য হইতে পারিলনা।

এইবার আসুন, আমাদের সাহিত্যকে এই তিনটি দাড়িপাল্লায় ওজন করি। আমাদের দেশ বাংলাদেশ একথা আজ যথেষ্ট নয়। বাংলার গণ-জীবনই আমাদের গণ-জীবন, একথাও যথেষ্ট নয়। এর পরেও বলিবার কথা বাকী থাকিয়া যায়। সে কথাটা এই যে, বাংলা ভাগ হইয়া আজ দুইটা স্বাধীন স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হইয়াছে। দেখা যাক, তাতে কি হইয়াছে।

জনগণের জীবন-ক্ষুধা

দুনিয়ার জনগণের জীবন-ক্ষুধার আন্তর্জাতিক রূপ আছে। কারণ 'দুনিয়ার সব মানুষ এক উম্মতের অন্তর্ভুক্ত। এই আন্তর্জাতিক রূপ একদিকে যেমন ইউটোপিয়া নয়, অপরদিকে সেটা আশু বাস্তব ধর্মীও নয়। তাই সেটা আজো স্বাপ্নিক সাহিত্যিকের ইমাজিনেশনের বস্তু।

জনগণের ঐ জীবন ক্ষুধার আন্তর্জাতিক হরাইযনের মধ্যে যে ক্ষুধার রূপটি বর্তমানে সুস্পষ্ট, সেটি তার আঞ্চলিক রূপ। এই আঞ্চলিক জীবন-ক্ষুধার সাধনা ও সিদ্ধি আঞ্চলিক সমাজ-ব্যবস্থা ও রাষ্ট্রিক কাঠামোর সাথে অংগাংগীভাবে জড়িত।

বাংলা ভাগ হইয়া আজ দুইটি স্বাধীন স্বতন্ত্র ও পরস্পর-নিরপেক্ষ রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে। ফলে পূর্ব ও পশ্চিম-বাংলার জনগণের জীবনে আগে যে ঐক্য ছিল সেটা আজ আর জাতীয় ঐক্য নাই, সেটা রূপান্তরিত হইয়াছে আন্তর্জাতিক ঐক্যে।

দুই বাংলার গণ-জীবন আজ দুইটি ভিন্ন ও স্বতন্ত্র রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। উভয়ের জীবন-ধারা তাতে দুইটি ভিন্ন নদীর খাতে প্রবাহিত হইতেছে। সাধনা ও সিদ্ধির পথও পৃথক হইয়া গিয়াছে।

এই ভাবে আমাদের সাহিত্যের বিবেচ্য জাতীয় ও গণ-জীবনের দিক হইতে বাংলা আজ একটি দেশ নয়, দুইটা পৃথক দেশ। বাসিন্দারাও দুইটা জাতি।

www.pathagar.com

জনগণের জীবনালেখ্য

জনগণের জীবন-ক্ষুধা সম্বন্ধে যা সত্য, তাদের জীবন-চিত্র সম্বন্ধে সেটা আরও বেশি সত্য। জীবন-চিত্রে পূর্ব ও পশ্চিম-বাংলা পৃথক ও ভিন্ন ছিল আগে হইতেই। কিন্তু তখন সেটা ছিল রাষ্ট্রের অস্বীকৃত আঞ্চলিক পার্থক্য। দেশ ভাগ হওয়ার পর সে পার্থক্য স্পষ্টতর তীব্রতর ও স্ট্রিমলাইনড হইয়াছে। রাষ্ট্রীয় কাঠামো সামাজিক পরিবেশ ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা দুই দেশের জনগণের জীবন-চিত্রকে আজ আন্তর্জাতিক পার্থক্যের রূপে দেদীপ্যমনি করিয়া তুলিয়াছে।

সুতরাং আমাদের সাহিত্যিকগণকে জনগণের জীবন-ক্ষুধা ও জীবনালেখ্যের তালাশে অবিভক্ত বাংলার পতিত ময়দানে হাতড়াইয়া বেড়াইলে চলিবে না। পূর্ব-বাংলার সীমাবদ্ধ পরিবেশের চৌহদ্দির মধ্যেই এই বাণী ও রূপের সন্ধান করিতে হইবে।

এই সিদ্ধিতে সময় লাগিবে। সাহিত্যের বাণী ও রূপ গ্রোথের ব্যাপার, কনস্ট্রাকশনের ব্যাপার নয়। ওটা একদিনেও হইবে না। সে গ্রোথের স্পিড হইবে আমাদের চিন্তা-নায়ক সাহিত্যিকদের মনের বিস্তার ও দৃষ্টির প্রসারের স্পিডের অনুপাতে।

সময় লাগিবে বলিয়া এ কাজ শুরুই করিব না, সেটা ঠিক নয়। বরঞ্চ ঐ কারণেই তাড়াতাড়ি এখনই শুরু করা দরকার। সময় লাগা সম্বন্ধে সচেতন থাকায় লাভ এই যে তাতে আশু সাফল্যের জন্য ব্যস্তও হইব না, অসাফল্যের দরুন নিরাশ ক্লান্তও হইব না।

জনগণের মুখের ভাষা

সাহিত্যের প্রাণ ও রূপের ব্যাপারটা যত জটিল, আংগিকের ব্যাপারটা তত জটিল নয়। এর গুরুত্ব উপলব্ধি মূল্য নির্ধারণ ও আকৃতি নিরূপণ কোনটাই কঠিন নয়। সমাধানও দুরূহ নয়।

এ কাজে আমাদের সামনে ইতিহাসের নযির আছে। সে নযির আধুনিক। সাফল্যে উজ্জ্বল। তার সাধনা ও সাফল্য আমাদের প্রেরণা যোগাইবার যোগ্য। এই নযির মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এই কথাটাই এখন বিচার করিব।

উনিশ শতকের গোড়া হইতে শেষদিন পর্যন্ত বাংলা ভাষা ছিল পন্ডিতী বাংলা, সংস্কৃত বাংলা, বিদ্যাসাগরী বাংলা। বিশ শতকের গোড়া হইতেই এতে একটা বাংলাত্ব, একটা নিজস্বতা, একটা গণমুখী প্রবণতা দেখা দেয়। এর কারণও ছিল। এই সময় ইউরোপ ও আমেরিকায় এই প্রবণতা শুরু হয়। আমেরিকা ফ্রান্স ও রুশিয়ায় এই গণমুখিতা বিভিন্ন রূপ ধারণ করে। বাংলা সাহিত্যেও এর প্রভাব প্রতিফলিত হয়। টেকচাঁদ ঠাকুর বংকিমচন্দ্র, দ্বিজেন ঠাকুর, রবি ঠাকুর ও বীরবল সবাই আন্তর্জাতিক বিপ্লবে প্রভাবিত হন। রবীন্দ্রনাথের শক্তিশালী কলমের মুখে বাংলার জনগণের মুখের 'অসাধু' ভাষা সাধুতার সম্মান অর্জন করে। এই বিবর্তনের কথা আমি একটু পরে বলিতেছি।এখানে আমি এই আন্তর্জাতিক বিপ্লবে আমেরিকার ভূমিকার কথাটাই শুধু আলোচনা করিব। তার কারণ আছে।

www.pathagar.com

মার্কিন নযির

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র এই সাহিত্যিক বিপ্লবের নেতৃত্ব পায় ঘটনাচক্রে। মার্কিনীদের জন্য এটা শুধু সাহিত্যিক বিবর্তনের প্রশ্ন ছিল না। এটা ছিল তাদের জাতীয় জীবন-মরণের প্রশ্ন।

আঠার শতকের শেষদিকে মার্কিনীরা মাতৃভূমি ইংলন্ডের বিরুদ্ধে লড়াই করিয়া নিজেদের স্বাধীনতা হাসিল করিয়াছিল। তাদের এই স্বাধীনতা একশ' বছর চলিয়া গিয়াছে তখন। 'রাজার স্বর্গীয় অধিকারের' বন্ধন-মুক্ত হইয়া কাগজে-কলমে তারা প্রজাতন্ত্র কায়েম করিয়াছে। ইংরাজের শ্রেণী-প্রথাকে ঘৃণ্য বর্ণাশ্রম বলিয়া ত্যাগ করিয়াছে তারা সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার আশায়। ওয়াশিংটন-লিংকনের মতো গণতন্ত্রের সমর্থক বড় বড় মনীষী তাদের রাষ্ট্রের নেতৃত্ব করিয়াছেন এবং করিতেছেন।

তবু তারা সুখ-শান্তির মুখ দেখিতেছে না। গৃহযুদ্ধে ও নিগ্রোযুদ্ধে মার্কিন মুল্লুক ক্ষত-বিক্ষত, রক্তাক্ত। ইংরাজরা তাদের দুর্দশা দেখিয়া বিজ্ঞের মত মাথা ঝুঁকাইতেছে। বলিতেছে : বুঝ স্বাধীনতার ঠেলা এইবার। ডা. জনসন মার্কিনীদের নিশ্চিত ব্যর্থতার ভবিষ্যৎ বাণী করিতেছেন। শত্রুরা হাসিতেছে। বন্ধুরা আফসোস করিতেছে।

ইমার্সনের পথনির্দেশ

কেন এমন হইতেছে? কেউ বলিতে পারে না কেউ বুঝিতে পারে না। উনিশ শতকের মাঝামাঝি পথের সন্ধান দিলেন ইমার্সন। তিনি রোগের নিদান বাহির করিলেন।

রাজার বন্ধন হইতে মুক্তি বর্ণাশ্রম-ধর্ম বিসর্জন বড় কথা নিশ্চয়ই। কিন্তু নিগেটিভ বড় কথা। পযিটিভ কিছু নয়। পজিটিভ কি? স্বকীয়তা। পঞ্চাশ বছরেও মার্কিনীরা স্বকীয়তার ও জাতীয় সত্তার সন্ধান পায় নাই। ইমার্সন এটা বুঝিলেন। তিনি জাতীয় সত্তা ও স্বকীয়তার দিকে মার্কিনীদের উদাত্ত আহবান জানাইলেন। তিনি অবিশ্রান্ত কলম চালাইয়া যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন রাষ্ট্রে বক্তৃতা করিয়া মার্কিনবাসীকে যা শুনাইলেন তার মূলকথা একটি : 'স্বকীয়তা ধর। অনুকরণ ছাড়। অনুকরণ আত্মহত্যার শামিল। স্বকীয়তাতেই মুক্তি'।

ইমার্সনের এই সাবধান-বাণীর গুরুত্ব বুঝিতে মার্কিনবাসীর পঞ্চাশ বছর লাগিয়াছে। বিশ শতকের গোড়াতেই তারা সর্বপ্রথম বুঝিতে পারে ইংরাজের কবল হইতে তারা রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা হাসিল করিয়াছে সত্য, কিন্তু কৃষ্টি-সাহিত্যে তারা আজো ইংলন্ডের অনুকারী-অনুসারী ছায়া মাত্র।

মার্কিনীদের ধর্ম ইংলন্ডের খৃষ্টান ধর্ম। তাদের কৃষ্টি-ঐতিহ্যও ইংরেজী। কাজেই কি ভাষায় কি ধর্মে কি কৃষ্টিতে কি ঐতিহ্যে কোনও দিক দিয়াই মার্কিনীদের ইংরাজ হইতে স্বতন্ত্র সত্তার কোনও যুক্তি ছিল না। দৃশ্যত কোনো আবশ্যকতাও ছিল না।

মার্কিন মুল্লুক ছাড়াও আরও অনেক দূর দেশে ইংরাজ জাতি উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে। বাড়ির পাশে ঐ কানাডীরাও ত তাই । তারা কিন্তু ইংলন্ডের রাজার অধীনতা-পাশ ছিন্ন করে নাই। মার্কিনীরা করিল কেন? নাহক করিয়াছে। নাহক বলিয়াই তাদের এই স্বাধীনতা ব্যর্থ হইতে বাধ্য।

www.pathagar.com

ইমার্সন দেখাইলেন, মার্কিনীদের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা ও স্বতন্ত্র সত্তার রক্ষা তার বিকাশ ও তার প্রসারের জন্যই তাদের কৃষ্টিক স্বকীয়তায় প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে। ইংরাজের অনুকরণ বর্জন করিতে হইবে। ইমার্সনের ভাষায় : 'মাথায় না দাঁড়াইয়া পায়ে দাঁড়াইতে হইবে'।

এটাই আরম্ভ হয় বিশ শতকের গোঁড়ায়। জারট্রুড স্টেইন, এযরা পাউন্ড, টি. এস. ইলিয়ট মার্কিনীদেরে এই কৃষ্টিক স্বকীয়তায় উদ্বুদ্ধ করেন। তাঁরা বলেন, ইংরাজের কৃষ্টির বন্ধন হইতে মুক্তি পাইতে হইলে মার্কিনবাসীকে আগে ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যের কবল হইতে মুক্ত হইতে হইবে। মার্কিনবাসী এদের নেতৃত্বে এ কাজে হাত দেয়।

মার্কিন ইংরাজী বনাম বিলাতী ইংরাজী

কল্পনা করুন কি কঠিন কাজ। ইংরাজী শুধু অধিকাংশ মার্কিনীদের ভাষা নয়। দুনিয়া-জোড়া সমস্ত বৃটিশ উপনিবেশের সাধারণ ভাষা ইংরেজী ভাষা একটা যে-সে ভাষা নয়। বিশ্বের সবচেয়ে সমৃদ্ধশালী প্রসারণশীল ভাষা।

ইংরাজী সাহিত্য দুনিয়ার ইংরাজীভাষী ভূখন্ডেরই শুধু নয়, সারা দুনিয়ারই প্রেরণাদাতা আদর্শ সাহিত্য। ইংলন্ডের ধর্ম খৃষ্টানিটির ও ইংলন্ডের ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী হইয়া সেই ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যের কবল হইতে মুক্তির আশা দৃশ্যতই অবাস্তব কল্পনা। কিন্তু মার্কিনবাসী অতি অল্পদিনেই এই অবাস্তব কল্পনাকে বাস্তবের সত্যে পরিণত করিয়াছিলেন।

করিতে পারিয়াছিল এই জন্য যে তাদের দাবী ছিল খুবই সীমাবদ্ধ। কৃষ্টিগত স্বতন্ত্র সত্তার জন্য যা না হইলেই নয়, মাত্র সেইটুকুই তাদের দাবি ছিল। ইমার্সন বলিয়াছিলেন: ইংলন্ডের ইংরাজীর হাত হইতে আমরা মুক্তি চাই। এ কথার মানে এই নয় যে, আমরা আমাদের পৈত্রিক সাহিত্য ও ঐতিহ্যের প্রতি অশ্রদ্ধা দেখাইতেছি। এটা আমাদের কৃষ্টিক সাহিত্যিক স্বকীয়তার দাবি। এটা আমাদের বাঁচিয়া থাকার তাগিদ।

ইমার্সনের বাণী ব্যাখ্যা করিয়া বিশ শতকের গোড়ায় মিস জারট্রুড স্টেইন বলেন : আমরা মার্কিনীরা ইংরাজীর বদলে অন্য ভাষা গ্রহণ করিতে চাইনা। আমরা চাই ইংরাজী ভাষা সাহিত্যের মধ্যে মার্কিনী প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিতে। আমরা চাই ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যে মার্কিনী অনুভূতি ঝংকৃত করিতে। ইংরাজীকে আমরা করিতে চাই মার্কিনী জনগণের মুখের ভাষা।

কেমন করিয়া? মিস স্টেইন নিজের কথার ব্যাখ্য করিয়া বলিলেন : "আমরা ইংরাজী হরফ ও ইংরাজী শব্দই ব্যবহার করিব। কিন্তু আমাদের ইংরাজী শব্দের উচ্চারণ আমাদের ইংরাজী শব্দের মানে হইবে মার্কিনী। ইংরাজী ভাষায় অগণিত শব্দ সম্পদ আছে সত্য, কিন্তু তারা ইংলন্ডেই বিচরণ করে। আমরা সে-সব শব্দকে মার্কিন মুলুকের কর্কশ কঠোর মাটিতে নামাইব। এই মাটির মাঠে-ঘাটে আমরা তাদেরে লইয়া খেলা করিব। তাদেরে ঘনিষ্ঠভাবে আপন করিয়া লইব। যে আমার সে আমার সাথে খেলা করিবেই। যার সাথে আমার খেলার অধিকার আছে, সেই কেবল আমার। ঐ সব ইংরাজী শব্দ আমাদের নয়া মাতৃভূমিতে আমাদের আশানিরাশা নিত্য-নতুন শব্দ তৈয়ার করিতেছে। এইসব শব্দ ইংরাজী শব্দের শামিল হইবে!"

www.pathagar.com

কিন্তু মার্কিনীরা একদিনে তা পারে নাই। সহজেও পারে নাই। আমরা বর্তমানে যে হীনমন্যতায় ভুগিতেছি, মার্কিনীরাও এককালে সেই রোগে ভুগিয়াছিল। আমাদের লেখক-সাহিত্যিকরা আজ যেমন আমাদের নিজের ভাষার থনে পশ্চিম-বাংলার ভাষাকেই অধিকতর সভ্য, ভদ্র, শালীন ও সাহিত্যের উপযোগী ভাষা মনে করেন, এককালে মার্কিন লেখক-সাহত্যিকরাও ইংলন্ডের ইংরাজীকে তাই মনে করিতেন। পুরা উনিশ শতক ধরিয়া, এমন কি বিশ শতকের প্রথম ভাগেও, মার্কিন লেখক-সাহিত্যিকদের এই মনোভাব বিদ্যমান ছিল। এটা অভ্যাসের দোষ। পরাধীনতার রেশ। সদ্য-স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশের লোকেরা যেমন নিজেদের দেশের শিল্পজাত দ্রব্যের চেয়ে বিদেশী জিনিসকে অধিকতর সরস ও সুন্দর মনে করে, নিজেদের মাতৃভাষার থনে পরের ভাষাকেও তাই মনে করে। বিখ্যাত ফরাসী রাষ্ট্রবিজ্ঞানী সাহিত্যিক এলেক্সি টকভিল ১৮৩১ সালে আমেরিকা ভ্রমণ করিয়া মার্কিন লেখক–সাহিত্যিকদের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন : 'মার্কিন লেখকরা আমেরিকায় বাস করেন না, তাঁরা বাস করেন ইংলন্ডে। তারা ইংরাজ লেখকদের ভাষাকেই মডেল মনে করেন।' খোদ মার্কিন পণ্ডিত হেনরি ক্যাবট লজ তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'স্টাডিস-ইন-হিস্ট্রি'তে লিখিয়াছেন : ' যে-সব আমেরিকান সাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে চান, নিজেদের মার্কিনী পরিচয় গোপন করিয়া ইংরাজ বনিবার ভান করাই তাঁদের প্রথম পদক্ষেপ। এটা তাঁদের করিতে হয় ইংলন্ডের সাহিত্যিকদের প্রশংসা পাইবার জন্য নয়, নিজের দেশবাসীর স্বীকৃতি পাইবার জন্যই।' এই দুই পন্ডিত ব্যক্তি উনিশ শতকের মার্কিন লেখক-সাহিত্যিকদের সম্বন্ধে যা বলিয়াছেন, আমাদের দেশের বর্তমান লেখক সাহিত্যিকদের সম্বন্ধে তা হুবহু সত্য। এঁদেরও মডেল পশ্চিম-বংগের কথ্য ভাষা। এঁরাও মনের দিক হইতে বাস করেন পশ্চিম-বংগে, পূর্ব-বাংলায় নয়। এঁরা যেন সত্য-সত্যই বিশ্বাস করেন পশ্চিম-বংগের কথ্য ভাষায় না লিখিয়া পূর্ব-বাংলার কথ্য ভাষায়, এমন কি শুদ্ধ বা কেতাবী ভাষায়, বই লিখিলে পূর্ব-বাংলার পাঠকরা তা কিনিবেন না, পূর্ব-বাংলার সাহিত্য-সমাজে তা স্বীকৃতি পাইবে না। ধারণাটা একবারে ভিত্তিহীন নয়। আমাদের নাট্যকারদের কারো কারো মুখে শুনিয়াছি, তাঁরা তাঁদের নাটকের চরিত্রগুণের মুখে পূর্ব বাংলার ডায়লেক্টের বদলে পশ্চিম-বাংলার ডায়লেক্ট দেন এই কারণে যে নামযাদা অভিনেতারা পূর্ব-বাংলার ডায়লেক্টে অভিনয় করিতে অনিচ্ছুক। অভিনেতাদের জবাব এই যে, পশ্চিম-বাংলার ডায়লেক্টে অভিনয় করিতে-করিতে ওটাই তাঁদের মুখে সহজে আসে। তাঁদের কথাও ফেলিয়া দেওয়া যায় না। আমাদের অধ্যাপক শিক্ষক,অফিসার-কেরানী, ব্যবসায়ী-নাগরিকদেরও অনেকের কলমে বাংলার চেয়ে ইংরাজীই সহজে বাহির হয়। এটা অভ্যাসের ফল।

এটাই চলিয়াছিল আমেরিকায় পুরা দেড়শ' বছর। আ... র আজকার মঞ্চ-সিনেমা, রেডিও–টেলিভিশনের মতোই মার্কিন মুল্লুকেরও ঐসব ক্ষেত্রে মার্কিন ইংরাজির বদলে বিলাতি ইংরাজী চলিয়াছিল বিশ শতকের তৃতীয় দশকের শেষ পর্যন্ত। বিখ্যাত ভাষা–বিজ্ঞানী ডা. হেনরি এল, ম্যানকেন তাঁর বিশাল গ্রন্থ 'আমেরিকান ল্যাংগুয়েজে', লিখিয়াছেন : 'এমন এক সময় ছিল যখন সমস্ত মার্কিন অভিনেতারা লন্ডনের ওয়েস্টএন্ডের ডায়লেক্টে অভিনয় করিতেন। কঠোর অধ্যবসায়ে তাঁরা ও রেডিও–টেলিভিশনের সংবাদ–পাঠকরা ঐ ভাষা ও উচ্চারণ শিখতেন। সে উদ্দেশ্যে বহু

—৪

www.pathagar.com

স্কুল স্থাপিত হইয়াছিল। হলিউডের চলচিত্র-শিল্পও বিভিন্ন ব্রডকাস্টিং ষ্টেশনের সাহসিকতায় ১৯৩১ হইতে ১৯৩৯ সালের মধ্যে ঐ প্রথার অবসান হয়।'

– জনগণের জয়

ইংরাজী সাহিত্য যতই সমৃদ্ধ হউক, ইংরাজী ভাষা যতই বিপুল বিশাল হউক, তার প্রভাব যতই শক্তিশালী হউক, ইংরাজের কৃষ্টি যতই সর্বগ্রাসী হউক, তাদের সাম্রাজ্য যতই বিস্তৃত হউক, স্থান ও কালের এই দুর্বার দাবির নিকট সকলের নত হইতে হইল। ইংলণ্ডের শান্তশীতল আবহাওয়া হইতে, বিশ্ব-শাসক ইংরাজের আভিজাত্যের প্রাসাদ হইতে, ইংরাজী ভাষাকে নামিয়া আসিতে হইল মার্কিন মুলুকের রুক্ষ শক্ত মাটিতে। আভিজাত্যের শুভ্র পরিচ্ছন্নতা শালীনতা অক্সনিয়ান সাধুতা আর তার থাকিল না। তার গায় মার্কিন মুলুকের কাদা-মাটির ময়লা লাগিল। 'কয়েদীর জাত' মার্কিন চাষা ও কুলির মুখের 'অভদ্র' ভাষা ইংরাজী ভাষা হইল। তাকে আর সাহিত্যে আপাংক্তেয় রাখা গেল না।

এটা অভিজাত ইংরাজী ভাষার মার্কিনী রূপান্তরের দিক। এই সংগে ইংরাজী সাহিত্যকে গণমুখী করিবার সংগ্রামও শুরু করেন মার্কিন নেতারই। মার্কিন সাহিত্যিক বিবর্তনের অন্যতম প্রধান নেতা এযরা পাউণ্ড এ সম্পর্কে যে সব কথা বলিয়াছেন তার মর্ম এই : ইংরাজীকে আইভরি টাওয়ারে থাকা চলিবে না। মাটিতে নামিয়া আসিতে হইবে। তা যদি সে না নামে, তবে তাকে টাওয়ারের ভাষা হইয়াই থাকিতে হইবে। মার্কিন জনগণ তার সাথে সম্পর্ক রাখিবে না। ইংরাজী সাহিত্যিকও তেমনি যদি প্রাসাদ হতে নামিয়া না আসেন, তবে মার্কিন জনগণ হইতে তিনি সম্পূর্ণ বিযুক্ত হইবেন। যে ভাষা ও সাহিত্য জনগণ হইতে বিযুক্ত হইল, সত্য হইতেই সে বিচ্যুত হইল।

এযরা পাউণ্ড এ ব্যাপারে চীনের ধর্মীয় নেতা কনফিউসিয়াসের নযির দেন। কনফিউসিয়াসের মতে আদর্শ দেশশাসক সেই ব্যক্তি যিনি দেশের প্রত্যেক নাগরিককে নামে চিনেন। চীনা ধর্ম-নেতার এই মহাকাব্যকে এযরা পাউণ্ড সাহিত্যে প্রয়োগ করেন। তিনি বলেন : আদর্শ সাহিত্য সেই সাহিত্য যে-সাহিত্য দেশের জনগণকে নাম ধরিয়া ডাকিতে পারে। নাম ধরিয়া ডাকা ঘনিষ্ঠতার লক্ষণ। এযরা পাউণ্ড দেশের সাহিত্যকে দেশের জনগণের সহিত এমনি ঘনিষ্ঠ হইতে বলেন।

ইহার ফল কি হইয়াছে দুনিয়াবাসীর তা জানা আছে। মিস ষ্টেইন, এযরা পাউণ্ড ও টি. এস. ইলিয়ট মার্কিনবাসীকে কৃষ্টি-সাহিত্যে যে স্বকীয়তায় প্রতিষ্ঠিত করেন, তার ফলেই আজ জ্ঞানে-বিজ্ঞানে রাষ্ট্রনীতিতে "কয়েদীর জাত" মার্কিনীরা বিশ্ব নেতৃত্ব হাসিল করিতে পারিয়াছে। ফ্রস্ট হেমিংওয়ে ও ফকনারের মতো বিশ্ববিখ্যাত সাহিত্যিকের জন্ম সম্ভব হইয়াছে। কৃষ্টি-সাহিত্যে স্বকীয়তা লাভ না করিলে মার্কিনবাসীর পক্ষে এটা সম্ভব হইত না।

– মার্কিনী ও আমাদের সাদৃশ্য

এইবার আসুন, মার্কিন জাতির সাথে আমাদের অবস্থার তুলনা করি।

আমরা পূর্ব-বাংগালীরা পশ্চিম-বাংগালী হইতে পৃথক হইয়া একটা স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের নাগরিক হইয়াছি এখানে মার্কিনবাসীর সাথে আমাদের পুরাপুরি মিল আছে।

www.pathagar.com

পূর্ব ও পশ্চিম-বাংগালীদের ভাষা এক, হরফ এক। আমাদের উভয়ের সাহিত্যিক ঐতিহ্য এক। রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র নযরুল ইসলাম সত্যেন দত্ত উভয় বাংলার গৌরবের ও প্রেরণার বস্তু। ইংরাজ ও মার্কিন জাতিরও এক ভাষা এক হরফ। একই ইংরাজী সাহিত্য একই মিলটন শেক্সপিয়ার উভয় জাতির গৌরব ও প্রেরণার বস্তু। এখানেও আমাদের সাথে মার্কিনীদের অবস্থার পুরা মিল আছে।

দেশ বিভাগের আগেই বাংলা সাহিত্য বিশ্ব-সাহিত্যের দরবারে স্থান পাইয়াছে। গল্পে কবিতায় বিজ্ঞানে দর্শনে সমৃদ্ধশালী হইয়াছে। বাংগালী কবি বাংলা কবিতার জন্য নোবেল প্রাইজ পাইয়াছেন। মার্কিনী স্বাধীনতার আগেই তেমনি ইংরাজী সাহিত্য বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যে উন্নীত হইয়াছে। ইংরাজী সাহিত্য বিশ্বের কৃষ্টি-শিল্পের বাহন ও বিশ্ববাসীর প্রেরণার উৎস হইয়া উঠিয়াছে। পূর্ব-বাংগালীর পক্ষে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের প্রভাব হইতে মুক্ত হওয়া যেমন কঠিন, মার্কিন জাতির পক্ষেও শেক্সপিয়ারের ইংরাজী সাহিত্যের প্রভাব হইতে মুক্ত হওয়া ছিল তেমনি কঠিন। সুতরাং এ ব্যাপারেও মার্কিন জাতির সমস্যার সাথে পূর্ব-বাংগালীর সাহিত্যিক সমস্যার হুবহু মিল আছে।

মার্কিন জাতি ইংরাজী সাহিত্যের প্রভাব-মুক্ত হইয়া জতীয় স্বকীয়তা-ভিত্তিক নিজস্ব সাহিত্য সৃষ্টির তাগিদ অনুভব করিয়াছিল যে কারণে, সেটা ধর্মীয় বা ঐতিহ্যিক তাগিদ ছিল না। পুরাপুরি কৃষ্টির তাগিদও ছিলনা। কারণ ইংরাজ জাতির মতো মার্কিন জাতির ধর্ম ছিল খৃষ্টানি এবং চার্চও ছিল বিলাতী। ধর্ম-ভিত্তিক কৃষ্টিও ছিল তেমনি তাদের অবিভাজ্য।

সুতরাং স্বকীয়তা ও নিজস্বতার তাগিদ ছিল তাদের নিছক রাষ্ট্রীয় স্বতন্ত্র সত্তার তাকিদ। ধর্মে ঐতিহ্যে ও কৃষ্টিতে মূলত মার্কিন ও ইংরাজ এক গোত্রীয় হইলেও রাষ্ট্রীয় ও ভৌগোলিক সত্তায় মার্কিনীরা ছিল ইংরাজ হইতে সম্পূর্ণ আলাদা। একমাত্র এই রাষ্ট্রীয় সত্তার তাগিদেই তারা উপলব্ধি করিয়াছিল, কৃষ্টিক ভাষিক ও সাহিত্যিক স্বকীয়তা ছাড়া রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা রক্ষা বিকাশ ও প্রসার অসম্ভব।

এ ব্যাপারেও মার্কিন জাতির সাথে পূর্ব-বাংলার মিল ত আছেই, বরঞ্চ বেশি তাগিদ আছে। অধিকার ও আবশ্যকতাও আছে বেশি।

আমাদের সুবিধা

ইংরাজ ও মার্কিন জাতির ধর্মীয় কৃষ্টিক ঐতিহ্যিক অবিভাজ্যতা ছিল মার্কিনী স্বকীয়তার পথে বাধা। আমাদের পথে তেমন কোন বাধা নাই। পূর্ব ও পশ্চিম-বাংলার মধ্যে ধর্ম কৃষ্টি ও ঐতিহ্যের ব্যাপারে কোনও অবিভাজ্যতা নাই। এইখানে মার্কিনীদের সাথে পূর্ব-বাংলার কোনও মিল নাই। এ অমিল আমাদের সমাধান সহজতর করিয়াছে।

মার্কিন জাতি যখন স্বাধীন হয় এবং তারা যখন কৃষ্টিতে ভাষায় ও সাহিত্যে তাদের স্বকীয়তা প্রতিষ্ঠার উদ্যম শুরু করে, তখন তাদের নিজস্ব কৃষ্টি ভাষা ও সাহিত্য বলিয়া কিছু মিল ছিল না। রাষ্ট্রীয় স্বাধীন সত্তার প্রয়োজনে পৃথক জাতীয়তার তাগিদে তারা সৃষ্টি ও নির্মাণ শুরু করে একেবারে 'কিছু না' হইতে। 'কিছু না' হইতেই আজ তারা একটা আত্মমর্যাদাবান জাতি, একটা বিপুল কৃষ্টি, একটা সমৃদ্ধশালী সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছে।

www.pathagar.com

এইখানে মার্কিন জাতির সমস্যার সাথে আমাদের মিল নাই। দেশ বিভাগের সময় আমাদের নিজস্ব ভাষা, ইতিহাস, নিজস্ব ঐতিহ্য ও নিজস্ব কৃষ্টি ছিল এবং আছে। কাজেই আমাদিগকে 'কিছু না' হইতে শুরু করিতে হইবে না। আমাদের সমস্যা মার্কিন জাতির সমস্যার মতো কঠিন নয়। আমাদের অবস্থা তাদের মতো নৈরাশ্যজনকও নয়।

আমাদের বর্তমান কৃষ্টি ঐতিহ্য ইতিহাসকে বুনিয়াদ করিয়া অনেক সহজে আমরা নিজস্ব জাতীয়তা ও স্বকীয় সাহিত্য সৃষ্টি করিতে পারি। স্বকীয়তায় মর্যাদাবান পূর্ব-বাংলার সাহিত্যে ভাষায় ব্যাকরণে অভিধানে আমরা এমন উন্নতি সাধন করিতে পারি, যা পশ্চিমবাংলার অনুকরণ অনুসরণের যোগ্য হইতে পারে।

ইংরাজী ভাষার সংস্কারে মার্কিনী প্রচেষ্টাকে ইংরাজেরা গোড়ায় যতই কুনযরে দেখিয়া থাকুক না কেন, এখন সে সংস্কারের অনেকগুলি ইংরাজদের গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হইতেছে।

মিনিমাম দাবি

ইংরাজী ভাষার সংস্কারে মার্কিনী দাবি কোনও অসম্ভব বিপ্লবাত্মক দাবি ছিল না। হরফ বানান ব্যাকরণ অভিধান আমূল পরিবর্তনের কোনও সংকল্প বা চেষ্টা ছিল না। তাদের দাবি ছিল নিতান্তই সীমাবদ্ধ। ইংরাজী ভাষাতে তারা মার্কিনী প্রাণ দিতে চাহিয়াছিল। ইংরাজী সাহিত্যকে দিয়া মার্কিনী জনগণের অন্তরের কথা কওয়াইতে চাহিয়াছিল। মার্কিন জাতির মুখের ভাষাকে তারা ইংরাজী সাহিত্যের ভাষা করিতে চাহিয়াছিল। ইংরাজী হরফ হরফই থাকিবে, ইংরাজী শব্দও শব্দই থাকিবে।শুধু ঐ-সব হরফ ঐ সব শব্দ ইংলন্ডের বদলে মার্কিনী বুলি বলিবে এই মাত্র।

মার্কিন জাতির মতোই পূর্ব-বাংগালীর দাবিও সীমাবদ্ধ মডেস্ট দাবি। আমরা বাংলা শব্দাবলীর মানে বদলাইতে চাই না। আমরা শুধু এই সব হরফ ও শব্দ দিয়া পূর্ব-বাংলার বুলি বদলাইতে চাই। বাংলা ভাষায় আমরা পূর্ব-বাংগালীর রুহ প্রবেশ করাইতে চাই।

তাতে গোটা বাংলা ভাষা ও সাহিতের অবনতি হইবে না, বরঞ্চ উন্নতিই হইবে। সংকুচিত হইবে না, বরঞ্চ প্রসারিত হইবে। তাতে বাংলার শব্দ-সম্পদ যদি বাড়ে, তবে সে-সব নয়া শব্দ পূর্ব-বাংলার অন্তর হইতে পূর্ব-বাংগালীর মুখ হইতেই আসিবে, বাহির হইতে নয়।

তাতে বাংলা হরফে রূপান্তর হইবে না। হরফের সংখ্যায় যদি যোগ-বিয়োগ হয়, তবে সেটা হইবে সাহিত্যের তাগিদে পলিটিক্যাল কারণে। সে বৈজ্ঞানিক প্রয়োজন সে যুগের তাগিদে পশ্চিম-বাংলায়ও অনুভূত হইবে। তাতে আমাদের সংস্কার পশ্চিম-বাংলার গ্রহণযোগ্য হইতে পারে।

কৃষ্টি ঐতিহ্য ও ইতিহাসের পার্থক্য পূর্ব-বাংলার স্বকীয়তা সুস্পষ্ট। তাতে মতভেদও নাই। কাজেই আমাদের এই আলোচনা ভাষার স্বকীয়তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

ভাষায় আমাদের স্বকীয়তা

শব্দ ও শব্দের মিছিলই ভাষার বুনিয়াদ। এই বুনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত মাত্রা ধ্বনি উচ্চারণ স্বরভংগি ফনিটিকস (মুখরেজ) যতি (তালাফফুয) সিনট্যাকস (নহ বা

www.pathagar.com

বাক্য গঠন প্রণালী) ইটিমলজি (সরফ বা শব্দগঠন-পদ্ধতি) প্রেসোডি (উরুয বা ছন্দ প্রকরণ) এইগুলিই ভাষার স্বকীয়তা-বোধক এবং এক ভাষা হইতে অন্য ভাষার স্বাতন্ত্র্য-জ্ঞাপক। পূর্ব-বাংলা ও পশ্চিম বাংলার মধ্যে এইসব বৈশিষ্ট্যের প্রত্যেকটিতেই স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্র্য রহিয়াছে।

এই বৈশিষ্ট্য, স্বাতন্ত্র্য ও পার্থক্যের সংগত কারণ আছে। ভাষাটা আগে মুখের। পরের লেখার। কাজেই ভাষার স্রষ্টা জনগণ, পণ্ডিতেরা নন। ধর্ম সৃষ্টি আবহাওয়ার পরিবেশ ভূগোল ঋতু ও জীবন যাপন প্রণালীর প্রভাব পণ্ডিতদের থলে জনগণের উপর অনেক বেশি। এসব ব্যাপারেই পূর্ব-বাংলার ও পশ্চিম বাংলার মধ্যে পার্থক্য বিপুল। পূর্ব-বাংলা মুসলিম-প্রধান কৃষি-ভিত্তিক, গ্রাম-কেন্দ্রীক। পশ্চিম-বাংলা হিন্দু-প্রধান, শিল্প-ভিত্তিক, নগর-কেন্দ্রীক। পূর্ব-বাংলা নদী-মাতৃক, পশ্চিম-বাংলা নদী-পিতৃক। তার মানে পশ্চিম-বাংলার বেশি নদী ধমনী মাত্র। পূর্ব-বাংলার বেশি নদী ধমনী, শিরা-উপশিরা, স্নায়ু ও তন্তু সবই। এইসব প্রাকৃতিক কারণেই দুই বাংলার জনগণের মুখের ভাষায় সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের, অনেক ক্ষেত্রে বিপরীত ধরনের, প্রসেস ও পদ্ধতিতে শব্দ প্রতীক ও বাক্য গঠিত ও উচ্চারিত হইয়াছে। এই কারণে দুনিয়ার অন্যত্রও একই হরফের ভাষাতেও বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য ঘটিয়াছে।

এইসব বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্যের একটাও দোষের নয়। একটাও লজ্জা বা অগৌরবের বিষয় নয়। কোনটাই অশালীন বা ভালগার নয়। শ্রুতিকটুও নয় যার-তার কানে। পশ্চিম-বাংলার স্বকীয়তাও যেমন শালীন ও মধুর; আমাদের স্বকীয়তাও তেমনি শালীন ও মধুর। পার্থক্য শুধু এই যে, একটা সাহিত্যে স্বীকৃত, অপরটা স্বীকৃত নয়। এই স্বীকৃতি ও অস্বীকৃতির কারণ আছে। সেটা প্রধানত রাষ্ট্রীয় কারণ।

রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার দরুন প্রায় দুই'শ বছর কলিকাতা গোটা বাংলার কৃষ্টি-কেন্দ্র ও সাহিত্য কেন্দ্র ছিল। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গঠন রূপায়ণ বিকাশ ও প্রসার হইয়াছে কলিকাতা হইতেই। কালিকাতার প্রত্যক্ষ পরিপার্শ্ব ও ঘনিষ্ঠ পরিবেশ পশ্চিম-বাংলা। এই কারণে কলিকাতার ভাষার গঠনে রূপায়ণে পশ্চিম-বাংলার প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়িয়াছে। তাতেই পশ্চিম-বাংলার স্বকীয়তা কলিকাতার, সুতরাং গোটা বাংলার, সাহিত্যিক স্বকীয়তায় মর্যাদা লাভ করিয়াছে।

ঠিক এই কারণেই পূর্ব-বাংলার স্বকীয়তা কলিকাতার স্বকীয়তা হয় নাই। সাহিত্যেও স্থান পায় নাই। যে ভাষা বা ভাষার যেটুকু স্বকীয়তা সাহিত্যে স্থান পাইল না, তা আর ভাষা থাকিল না। হইয়া গেল তা স্থানীয় আঞ্চলিক ডায়লেক্ট। সাহিত্যের বিচারে তা হইল অভদ্র অশালীন ভালগারিটি। অভদ্র অশালীন ভালগারিটি হওয়ায় পূর্ব-বাংলার স্বকীয়তা সাহিত্যে স্থান পায় নাই। সাহিত্যে স্থান না পাওয়ায় তা আশালীন ভালগার থাকিয়া গিয়াছে। শতাধিক বছর ধরিয়া চলে এই আন্ধা চক্করের বা ভিশাস্ সার্কেলের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া।

ফল দাঁড়াইয়াছে এই যে, পশ্চিম-বাংলার বাংলা সাহিত্যের বাংলা হইয়াছে। সাহিত্যের বিচারে পূর্ব-বাংলার বাংলা হইয়াছে অপাংক্তেয়। উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলা সাহিত্যের বিচারে পশ্চিম-বাংলার স্বকীয়তা তার বিকৃতি তার শ্রুতিকটুতা তার অপভ্রংশ সবই হইয়াছে বাংলা ভাষার সৌন্দর্য অলংকার ও শালীনতা। আর পূর্ব-

www.pathagar.com

বাংলার অধিকতর সাধু মধুর স্বকীয়তা হইয়াছে অভদ্র অশালীন ভালগারটি। সুতরাং ভদ্র লোকের পাতে দিবার, সাহিত্যে স্থান পাইবার অযোগ্য।

এইভাবে এক'শ বছরে পশ্চিম বাংলার দোষ হইল গুণ, আর পূর্ব-বাংলার গুণ হইল দোষ। অবস্থা শেষ পর্যন্ত এমন দাঁড়াইল যে, শুধু বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে নয়, শুধু কলিকাতাবাসীর নযরে নয়, শুধু পশ্চিম-বাংগালীর বা পশ্চিম বাংলার হিন্দুর বিচারে নয়, স্বয়ং পূর্ব-বাংগালীর বিচারেও পূর্ব-বাংলার স্বকীয়তা তার মুখের ভাষা ঘৃণ্যজঘন্য অভদ্র ছিঃ ছিঃ ওয়াক-থু ব্যাপার হইয়া গেল। কলিকাতা প্রবাসী পূর্ব-বাংলার ভদ্রলোক তার কথাবার্তায়, পূর্ব-বাংগালী সাহিত্যিক তার লেখায়, নিজের পূর্ব-বাংগালীত্ব সযত্নে গোপন করিয়া চলিলেন।

পরিবেশের চাপ

এই পরিস্থিতির জন্য বাংলা সাহিত্যকে পশ্চিম-বাংগালীকে, পশ্চিম-বাংলার হিন্দুকে দোষ দেওয়া যায় না। দোষ কারও নয়। সমস্ত দোষ পরিবেশের। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সৃষ্ট পরিবেশের চাপে স্বাভাবিকভাবেই এটা ঘটিয়াছে। অমন পরিবেশে ঐ অবস্থায় ওরূপ হইয়াই থাকে। হওয়াই স্বাভাবিক।

শুধু ভাষা ও সাহিত্যের ব্যাপারেই নয়, কৃষ্টি-সভ্যতার অন্যান্য শাখায়ও তাই ঘটিয়া থাকে। ঘটিয়াছেও। রাষ্ট্রীয় প্রভাবের তারতম্যও এই উচ্চতা নীচতার জন্য দিয়া থাকে। এই কারণে হিন্দুদের হাতে আমাদের যেমন দুর্দশা পোহাইতে হইত, হিন্দুদেরও তেমনি ইংরাজের হাতে দুর্দশা পোহাইতে হইত। হিন্দু সাহিত্যিকরা যেমন মুসলমান সাহিত্য-সেবীদেরে 'লাল বালতি মাথায় লইয়া' (তুর্কী টুপি পরিয়া) সাহিত্য সম্মিলনীতে যোগ দিতে বারণ করিতেন, হিন্দুদেরে তেমনি ধুতি-চাদর লইয়া রাজ-দরবারে যাইতে নিষেধ করা হইত।

এ বিষয়ে আমরা উভয়েই সমান নিগৃহীত। আমরা পাক-ভারতীয়েরা বিদেশে আজও এই অসুবিধা পোহাইতেছি।

বেশি দিনের কথা নয়। যুক্তরাষ্ট্রের এক রাষ্ট্রীয় পার্টিতে পাকিস্তানের মুসলমান প্রতিনিধি শেরওয়ানী-চুশত পাজামা পরিয়া যোগদান করিয়াছিলেন। ভারতের প্রতিনিধি মাদ্রাজী হিন্দু ভদ্রলোক যোগ দিয়াছিলেন ধুতির উপর লম্বা কোট পরিয়া। পরদিন খবরের কাগযে এইরূপ রিপোর্ট বাহির হয় : 'নিশ্চয়ই অনবধানবশত পাকিস্তানী প্রতিনিধি প্যান্ট পরিতে ভুলিয়া গিয়া শুধু আণ্ডারওয়ার পরিয়াই পার্টিতে আসিয়াছিলেন। আর ভারতীয় প্রতিনিধি আসিয়াছিলেন কোমরে বেডশীট জড়াইয়া খুব সম্ভব ব্যস্ততা হেতু।'

এই মনোভাবের সৃষ্টি হইয়াছে রাষ্ট্রীয় প্রভাবের তারতম্যে। হিন্দুদের যে ধুতি-চাদর পনর বছর আগে ভারতেরই রাজ-দরবারের জন্য অসভ্য পোশাক ছিল, আজ সেই ধুতি-চাদর পরিয়াই ভারতীয়েরা রাষ্ট্রপতি হিসাবে রাজ-ভবনের শোভা বর্ধন করিতেছেন। আমরা বাঙ্গালীরা যে আজো জাতীয় পোশাকের বদলে কোট-টাই পরিতে গৌরব বোধ করি, সে দোষ ইংরাজের নয়। দোষ রাষ্ট্রীয় পরিবেশের এবং শেষ পর্যন্ত আমাদের গোলামি মনোভাবের।

www.pathagar.com

বিভাগ-পূর্ব বাংলা সাহিত্য

ঐ পরিবেশে উক্ত অবস্থায় বাংলাদেশ যখন ভাগ হয়, তখন পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে হিন্দু সাহিত্যিকদের এবং পশ্চিম-বাংলার ভাষায় একক প্রাধান্য ছিল। স্বাভাবিক কারণেই ছিল। সে প্রাধান্যের অধিকারও ছিল তাদের।

বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধশালী করিয়াছিলেন তাঁরাই। বাংলা সাহিত্যকে বিশ্ব-সাহিত্যের দরবারে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন তাঁরাই। সংস্কৃতের কবল-মুক্ত করিয়া বাংলা ভাষাকে বাংগালীত্ব দিয়াছিলেন তাঁরাই। নানা কারণে বাংলার মুসলমানরা সে সাধনায় শামিল হইয়াছিল সামান্যই। ফলে তার প্রাণ তার আংগিকের সকল ক্ষেত্রেই বাংলা সাহিত্য ছিল কার্যত হিন্দু সাহিত্য। উনিশ শতকের শেষ দিকে এবং বিশ শতকের গোড়ায় যে কয়জন মুসলমান নব্য সাহিত্য সেবায় নামেন, মীর মুশারফ হোসের তাঁদের মধ্যে নিঃসন্দেহে প্রধান। তিনি তাঁর 'বিষাদ-সিন্ধু'তে 'আল্লা-খোদার' জায়গায় 'ঈশ্বর-ভগবান' লিখিয়াছেন।

কারণ বাংলার মুসলমানের দৈনন্দিন মুখের ভাষা হইয়াও যেসব শব্দ হিন্দুদের দ্বারা ব্যবহৃত হইত না, তৎকালের সাহিত্যিক বিচারে সেগুলি বাংলা শব্দ ছিল না। বাংলা ভাষায় ঐ সব শব্দ ব্যবহার করিলে ভাষা গুরু-চণ্ডালী ডালগারিটি-দোষে দুষ্ট হইত। শুধু ধর্ম-সম্পর্কিত আরবী-ফারসী শব্দ সম্পর্কেই যে এই বিধি-নিষেধ ছিল তা নয়। মামুলি বৈষয়িক ব্যাপারে মুসলমানদের নিত্য-ব্যবহৃত শব্দের উপরও এই নিষেধাজ্ঞা বলবৎ ছিল। 'পানি' 'লহু' 'গোশত' 'আণ্ডা' প্রভৃতি শব্দও বাংলা সাহিত্যে অচ্ছ্যুৎ ছিল।

অবশেষে সত্যেন দত্ত ও নযরুল ইসলামের আবির্ভাবে কিছু-কিছু মুসলমানী বাংলা শব্দ যে বাংলা-সাহিত্যের স্বীকৃতি লাভ করিয়াছিল, সেটাও ছিল প্রতিভার স্বীকৃতি। মুসলমানদের জাতীয় অধিকারের স্বীকৃতি নয়।

তবু সেটা ছিল সাম্প্রদায়িক বিরোধ। কোন্‌টা 'খাঁটি' বাংলা শব্দ আর কোন্‌টা নয়, এই বিচারেই ছিল সমস্যা সীমাবদ্ধ। বিশ শতকের তৃতীয় দশকে বাংলা সাহিত্যে যে গণমুখিতার প্রবণতা দেখা দেয়, সেটা ছিল গোড়ার দিকে সংস্কৃত-প্রভাবমুক্ত সহজ ও প্রচলিত বাংলা শব্দ প্রয়োগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তখনও সাহিত্যের ভাষা সাধু বাংলা বা লেখ্য বাংলা। কথ্য বাংলা তখনও সাহিত্যে প্রবেশ করে নাই।

রবীন্দ্রনাথ খুবই সহজ ও প্রচলিত বাংলায় লিখিতেন বটে কিন্তু ঐ সময় পর্যন্ত তিনি উপন্যাসের গল্পকারের ভাষাতে ত লেখ্য ভাষা ব্যবহার করিতেনই পাত্র-পাত্রীর ডায়লগের ভাষাতেও লেখ্য বাংলা ব্যবহার করিতেন। কথ্য ভাষা ব্যবহার করিতেন না। তারপর গণমুখী প্রবণতার বন্যায় রবীন্দ্রনাথও ভাসিয়া গেলেন, বরঞ্চ উদ্যমী হইলেন। তখন মাত্র গল্পকারের ভাষাটি থাকিল লেখ্য বাংলা। পাত্র-পাত্রীর ডায়ালগের ভাষা হইল কথ্য বাংলা। এটা ছিল স্বাভাবিক। সাহিত্যকে গণমুখী করিতে হইলে সব ব্যাপারে পাত্র-পাত্রীর কথাবার্তায় ও চাল-চলনে লোক্যাল কালার আঞ্চলিক রং ও ঢং দিতেই হইবে। না দিলে গণ-সাহিত্য হইবে না।

পাত্র-পাত্রীর এই ডায়লগের ভাষা ও আঞ্চলিক রং স্বভাবতই হইল পশ্চিম-বাংলার। পূর্ব-বাংগালী সাহিত্যিক কবিরা এ বন্যার গতিরোধ করিতে পারিলেন না।

www.pathagar.com

ফলে সাহিত্যিক দৌড়ে তাঁরা পিছাইয়া পড়িলেন। যতদিন বাংলা সাহিত্যে কথ্য বাংলা প্রবেশ করে নাই, যতদিন তা সাধু বা লেখ্য বাংলায় সীমাবদ্ধ ছিল ততদিন পূর্ব-বাংলার সাহিত্যক-প্রতিভা বিকাশে বিঘ্ন সৃষ্টি হয় নাই। ঐ যুগে পূর্ব বাংলা কালী প্রসন্ন ঘোষ মীর মুশারফ হোসেন নবীন সেন দীনেশ সেন গোবিন্দ দাস রজনী সেন কায়কোবাদ জলধর সেন মনোমোহন সেন দক্ষিণারঞ্জন উপেন্দ্রকিশোর প্রভৃতি বাংলা-সাহিত্যের তৎকালীন দিক-পালদের জন্ম দিয়াছিল। বাংলা-সাহিত্যে কথ্য ভাষা প্রবেশ করায় এবং স্বাভাবিক কারণেই সে কথ্য ভাষা পশ্চিম-বাংলার কথ্য ভাষা হওয়ায় পূর্ব-বাংলার সাহিত্য-প্রতিভার কণ্ঠরোধ হইয়া গেল।

তারপর এই প্রগতির গতি আরও অনেকে দূর অগ্রসর হইল। গল্প-উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীর মধ্যেই কথ্য ভাষা সীমাবদ্ধ থাকিল না। স্বয়ং গল্পকারের ভাষাও কথ্য ভাষা হইয়া গেল।

শুধু গল্প-উপন্যাসেই নয়, গুরুগম্ভীর সাহিত্যিক বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক প্রবন্ধ নিবন্ধও লেখা হইতে লাগিল কথ্য ভাষায়। পূর্ব-বাংলার সাহিত্যিকরা, এমনকি পূর্ব-বাংগালী মুসলমান সাহিত্যিকরাও, এই বিপুল মিছিলের চাপ ঠেকাইতে পারিলেন না। তাঁরাও 'যিন্দাবাদ' বলিয়া এই মিছিলে শামিল হইয়া গেলেন। আমি নিজেও।

ঠিক এই সময়ে, বাংলা সাহিত্যের এই স্তরে, দেশ ভাগ হয়। পূর্ব ও পশ্চিম-বাংলা দুইটি স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়। তাও আজ পনর বছরের কথা। এই পনর বছরে আমরা ধর্ম ও কৃষ্টির নামে অনেকে কথা বলিয়াছি। গণতন্ত্রের অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়াছি। কিন্তু কৃষ্টি-সভ্যতার বাহন যে সাহিত্য, পূর্ব-বাংলার সেই সাহিত্যকেই কোনও স্বকীয়তা দিতে পারি নাই।

অথচ পূর্ব-বাংলার ছাত্র-তরুণরা বাংলা ভাষার জন্য জান কোরবানি করিয়াছে। তাদের আত্ম-ত্যাগের ফলে বাংলা ভাষা পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হইয়াছে। তাদেরই দাবির উপর বাংলা একাডেমী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বাংলা ভাষার জন্য পূর্ব-বাংগালী এত করিয়াছে। কিন্তু সাহিত্যিকরা বাংলা-সাহিত্যকে আজও জাতীয় সাহিত্য করিতে পারেন নাই। সরকারও বাংলাকে সরকারী ভাষা করেন নাই।

অথচ সীমান্তের ওপারে এই পনর বছরে পশ্চিম-বাংলার সাহিত্য লম্বা-লম্বা লাফে উন্নতির পথে অনেক দূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। গল্প-কবিতায় নাটক-নভেলে বিজ্ঞান-দর্শনে শিশু-সাহিত্যে অনুবাদ-সাহিত্যে এমনকি ধর্মীয় সাহিত্যেও তারা বিপুল সম্পদ সৃষ্টি করিয়াছে। আজ পশ্চিম-বাংলার সাহিত্য অফুরন্ত জ্ঞানের ভাণ্ডারে পরিণত হইয়াছে। আর এদিকে পূর্ব-বাংলা দেশ বিভাগের সময় যেখানে ছিল, আজও প্রায় সেখানেই আছে।

এর কারণ কি? উত্তর, পূর্ব-বাংলার সাহিত্য স্বকীয়তা লাভ করে নাই। স্বকীয়তা লাভ করে নাই কেন? উত্তর, সাহিত্যিকরা এই নয়া রাষ্ট্রীয় পরিবেশের সহিত নিজেদেরে এডজাস্ট করিতে পারেন নাই। উনিশ শ সাতচল্লিশ সালে তাঁরা যে পথে যেদিকে চলিতে ছিলেন, আজো সেই পথে সেই দিকে চলিয়াছেন। যেন ইতিমধ্যে নতুন কিছু ঘটে নাই, নয়া দেশ নয়া জাতি সৃষ্টি হয় নাই, ভাবটা যেন এই। নয়া যিন্দেগির বাণীর ছোঁয়াচও কাজেই তাঁদের মনে লাগে নাই।

www.pathagar.com

ফলে এই পনর বছরেও পূর্ব-বাংলার সাহিত্য স্বকীয়তা লাভ করে নাই : না প্রাণে, না রূপে, না তার আংগিকে। পূর্ব-বাংলার এ স্বকীয়তাকে কেউ ইসলামী রেনেসাঁর সাথে গোল পাকাইবেন না। ও দুইটা সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস। ইসলামী রেনেসাঁর কাজ যোগ্যতর হাতেই আছে। আমি এখানে সে কথা বলিতেছে না। পূর্ব-বাংলার সাহিত্যিক স্বকীয়তার কথাই আমি বলিতেছি।

এ স্বকীয়তায় পূর্ব-বাংলার হিন্দু-মুসলিম বৌদ্ধ-খৃষ্টান সকলেই সমভাবে শামিল ও শরিক। তাদের সকলের সম্মিলিত রূপ প্রতিলফিত হইবে এই স্বকীয়তায়। অবিভক্ত বাংলায় কলিকাতার সাহিত্যিকরা পূর্ব-বাংলার এই স্বকীয়তাকেই আপাংক্তেয় করিয়া রাখিয়াছিলেন। বাংলা ভাগ হইয়া ঢাকায় রাজধানী আসার পরেও এখানকার সাহিত্যিকরা সেই স্বকীয়তাকেই আজো আপাংক্তেয় করিয়া চলিয়াছেন।

আগেই বলিয়াছি সাহিত্যের স্বকীয়তার মধ্যে একটা আন্তর্জাতিকতা ও জাতীয়তা আছে। সাহিত্যের আন্তর্জাতিক রূপটা তার প্রাণে বা বাণীতেই সীমাবদ্ধ। রস-সৃষ্টির মাধ্যমে সাহিত্য আসলে বিশ্ব-মানবতা বিকাশেরই বাণী বহন করে। সেজন্য সাহিত্যের প্রাণ প্রতিষ্ঠায়, তার রুহ পয়দায়, সময় লাগে। একদিনে তা হয় না। ফরমায়েশ-মাফিকও হয় না। কাজেই পূর্ব-বাংলার সাহিত্যে পনর বছরেও স্বকীয় রুহ প্রতিষ্ঠা পূর্ণ হয় নাই, এটা আমার অভিযোগ নয়।

তাছাড়া সাহিত্যে গণ-জীবনের বাণী ও গণ-জীবনের চিত্র রূপায়িত হওয়ার আগে সাহিত্যকে আরেকটি স্তর পার হইতে হয়। সেটা জাতীয় জীবনের বাণী ও রূপ। সব সাহিত্যেই এই যুগ-বিবর্তন হইয়াছে। আমাদের সাহিত্যেও তা হইবে।

এটা বিজ্ঞানের কথা। জাতীয় বিপ্লবের প্রবেশ-পথ দিয়াই সমাজ-বিপ্লব বা গণ-বিপ্লবে যাইতে হয়। পূর্ব-বাংলার জাতীয় জীবন তার ইতিহাস তার ঐতিহ্য তার পুরা কাহিনী তার ঐতিহাসিক হিরো-হিরোয়িন কিম্বদন্তির রবিনহুড্ গণ, এক কথায়, পূর্ব-বাংলার অতীত রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় সত্তার ইতিবৃত্ত কথামালা কিস্‌সা-কাহিনীকে আর্টের রূপে নাটক-নভেলের আকারে রূপায়িত ও জীবন্ত করিতে হইবে।

সেই রূপায়িত অতীত হইতে বর্তমান ও ভবিষ্যতের প্রেরণা ইশারা ইংগিত আসিবে। ফরাসী রুশিয়া ইংলণ্ড আয়র্ল্যাণ্ড ইটালি ও আমেরিকা সব দেশের সাহিত্যেই এই বিবর্তন ঘটিয়াছে। বিভাগ-পূর্ব বাংলায়ও তাই হইয়াছে। পশ্চিম-বাংলার, মানে বিভাগ-পূর্ব গোটা বাংলার, সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র রমেশ দত্ত মাইকেল রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র জাতীয় সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছিলেন বলিয়াই পরবর্তীকালে নজরুল ইসলাম মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তারাশঙ্কর মনোজ বসুরা গণ-সাহিত্য সৃষ্টির স্তরে পৌঁছিতে পারিয়াছেন।

আমাদের জাতীয় সাহিত্য

আমাদেরেও তাই করিতে হইবে। আমাদের জাতীয় সাহিত্যের যুগ স্বভাবতই খাট হইবে। অন্যান্য দেশের মতো লম্বা হইবে না। কারণ অন্যান্য দেশের এই যুগ বিবর্তন হইতে শিক্ষা গ্রহণের সুবিধা আমাদের আছে। কিন্তু যতই সংক্ষেপ হউক, এই জাতীয় যুগ আমাদের সাহিত্যে আসিতেই হইবে। জাতীয় জীবন রূপায়ণের মধ্য দিয়া গণ-জীবন রূপায়ণের এই অমোঘ ঐতিহাসিক প্রসেস আমাদের মানিয়া লইতেই হইবে।

www.pathagar.com

পূর্ব-বাংলা, মানে দ্রাবিড়ী বাংলা, প্রাগৈতিহাসিক কালেও স্বাধীন রাষ্ট্র ছিল। ঐতিহাসিক যুগে হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলিম আমলেও সে স্বাধীন রাষ্ট্রীয় সত্তা বজায় ছিল। উত্তর ভারতের সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের আক্রমণে সে রাষ্ট্রীয় সত্তা ও স্বাধীনতা মাঝে মাঝে ব্যাহত হইলেও জাতীয় সত্তা অব্যাহত ছিল।

এই মুদ্দতের বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন বাংগালী বীর জাতীয় নেতারূপে উত্তরে ভারতের সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে বীরত্বের সংগে রুখিয়া দাঁড়াইয়াছেন। কখনও সে আক্রমণ বীরত্বের সঙ্গে প্রতিহত করিয়াছেন। কখনও কখনও আবার সে আক্রমণ রুখিতে না পারিয়া অধিকতর বীরত্বের সঙ্গে জান কোরবানি করিয়াছেন।

জানা-অজানা ইতিহাসের পাতা ঘাঁটিয়া এঁদের কথা জানিতে হইবে। কাব্য-নাটক ও গল্প-উপন্যাসের আখ্যান-বস্তু করিতে হইবে। পূর্ব-বাংলার সে বীরত্বের ও গৌরবের জাতীয় অধ্যায়কে জীবন্ত অগ্নিক্ষরা করিয়া পূর্ব-বাংগালীর চোখ ও মনের সামনে তুলিয়া ধরিতে হইবে। তবেই পূর্ব-বাংগালী স্বকীয়তা বোধে ও জাতীয়তার উন্মাদনায় সঞ্জীবিত হইয়া উঠিবে। স্কটের আইভানহো ট্যালিসম্যান, বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দ মঠ রাজসিংহ-প্রতাপাদিত্য (চন্দ্রশেখর) এমন কি, দেবী চৌধুরানী হইতে এ ব্যাপারে প্রেরণা লাভ করা যাইবে।

আমাদের ঐতিহাসিক বীরদের সংখ্যাও বেশি, বীরত্বের কাহিনীও অতুলনীয়। শামসুদ্দিন ইলিয়াস হুসেন শাহ ঈসা খাঁ মুসা খাঁ ওসমান আফগান কেদার রায় মজলিস-কুতুব বাহাদুর গাজী সোনাগাজী মধুরায় প্রভৃতি শাসক ও হাজী শামসুদ্দিন বাগদাদী মাসুম খাঁ আদিল খাঁ প্রভৃতি সেনাপতির রোমাঞ্চকর বীরত্ব স্কট-বঙ্কিমচন্দ্রের বীরদের তুলনায় হীন ত নয়ই, বরঞ্চ সর্বাংশেই শ্রেষ্ঠ।

সাহিত্যের বিষয়-বস্তু

এঁদের জীবন-কথা লইয়া জাতীয়তা-দ্যোতক নাটক-উপন্যাস লিখিয়া সাহিত্য-শিল্পীরা পূর্ব-বাংলার জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতে পারেন।

পরবর্তী কালের ওহাবী আন্দোলন মোমিনশাহীর ফকির আন্দোলন তিতুমীর মাওলানা শরিয়তুল্লাহ ও দুদু মিয়ার কাহিনী আমাদের জাতীয় জীবনের প্রেরণা যোগাইতে পারে।

বর্তমান যুগে ঐতিহাসিক রোমান্টিক নাটক-নভেল চলিবে না যাঁরা মনে করেন, তাঁদের ধারণা ভুল। বর্তমান যুগেও কিরূপ প্রাণস্পর্শী ঐতিহাসিক রোমাঞ্চকর রোমান্টিক নভেল লেখা যায়, রাইডার হ্যাগার্ড তার সাক্ষী।

কোনও যুগের জন্যই সাহিত্যের কোনও রূপই বাসী হয় না। আসলে চাই রস-সৃষ্টির প্রতিভা। সুতরাং পূর্ব-বাংলার সাহিত্যকেও এই জাতীয় স্তর পার হইতেই হইবে। অন্য কথায়, আমাদের মধ্যেও স্কট হ্যাগার্ড হিউগো বঙ্কিমচন্দ্র রমেশ দত্ত, মাইকেল রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র ক্ষীরোদ প্রাসাদ গিরিশচন্দ্র ডি, এল, রায়ের জন্ম হইতে হইবে। নযিরের সুবিধা আছে বলিয়া আমাদের প্রতিভাবান সাহিত্যিকরা যুগপৎভাবেই বঙ্কিমচন্দ্র ও তারাশঙ্কর হইতে পারেন।

অতীতের বীরদের বীরত্ব কাহিনী হইতে বর্তমানের মধ্যবিত্তশ্রেণীর জীবনালেখ্যের পথ দিয়াই আমাদিগকে গণ-জীবনে প্রবেশ করিতে হইবে। গভর্নর মিনিস্টার হাকিম

www.pathagar.com

জজ উকিল ব্যারিস্টার ডাক্তার বিজ্ঞানী টিচার প্রফেসার সাহিত্যিক সাংবাদিক প্রভৃতি শহরিয়া সুধীদের, মাস্টার শিক্ষক মোল্লা মৌলবী তালুকদার জোতদার জমিদার প্রভৃতি গ্রামীণ ইন্টেলিজেনশিয়ার, পীর-দরবেশ সাধু-সন্ন্যাসী প্রভৃতি ধর্ম-নেতার জীবনালেখ্য আমাদের মধ্যবিত্ত সমাজের জীবন-চিত্র প্রাণবন্ত বাস্তবরূপে ফুটাইয়া তুলিতে হইবে।

এই যুগ উত্তীর্ণ হইবার পর আসিবে আমাদের গণ-জীবনের সাহিত্যের যুগ। এই যুগে আমাদের কৃষক শ্রমিক কৃষি-মজুর কলের মজুর কুলি রিকশাওয়ালা প্রভৃতি সমাজ-ইমারতের নিচের তলার শোষিত জনগণের জীবনালেখ্য আমাদের সাহিত্যের মযমুন ও বিষয়বস্তু হইবে। তখনই হইবে আমাদের সাহিত্য গণ-সাহিত্যরূপে সমৃদ্ধশালী। এটাই হইবে পূর্ব-বাংলার মানিক বানার্জি তারাশঙ্করের যুগ।

আর্টের রূপান্তর

আগেই বলিয়াছি, আমাদের সাহিত্যের এই যুগ-বিবর্তনের দীর্ঘ সময় লাগিবে না। বরঞ্চ যুগপৎভাবেই এ বিবর্তন ঘটিতে পারে। বিশ্বজগৎ আর আগের বিশ্ব-জগৎ নাই। বিজ্ঞান আজ দুনিয়ার চেহারাই বদলাইয়া দিয়াছে। সর্বত্র আজ জনগণের রাজ প্রতিষ্ঠিত হইতেছে।

জনগণের জীবনরূপই আজ জাতীয় জীবনরূপে স্বীকৃত। আর্ট শিল্প সাহিত্য আজ আর মুষ্টিমেয় শোষকের জীবন-রস নয়। জনগণের জীবনে তা ব্যাপ্ত হইয়াছে। দুনিয়ার ভৌগোলিক দূরত্ব আজ সঙ্কুচিত।

বিশ্ব-মানব আজ এক পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হইতে চলিয়াছে যুদ্ধবাদী শোষকদের সমস্ত প্রতিরোধ ঠেলিয়া। এই ভাবে পৃথিবীকে ছোট করিয়া বিজ্ঞান মানুষকে গ্রহ-নক্ষত্রের দেশে টানিয়া নিতেছে।

বিভিন্ন গ্রহ-উপগ্রহে মানুষ ছড়াইয়া পড়িবে, সে দিনও আর বেশি দূরে নয়। পক্ষান্তরে এটম বোমা ও ব্যালিস্টিক মিজাইল আজ সারা বিশ্বজগৎকে এক ফুৎকারে উড়াইয়া দিবার জন্য দাঁত বাহির করিয়াছে। এ সবই ঘটিতেছে কল্পনাতীত দ্রুত গতিতে।

আমরা বাস করিতেছি এই যুগে। আমাদের সাহিত্যিকরা আমাদের তরুণরা জন্ম নিয়াছেন এমনি বিপ্লবের ঝড় তুফানের মধ্যে ইসরাফিলের সিঙ্গার আওয়াজের সোরগোলে। কাজও করিতে হইবে তাঁদের এই পরিবেশেই। বিবর্তন আসিবে তাঁদের ঐ গতিতেই। এই হইবে আমাদের কৃষ্টি সাহিত্যের বিবর্তনের গতি।

সাহিত্যের আংগিক

এটা সাহিত্যের প্রাণ ও রূপের দিক। আংগিকের দিকটা ভিন্ন রকমের। সাহিত্যের আংগিক মানে ভাষা। আমাদের ভাষা মানে শুধু বাংলা ভাষা নয়, পূর্ব-বাংলার ভাষা। এইখানেই মার্কিন ইংলিশ ও বৃটিশ ইংলিশের দ্বন্দ্বটা আমাদের মডেল হইবে, প্রেরণা যোগাইবে।

সব ভাষার মতই বাংলা ভাষারও দুইটা রূপ : লেখ্য ও কথ্য। গদ্য ও পদ্যের কথা এখানে বলিলাম না। কারণ, ওটা আসলে ভাষার রূপ নয়, পদ-বিন্যাসের রূপ। লেখ্য

www.pathagar.com

বাংলা পশ্চিম ও পূর্ব-বাংলায় একই। মুসলমান লেখকদের বাংলায় আরবী ও ফারসীমূলক শব্দের সংখ্যা একটু বেশি থাকে বটে, কিন্তু ও-পার্থক্য শ্রেণীগত নয়, পরিমাণ-গত। কারণ, হিন্দু লেখকরাও যথেষ্ট আরবী-ফারসীমূলক শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন।

কালক্রম পূর্ব-বাংলার পাড়া-গাঁয়ের ক্ষেতি-খোলার, নদী-বন্দরের, হাট-বাজারের বহু অজ্ঞাত-অবহেলিত শব্দ পূর্ব-বাংলার সাহিত্যে স্থান পাইবে। তাতেও পূর্ব ও পশ্চিম-বাংলার লেখ্য ভাষার পার্থক্য খুব বাড়িবে না। বাড়িলেও সেটা হইবে পরিমাণ গত। পশ্চিম-বাংলার গণ-মুখী উন্নতিশীল সাহিত্যেও তেমনি পাড়া-গাঁয়ের গঞ্জ-বাজারের বহু অবহেলিত শব্দ স্থান পাইবে।

কাজেই আজ যেমন আছে ভবিষ্যতেও তেমনি পূর্ব ও পশ্চিম-বাংলার লেখ্য ভাষার ঐক্য অটুট থাকিবে। মার্কিন মুল্লুকে অমন শক্তিশালী ও সুদূরপ্রসারী ভাষা বিপ্লব হইবার পরেও ভৌগোলিক দূরত্ব সত্ত্বেও লেখ্য মার্কিন ইংরেজী ও বিলাতী ইংরেজী মোটামুটি একই আছে। আমাদের উভয় বাংলায়ও তাই থাকিবে। লেখ্য বাংলায় লেখা যে-কোনও প্রবন্ধ নিবন্ধ, যে কোনও দর্শন বিজ্ঞানের বই, এমনকি গল্প-উপন্যাসেও উভয় বাংলার বই বলিয়া দাবি করিতেও পারিবে, সে দাবি গৃহীতও হইবে। কাজেই বলা যাইতে পারে, সাধু বা লেখ্য উভয় বাংলার ভাষা অবিভাজ্য।

দুই বাংলার ডায়লেক্টে পার্থক্য

কিন্তু কথ্য বাংলা সম্বন্ধে এ কথা বলা চলে না। কথ্য বাংলা কি ধ্বনি কি মাত্রা কি স্বরভংগি কি উচ্চারণ কি পদ-বিন্যাস সব ব্যাপারেই দুই বাংলায় অনেকখানি পৃথক। ক্রিয়া পদেই এই পার্থক্য সবচেয়ে বেশি তীব্র।

এটা দেখা যাইবে যে এই উভয় প্রকার পার্থক্যেই আঞ্চলিক বিকৃতি পশ্চিম বাংলার কথ্য ভাষাকে সাধু বা লেখ্য বাংলা হইতে যতদূরে সরাইয়াছে, পূর্ব-বাংলার বিকৃতি এখানকার কথ্য ভাষাকে সাধু ভাষা হইতে ততদূরে সরায় নাই। তাছাড়া পূর্ব-বাংলার কথ্য ভাষায় অনেক শব্দ সাধুরূপেই ব্যবহৃত হয়। পশ্চিম-বাংলার কথ্য ভাষায় 'সুতা'কে 'সূতা' 'রূপা'কে' 'রূপো' 'তূলা'কে 'তূলো' 'উল্টা'কে 'উল্টো' এমনকি মুসলমানী নামের আরবী 'উল্লা'কে 'উল্লো' করা হইয়াছে। এমন শব্দ-বিকৃতি আরো অনেক আছে। কিন্তু পূর্ব বাংলায় এগুলি সাধু রূপেই কথ্য ভাষায় ব্যবহৃত হইতেছে।

পশ্চিম-বাংলার এই বিকৃতি অযৌক্তিক ও অনাবশ্যক। বলা হয়, শব্দ-মূলের আঞ্চলিক মোচড়ের প্রয়োজনেই এটা হইয়া থাকে। দুই সিলেবলের শব্দের প্রথমটা 'উ' হইলে পরেরটার 'আ' 'ও' হইয়া যায়।

কথাটা ঠিক নয়। কারণ পশ্চিম-বাংলার লোকেরাই 'সুরা' 'যুবা', 'মুদা', 'মুদ্রা', 'সুধা', মূর্ছা ইত্যাদি বহু শব্দ সাধুরূপেই উচ্চারণ করিয়া থাকে। সুতরাং কতিপয় শব্দের এরূপ বিকৃতিকে ইংরাজীর 'বি ইউ টি বাট' ও 'পি ইউ টি পুটের' মতো অন্ধ ও অকারণ বিকৃতি ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। কাজেই এসব বিকৃতি গোড়াতে ছিল আঞ্চলিক ভালগারিটি, সাহিত্যে বা ভদ্র লোকের মুখে স্থান পাইবার অযোগ্য।

www.pathagar.com

এর চেয়েও গুরুতর ও ঘোরতর শব্দ বিকৃতি ঘটিয়াছে পশ্চিম-বাংলায় ভাষার ক্রিয়াপদে। সাধু ও লেখ্য ভাষার 'খাইয়া', 'পরিয়া', 'বসিয়া', 'পড়িয়া', ইত্যাদি ধ্বনির শব্দগুলি পশ্চিম-বাংলায় এক মোচড়ে 'খেয়ে', 'পরে', 'বসে' 'পড়ে', হইয়া গিয়াছে। 'খাওয়াইয়া' 'পরাইয়া', 'বসাইয়া', 'পড়াইয়া', দাঁড়াইয়া' প্রভৃতি শব্দগুলি পশ্চিম-বাংগালীর মুখে এমন ডাইভিং মোচড় দিয়াছে যে ওদের সাধুরূপ হইতে শব্দগুলিকে সহস্র যোজন দূরে নিয়া গিয়াছে। পশ্চিম-বাংলায় ওদের কথ্য রূপ 'খাইয়ে', 'পরিয়ে', 'বসিয়ে', 'পড়িয়ে', 'দাঁড়িয়ে', ইত্যাদি ইত্যাদি। না বলিয়া দিলে এদের পিতৃত্ব ঠাহর করিবার উপায় নাই।

শুধু তাই নয়। এইসব বিকৃতিতে সাধু শব্দ 'খাইয়া', 'পরিয়া', 'বসিয়া' প্রভৃতি শব্দকে উহাদের কথ্য রূপের সহিত গোল পাকাইয়া ভাষায় অনাবশ্যক জটিলতা সৃষ্টি করা হইয়াছে। এর চেয়েও বাজীকরের উল্টা ডিগবাজী মারা হইয়াছে যুক্ত ক্রিয়াপদে। 'পার হইয়া' 'পেরিয়ে' 'বাহির হইয়া' 'বেরিয়ে' ইত্যাদি বিকৃতির না আছে কোনও যুক্তি না আছে কোনও আবশ্যকতা। এই সব বিকৃতি শুধু ভাষার সারল্যকে দুরপনেয় জটিলতায় ভারাক্রান্তই করে নাই, বিদেশী বাংলাশিক্ষার্থীর নাগালের বাইরে নিয়া গিয়াছে।

আঞ্চলিক বিকৃতির পুরস্কার

এই সব বিকৃতি এবং এই ধরনের আরও হাজার বিকৃতি পশ্চিম-বাংলার আঞ্চলিক ত্রুটি-বিচ্যুতি। আশালীন ভালগারিটি। পশ্চিম-বাংগালীর ভাষিক দুর্বলতা। সাধারণ অবস্থায় এই সব আশালীন ভালগারিটি সাহিত্যে স্থান পাইত না।

কিন্তু বাংলা সাহিত্যে পশ্চিম-বাংলার প্রাধান্যের সুযোগ গ্রহণ করিয়া এই সব ভালগারিটি সাহিত্যে ঢুকিয়া পড়িয়াছে। সাহিত্যে স্থান পাওয়ার ফলে এরা ভদ্র, শালীন ও অভিজাত হইয়া উঠিয়াছে।

পক্ষান্তরে ঐসব শব্দের সাধু রূপ রক্ষা করিয়া পূর্ব-বাংলা চোর বনিয়াছে ক্রিয়াপদে পূর্ব-বংলায় রূপান্তর যা ঘটিয়াছে, সেটা সাধু শব্দের খুবই কাছাকাছি। 'খাইয়া' ইত্যাদি ধ্বনির শব্দে হ্রস্ব 'ই' আরেকটু হ্রস্ব হইয়াছে মাত্র। যুক্ত ক্রিয়াপদেও সে রূপান্তর শুধু ক্রিয়া অংশেই উপরোক্ত রকমের হ্রস্বতা লাভ করিয়াছে। মোট কথা, জোরের সংগেই একথা বলা যায়, পূর্ব-বাংলা ক্রিয়াপদেও সাধুতা রক্ষা করিয়া চলিয়াছে। পূর্ব-বাংলার এই সাধুতা স্বাভাবিক কারণেই বাংলাসাহিত্যে স্থান পায় নাই। পায় নাই বলিয়া তারা অশালীন ভালগারিটি রহিয়া গিয়াছে। নব্য বাংলা সাহিত্যের বিচারে এইভাবে চোর হইয়াছে সাধু, আর সাধু হইয়াছে চোর।

যতদিন কলিকাতা আমাদের রাজধানী ছিল এবং সেজন্য বাংলা সাহিত্যের কেন্দ্র ছিল ততদিন আমরা পূর্ব-বাংগালীরাও এই অবিচার মানিয়া নিতাম অবস্থাগতিকে। আমরা নিজেদের লেখাতেও পূর্ব-বাংলার সাধুতাকে আশালীন ভালগারিটি বলিয়া বর্জন করিতাম। আর পশ্চিম-বাংলার আশালীন বিকৃতিকে সাহিত্যের অলংকার রূপে অনুকরণ ও অনুসরণের চেষ্টা করিতাম। এটা না করলে সাহিত্যিক সমাজে স্থান হইত না। কাজেই অবস্থাগতিকেই আমাদের জন্য ছিল এই অন্ধ অনুকরণ-প্রিয়তা স্বাভাবিক।

www.pathagar.com

অনুকরণ করি কেন?

ইংরাজের আমলে অবিভক্ত ভারতে ইংরাজী শিখিতে ও বলিতে গিয়া আমরা ইংরাজের অভদ্র আশালীনও ভালগার বিকৃতি ও ত্রুটি-বিচ্যুতিরও অনুকরণ করিতাম। তা না করিলে ইংরাজী শিক্ষা পারফেক্ট হইত না মনে করিতাম। এই অন্ধ অনুকরণ শুধু সাধু ইংরাজী শব্দের বিকৃত ইন্টোনেশনের অনুকরণেই সীমাবদ্ধ ছিল না। আমাদের নিজের দেশীয় শব্দে নিজেদের নামে শহর বন্দরের নামে ইংরাজের উচ্চারণ-ত্রুটি স্বরভংগি ইন্টোনেশনে এমন কি ভুল বানানে পর্যন্ত তাদের এইপিং অর্থাৎ বানরের মতো অনুকরণ করিতাম। 'আহমদ'-কে 'আমেড', 'মোহাম্মদ'কে 'মোহামেট' 'সাহা'কে'শ' 'মিত্র'কে 'মিটার', 'ঠাকুর'কে 'টেগোর' কলিকাতা'কে 'ক্যালকাটা' এবং 'ঢাকা'কে 'ডেক্কা' 'চাটগাঁও'কে চিটাগাং বলিতাম ও লিখিতাম শুধু আমাদের তৎকালীন মুনিবদের অনুকরণ করিয়া 'ভদ্রলোক' হইবার আশায়।

আমরা বাংগালীরা ইংরাজের এবং আমরা পূর্ব-বাংগালীরা পশ্চিম-বাংগালীর বিকৃতির অনুকরণ করিতাম রাজনৈতিক অবস্থা বৈগুণ্যের ফলে। রাজনৈতিক প্রভাবের তারতম্য ছাড়াও লোকে ভাষার এই কথ্য বিকৃতির অনুকরণ করে যখন কেউ বিদেশী ভাষা শিখিতে চায়। কোনও বিদেশী লোক যদি ইংরাজী বা ফরাসী ভাষা শিখিতে চায় তবে সে শিক্ষার্থী শুধু লেখায় নয় কথাবার্তায়ও ঠিক ইংরাজ ফরাসীর মত ন্যাচরেল ভংগিতে বলিতে চেষ্টা করিবে, এটা খুবই স্বাভাবিক।

পক্ষান্তরে একই ভাষাভাষী এক অঞ্চলেরা লোক অন্য অঞ্চলের ত্রুটি-বিকৃতিকে ক্ষমার বা কৃপার চোখে দেখিবে, কিন্তু কদাচ অনুকরণ করিবে না একমাত্র ক্যারিকেচার করার উদ্দেশ্য ছাড়া। ইংলণ্ডের ইংরাজ মার্কিন বিকৃতি, কিম্বা আমেরিকার মার্কিন ইংরাজের বিকৃতি কদাচ অনুকরণ করিবে না। তেমনি লাখনৌর উর্দু ভাষী দিল্লী বা লাহোরের উর্দু বিকৃতির অনুকরণ করিবে না। বিহারী হিন্দী ভাষী রাজপুতনার মাড়ওয়ারী হিন্দীর বিকৃতি অনুকরণ করিবে না। কেউ তা করে না।

কিন্তু আমরা পূর্ব-বাংগালীরা তা করি। আজো করি। পূর্ব বাংলা স্বতন্ত্র রাষ্ট্র, পূর্ব-বাংগালী ভিন্ন নেশন হওয়ার পরেও করি। শুধু পশ্চিম-বাংলার বিকৃতি গ্রহণেই অনুকরণ করি না, পূর্ব-বাংলার সাধুতা বর্জনের ব্যাপারেও করি।

প্রাক-স্বাধীনতা আমলে কলিকাতায় বসিয়া আমরা যেমনভাবে পশ্চিম-বাংলার অন্ধ অনুকরণ করিতাম এবং পূর্ব-বাংলার সাধুতাকে অশালীন ভাল্গারিটি বলিয়া বর্জন করিতাম, আজ ঢাকায় বসিয়াও তাই করিতেছি।

কেন করিতেছি? পুরাতন অভ্যাসের দোষে? যাঁরা দীর্ঘ দিন কলিকাতায় বাস করিয়াছেন, কলিকাতার ভাষায় লিখিয়াছেন, ঐ ভাষায় কথা বলিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁদের বেলায় না হয় অভ্যাসের যুক্তিটা তর্কস্থলে মানিয়া নিলাম। কিন্তু কলিকাতা যাঁরা চোখে দেখেন নাই, বাংলা ভাগ হওয়ার পর যাঁদের সাহিত্যে হাতেখড়ি হইয়াছে, তাঁদের বেলায় অভ্যাসের কথা উঠে কেমন করিয়া? তা ছাড়া অভ্যাসের যুক্তিটা কোনো যুক্তিই নয়। স্বকীয়তায় সচেতন আত্মমর্যাদাজ্ঞানী কোনো লোকই এ যুক্তি দিতে পারেন না।

www.pathagar.com

দুইটি অসার যুক্তি

তা হইলে পূর্ব-বাংলার সাহিত্যিকদের যাঁরা এটা করেন, তাঁরা দুইটি কারণে তা করিয়া থাকেন। এক, তাঁরা মনে করেন পশ্চিম-বাংলার কথ্য বাংলাই গোটা বাংলার একমাত্র সফিস্‌টিকেটেড্ স্ট্যাণ্ডার্ডাইযড কথ্য ভাষা। দুই, পূর্ব-বাংলার নিজস্ব ঐরূপ কোন স্ট্যাণ্ডার্ডাইযড্ কথ্য ভাষা নাই।

দ্বিতীয় যুক্তিটার আলোচনাই আগে করি। পূর্ব-বাংলার কোন স্ট্যাণ্ডার্ডাইযড্ কথ্য ভাষা নাই এ কথা ঠিক না। তাঁদের কথার যেটুকু ঠিক তা এই যে সাহিত্যে স্বীকৃত কোনও স্ট্যাণ্ডার্ডাইযড্ কথ্য ভাষা পূর্ব-বাংলার নাই। পূর্ব-বাংলার সুধী সমাজ যথা হাইকোর্টের জজ-ব্যারিস্টার ও উকিল-অফিসাররা, জিলা কোর্টের জজ-উকিল-মোখতার অফিসাররা, সেক্রেটারিয়েট বিল্‌ডিং-এর মন্ত্রী ও অফিসাররা, আইন-সভার মেম্বাররা, বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের অধ্যাপক ছাত্র-অফিসাররা, শিল্প-বাণিজ্যের মালিক কর্মচারীরা, স্কুলসমূহের শিক্ষক আলেম-ওলামা ধর্ম প্রচারকরা সর্বোপরি সাহিত্যিক সাংবাদিকরা তাঁদের রোজকার আলাপ-আলোচনায় যে ভাষায় কথা বলেন, সেইটাই পূর্ব-বাংলার স্ট্যাণ্ডার্ডাইযড্ কথ্য বাংলা।

পূর্ব-বাংলার বিভিন্ন জিলায় ও অঞ্চলে বিভিন্নরূপের কথ্য ভাষা আছে বলিয়াই এখানে কোনও স্ট্যাণ্ডার্ডাইযড্ কথ্য ভাষা নাই, এটা গ্রহণযোগ্য যুক্তি নয়। পশ্চিম-বাংলায় বিভিন্ন আঞ্চলিক ডায়লেক্ট থাকা সত্ত্বেও কলিকাতার সুধীসমাজে যা হইয়াছে, আমাদের রাজধানীর বা বিভিন্ন শহরের সুধী সমাজেও তেমনি একটা কমন স্ট্যাণ্ডার্ডাইযড্ কথ্য ভাষা গড়িয়া উঠিয়াছে।

দুর্ভাগ্য শুধু যে পূর্ব-বাংলার সাহিত্যিকরা আজো তাকে সাহিত্যে স্থান দেন নাই। এই স্ট্যাণ্ডার্ডাইযড্ ভাষা এখনো ভালরূপে দানা বাঁধে নাই, অতএব সাহিত্যে স্থান পাওয়ার যোগ্য এখনও হয় নাই, ক্রমে হইবে, এই যুক্তিও আমাদের সাহিত্যিকদের কাজে-কর্মে সমর্থিত হয় না।

পূর্ব-বাংলার নিজস্ব একটা স্ট্যাণ্ডার্ডইযড্ কথ্য ভাষা হওয়া দরকার এটা যাঁরা মানেন তাঁরা এটাও নিশ্চয়ই মানেন যে সেটা গঠনের ও দানা বাঁধাইবার প্রচেষ্টা সাহিত্যিকদেরই করিতে হইবে। স্বাভাবিক অবস্থায় এ প্রচেষ্টা তারা করিয়া যাইবেন এবং অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থারূপে নিতান্ত আবশ্যক-বোধে কলিকাতার প্রচলিত কথ্য ভাষাই ব্যবহার করিবেন। ইহাই আশা করা যায়।

আসল কারণ কি?

নিতান্ত আবশ্যকের জায়গা কোন্-কোন্‌টা? তর্কস্থলে মানিয়া নিতেছি, সিনেমা-নাটকে পাত্র-পাত্রীদের মুখে গল্প-উপন্যাসের ডায়লগে এটা আবশ্যক। কিন্তু কার্যত কলিকাতার কথ্য বাংলা আমাদের সাহিত্যের ঐ কয়টি জায়গাতেই সীমাবদ্ধ নাই। গল্প-উপন্যাসের গল্পকারের ভাষাতেও ঐ কথ্য বাংলা ঢুকিয়াছে।

আমাদের মাসিক-সাপ্তাহিক কাগজের আলোচনায়, আমাদের দৈনিক কাগজ সমূহের ম্যাগাজিন সেকশনে, কোন-কোন খবরের কাগজের সম্পাদকীয় ও সংবাদ

www.pathagar.com

পরিবেশনেও কলিকাতার কথ্য ভাষা ঢুকিয়াছে। এমন কি সাহিত্য দর্শন বিজ্ঞান ধর্ম কৃষ্টি ইত্যাদি গুরু-গম্ভীর বিষয়ের পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ-নিবন্ধেও কলিকাতার কথ্য বাংলার প্রয়োগ চলিয়াছে।

কথ্য ভাষায় না লিখিলে প্রবন্ধ-নিবন্ধ সহজ সরল ও প্রাঞ্জল হয় না, নিশ্চয়ই কেউ এ কথা বলিবেন না। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক ও রাজনৈতিক, ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের দার্শনিক ও ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের সামাজিক প্রবন্ধগুলি বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। এর সবগুলিই সহজ সরল লেখ্য বা সাধু বাংলায় লেখা। গল্প-উপন্যাসে গল্পকারের ভাষাকেও কথ্য বাংলা না করিলে ভাল গল্প-উপন্যাস হয় না, একথাও ঠিক নয়। রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ গল্প উপন্যাসগুলিতে গল্পকারের ভাষা লেখ্য সাধু বাংলা। এমনকি তারাশঙ্করের মতো আধুনিক ও পপুলার ঔপন্যাসিকের অনেকগুলি বই-এও এই নিয়ম মানা হইয়াছে।

তবু যে পূর্ব-বাংলার সাহিত্যিকরা ও গল্পকাররা অনাবশ্যকভাবে পশ্চিম-বাংলার কথ্য ভাষা চালাইয়াছেন, সেটা পূর্ব-বাংলার স্ট্যাণ্ডার্ডাইযড কথ্য বাংলার অভাবে নয়, অন্য কারণে।

গোলামি মনোভাব

এইখানেই প্রথম যুক্তিটি আসিয়া পড়ে। এই যুক্তিদাতারা বলেন, যাকে পশ্চিম-বাংলার বা কলিকাতার কথ্য ভাষা বলা হয়, এটা আসলে সারা বাংলার কথ্য বাংলা। উভয় বাংলার লেখকদের এটা সাধারণ কমন ভাষা। এটা পূর্ব-বাংগালী সকলেই বুঝিতে পারে। খুলনা যশোর কুষ্টিয়া ইত্যাদি জিলার লোকেরা বলিতেও পারে। সুতরাং এটাকে শুধু পশ্চিম-বাংলার ভাষা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া ঠিক হইবে না। এ ভাষা আমাদেরও। এ অবস্থায় এই ঐতিহ্যবান প্রচলিত ভাষা ত্যাগ করিয়া নতুনভাবে পূর্ব-বাংলার একটা স্ট্যাণ্ডার্ডইযড কথ্য বাংলা গড়িয়া তোলার দরকারও নাই, সম্ভবও নয়।

এই আলোচনায় উপরে আমি যে সব কথা আগেই বলিয়াছি তার মধ্যেই এই যুক্তির জবাব আছে। তার বাদেও এই যুক্তিতে যে কয়টি কথা আছে এখানে আমি তারই আলোচনা করিব।

এ কথা ঠিক যে আজ ত্রিশ বছর ধরিয়া বাংলা সাহিত্যে কলিকাতার কথ্য বাংলা চালু আছে বলিয়া এর একটা জনপ্রিয়তা আছে। এ কথা ঠিক যে রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের মত মনীষীরা এই ভাষায় লিখিয়াছেন বলিয়া এর একটা মর্যাদাবান ঐতিহ্য আছে। এ কথাও ঠিক যে পূর্ব-বাংলার অভিনেতা-অভিনেত্রীরা এ ভাষায় অভিনয়ও করিতে পারেন। এটাও মানিয়া নিলাম যে পূর্ব-বাংলার পাঠক ও শ্রোতা দর্শকরা এ ভাষা বুঝিতেও পারে।

কিন্তু এসব কি পূর্ব-বাংলার নিজস্ব কথ্য বাংলা ভাষা থাকার বিরোধী যুক্তি? আমরা পশ্চিম-বাংলার ভাষায় লিখিতে ও ঐ ভাষা বুঝিতে পারি বলিয়াই কি আমাদের নিজস্ব ভাষার আবশ্যকতা নাই। পূর্ব-বাংলার বহু লোক উর্দু লিখিতে-পড়িতে পারেন। বুঝিতেও পারেন অনেকে। তবু আমরা বাংলাকে রাষ্ট্র ভাষা করিবার দাবি

www.pathagar.com

করিয়াছিলাম কেন? কেন আমাদের ছাত্র-তরুণরা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে জান কোরবানি করিয়াছিল? তারা কি জান দিয়াছিল পশ্চিম-বাংলার বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করিবার জন্য?

মনে রাখা দরকার, পশ্চিম-বাংগালীরা তাদের মাতৃভাষাকে ভারতের রাষ্ট্রভাষা করিবার দাবিতে জানও দেয় নাই, হয়ও নাই ওটা তাদের রাষ্ট্রভাষা। আমাদের তরুণরা যে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করিবার দাবিতে জান দিয়াছিল এবং যে বাংলাকে সরকার পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করিয়াছেন, সেটা পূর্ব-বাংগালীর নিজস্ব বাংলা। যে বাংলায় সে কথা বলে ও চিন্তা করে সেই বাংলা। এটা প্রয়োজন জাতির স্বকীয়তা বিকাশের জন্য। শুধু কতিপয় লেখকের লেখার জন্য, কতিপয় অভিনেতার অভিনয়ের জন্য বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করিবার দরকার ছিল না। ইংরেজী ও উর্দুতেও অনেকে লিখিতে এবং অভিনয় করিতে পারেন এবং পারিতেছেনও। দেশবাসী তা বুঝিতেও পারে এবং পারিতেছেও।

অনুকরণের কুফল

কাজেই বিষয়টা কতিপয় লেখক-অভিনেতার ব্যক্তিগত প্রশ্ন নয়। প্রশ্নটা জাতির। গোটা-দেশের। দেশের জনগণের। গোটা জাতির কৃষ্টি ও স্বকীয়তার। মোটকথা, স্বাধীন সত্তাবিশিষ্ট আত্মমর্যাদাবান জাতি হিসাবে আমাদের বাঁচিয়া থাকার বিকাশলাভের ও উন্নতির পথে অগ্রসর হওয়ার প্রশ্ন এটা। এ প্রশ্নকে রূপ হালকাভাবে নিলে এবং প্রচলিত প্রথার গড্ডালিকায় নিজেদেরে ভাসাইয়া দিলে কি অশুভ পরিণাম হইবে, সংক্ষেপে এখানে সেদিকে আমাদের সাহিত্যিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। পশ্চিম-বাংলার কথ্য বাংলাকে আমাদের লেখক-সাহিত্যিকরা তাঁদের লেখায় চালু করিলেও উহা পূর্ব-বাংলার কথ্য বাংলা হইবে না। কারণ পূর্ব-বাংগালী পশ্চিম-বাংলার ধ্বনি মাত্রা স্বরভংগি ইন্টোনেশন রফত করিতে পারিবে না। পারা সম্ভবও নয়, তার দরকারও নাই। স্বরভংগি ও ইন্টোনেশনের ব্যাপারটা ভৌগোলিক, সুতরাং প্রাকৃতিক। এটা শৈশব মায়ের কাছে, কৈশোরে সমাজে ও স্কুলে শিক্ষা হয়। পরে হয় না।

সেই কারণেই আমাদের লেখকদের যাঁরা পশ্চিম-বাংলার কথ্য ভাষা ছাড়া আর কিছুই লেখেন না, তাঁরা নিজেরাই সে ভাষার কথা বলিতে পারেন না। চেষ্টা যা করেন সেটা হয় ক্যারিকেচার মাত্র। এইজন্য আমাদের নাট্যশিল্পী ও রেডিও শিল্পীদেরে অনেকদিন ধরিয়া ইন্টোনেশনের ট্রেনিং দিতে হয়।

এই জন্যই আমাদের রেডিওর বাংলা নিউয-বুলেটিন-পাঠক নিয়োগ করার সময় পশ্চিম-বাংলার লোক খুঁজিতে হয়। এটা স্বাভাবিক। যে ভাষা বলেন স্বরভংগি ও ইন্টোনেশনে সেই ভাষা-ভাষীকেই অনুকরণ করিতে হয়। নইলে বলাটা ন্যাচারেল হয় না।

আমাদের রেডিওর ইংরাজী নিউজ-বুলেটিন-পাঠক নিয়োগের বেলায়ও তাই। হয় খাঁটি ইংরাজ নিয়োগ করিতে হয়, নয় ত এমন পাকিস্তানী খুঁজিয়া বাহির করিতে হয় যিনি দীর্ঘদিন বিলাতে থাকার দরুন অথবা ইংরাজ প্রাইভেট টিউটর রাখিয়া রফত করার দরুন ইংরাজের ইন্টোনেশনে ইংরাজী বলিতে পারেন।

www.pathagar.com

জিভ ও কলমের ভিন্ন গতি

কিন্তু এঁরা মুষ্টিমেয়। এঁরা সমাজের সাধারণ লোক নন। ব্যতিক্রম মাত্র। এঁরা অভিনেতা মাত্র, শ্রোতা বা দর্শক এঁরা নন। অভিনয়ের ষ্টেজ হইতে নামিয়াই এঁরা স্বাভাবিক সুরে কথা বলেন। যেমন আমাদের লেখকেরা লেখেন পশ্চিম-বাংলার ভাষায়; কিন্তু কথা বলেন দেশী ভাষায়। এটাই স্বাভাবিক। এটা বৈজ্ঞানিক। প্রকৃতি ও বিজ্ঞানের বিরোধিতা করা অসম্ভব।

কিছুকাল এইভাবে চলিলে পশ্চিম-বাংলার কথ্য বাংলা আমাদের লেখ্য বাংলা হইয়া যাইবে। তাতে কালক্রমে অন্তত সাহিত্যিক-লেখকদের কাছে পূর্ব-বাংলা হইতে সাধু বাংলা উঠিয়া যাইবে। সাধু বাংলার স্থান দখল করিবে পশ্চিম-বাংলার কথ্য বাংলা।

রাষ্ট্রভাষা বাংলাকে অবিলম্বে আমাদের সরকারী ফাইল-পত্রের ভাষা শিক্ষার মাধ্যম ও আইন পরিষদের ভাষা করিবার জন্য স্বাভাবিকভাবেই গণদাবি উঠিয়াছে। শীঘ্রই তা হইবেও। এ ক্ষেত্রে সরকারী কর্মচারীরা অধ্যাপকরা ও আইন-রচয়িতারা কি করিবেন?

স্বভাবতই তাঁরা প্রেরণার জন্য লেখক-সাহিত্যিকদের দিকে চাহিবেন। এঁরাই ভাষার স্বাভাবিক অথরিটি। সুতরাং অনতিবিলম্বে রেডিও পাকিস্তানের মতোই সকল সরকারী দফতরের, আইন সভার প্রসিডিং-এর এবং স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মাধ্যমের ও পাঠ্যপুস্তকের ভাষা হইয়া উঠিবে। পশ্চিম-বাংলার কথ্য বাংলা।

সম্প্রতি আমাদের একটি বাংলা কলেজ হইয়াছে। সমস্ত শিক্ষণীয় বিষয় বাংলাতে শিখানোই এই কলেজের মহান উদ্দেশ্য। সাহিত্যিক-লেখকদের ভারের চাপে এখানকার শিক্ষাকার্যও চলিবে পশ্চিম-বাংলার কথ্য ভাষায়। তাতে দোষ কি? দোষ আর কিছুই না। কাগজে পত্রে পশ্চিম-বাংলার কথ্য বাংলাই মোটামুটি শুদ্ধভাবে লেখা হইবে। কিন্তু পড়িবার ও বলিবার সময় কেউ তা পশ্চিম-বাংগালীর ইন্টোনেশনে পড়িতে বা বলিতে পারিবে না।

গণ-বিরোধী রাষ্ট্রভাষা

ফলে সাহিত্যের, সরকারী দফতরের এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের লেখ্য ভাষা হইবে আমাদের জনগণের কথ্য ভাষা হইতে পৃথক। সাহিত্যকে গণমুখী করিবার যে উদ্দেশ্যে জনগণের ভাষাকে সাহিত্যে স্থান দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছিল, যে উদ্দেশ্যে কথ্য বাংলাকে সাধু বাংলার স্থলবর্তী করা হইয়াছিল এবং পশ্চিম-বাংলায় সাহিত্যের ভাষা ও জনগণের ভাষাকে এক করিয়া যে উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে, পূর্ব বাংলায় সেই মহান উদ্দেশ্যই ব্যাহত হইবে।

পশ্চিম-বাংলায় যেখানে সাহিত্য ও জনগণের একটি মাত্র ভাষা, সেখানে পূর্ব-বাংলায় হইবে তিনটি ভাষা : একটি সাধু লেখ্য বাংলা দ্বিতীয়টি পশ্চিম-বাংলার কথ্য আমাদের লেখ্য বাংলা, তৃতীয়টি আমাদের কথ্য বাংলা। পাঠ্য-পুস্তকেও এর ক্রিয়া হইবে।

www.pathagar.com

ভাষার এই টিনিটি বা ত্রিমূর্তি পূর্ব-বাংলার জাতীয় আত্মমর্যাদাবোধের, কৃষ্টি-সভ্যতা বিকাশের, এমনকি জাতীয় সাহিত্য সৃষ্টির পক্ষে হইবে মারাত্মক। যে ভাষায় লেখে সে ভাষায় কথা বলে না বা বলিতে পারে না এটা কোন সভ্যদেশের নাগরিকের পক্ষেই মর্যাদার কথা নয়। যে ভাষায় কথা বলে সেটা সাহিত্যে বা রাষ্ট্রীয় কাজে ব্যবহারের যোগ্য নয়, সে জন্য অন্য দেশের কথ্য ভাষার আমদানি করিতে হয়, এটাও কোন সভ্য ও কৃষ্টিবান জাতির পক্ষেই গৌরবের কথা নয়।

সর্বোপরি, পূর্ব-বাংলায় উন্নত সাহিত্য গড়িয়া উঠার পক্ষেও এটা হইবে ঘোরতর প্রতিবন্ধক। কারণ, পরের ভাষায় কখনো উন্নত সাহিত্য সৃষ্টি করা যায় না। অনুকারী বা ক্যারিকেচারিস্ট কখনো মৌলিক আর্ট সৃষ্টি করিতে পারে না। এ বিষয়ে মার্কিন চিন্তানায়ক ইমার্সন এবং বর্তমান বিশ্বের শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী বিলাতের সমারসেট মমের কথাটা বিশেষভাবে স্মরণীয়। তাঁরা উভয়েই বলিয়াছেন, পরের ভাষায় ও অনুকরণে অরিজিন্যাল আর্ট সৃষ্টি কখনো হয় না।

হইতে যে পারে না আমাদের লেখক-সাহিত্যিকরা নিজেদের জীবনেই তা টের পাইতেছেন। পনর বছরেও পূর্ব-বাংলার সাহিত্য সৃষ্টি অতি নগণ্য। সামান্য যা কিছু হইয়াছে, তাও নাকি চলে না। লেখক-প্রকাশক বিক্রেতা সবারই অভিযোগ পাঠকরা পশ্চিম-বাংলার বই-পুস্তকে ঝুঁকিয়া পড়ে, পূর্ব-বাংলার বই-পুস্তক অবিক্রীত পড়িয়া থাকে।

বই-পুস্তক সম্বন্ধে যা, সিনেমা সম্বন্ধেও তাই সত্য। বাংলা বই চলে না বলিয়া প্রয়োজকরা উর্দু বই প্রয়োজনায় মন দিয়াছেন। সিনেমা ম্যাগাজিনে দৈনিক কাগজের সিনেমা পেজে লেখক-সমালোচক ও অভিনেতারা এজন্য প্রযোজকদেরে দোষে দিতেছেন।

কিন্তু দোষ প্রয়োজকদের নয়, পাঠক-শ্রোতাদেরও নয়। দোষ লেখক-সাহিত্যিকদের। তাঁরা যে ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টি করিতেছেন, মিস স্টেইনের কথায় সে ভাষা পূর্ব-বাংলার মাঠে-বন্দরে খেলিয়া বেড়ায় না। সে ভাষায় চিত্রিত পাত্র-পাত্রীর সাথে দর্শক-পাঠকের কোনও আত্মীয়তা নাই।

তাদের কাছে কলিকাতায় রচিত বই-সিনেমাও বিদেশী, ঢাকায় রচিত বই-সিনেমাও বিদেশী। বেশ-কম শুধু এই যে, একটা আসল অপরটা নকল। নকল ফেলিয়া লোকে আসলটা ধরিবে, এতে আশ্চর্য হইবার কি আছে?

দুইটা প্রতিদ্বন্দ্বী

কৃষ্টি ও সাহিত্যের ব্যাপারে পূর্ব-বাংলার ভাষার প্রতিদ্বন্দ্বী দুইটি। একটি উর্দু, অপরটি কলিকাতার বাংলা। দুইটাই অসামান্য শক্তিশালী। উর্দুর পিছনে রাষ্ট্রশক্তি হালী-ইকবালের কলম ও ধর্মের আবেদন আছে। আর কলিকাতার বাংলার পিছনে আছে রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র নজরুল ইসলামের কলম ও র‍্যাশিয়াল আবেদন।

এই দুইটার একটার সাথেও আমরা লড়াই করিতে চাই না। আমরা চাই শুধু আমাদের স্বকীয়তা। এখানে ইমারসনের মহাবাক্য আমাদের কাজে লাগিবে। তিনি বলিয়াছেন : ইংলণ্ডের ইংরাজীর সাথে আমাদের শত্রুতা নাই। আমাদের বিলাতী

www.pathagar.com

মুরুব্বিদের প্রতি, আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি আমরা অশ্রদ্ধা দেখাইতেছি না। আমরা শুধু চাই আমাদের স্বকীয়তা। আমরা শুধু বাঁচিতে চাই।

আমরা যদি নিজস্ব কৃষ্টি ও সাহিত্য সৃষ্টি না করি, তবে বাংলা ভাষার জন্য আমাদের ছাত্র-তরুণদের আত্মদান ব্যর্থ হইবে। নিজস্ব সাহিত্যের অভাবে আমাদের জাতীয় ও কৃষ্টি-জীবনে ভ্যাকুয়াম আসিবে। ভ্যাকুয়াম সৃষ্টি করিতে হয় না। ওটা আপনা-আপনি ঘটে। কিছু না করিলেই শূন্যতা হয়। অন্যান্য বস্তুর মতোই মানব মনও ভ্যাকুয়াম সহ্য করে না। কাজেই নিজস্ব না থাকিলে পরস্বই সে ভ্যাকুয়াম পূর্ণ করে। নিজস্ব সাহিত্যের অভাবে পূর্ব-বাংলা হইয়া উঠিবে উর্দু ও কলিকাতার বাংলার যুদ্ধ-ক্ষেত্র। পূর্ব-বাংলার জাতীয় ও কৃষ্টি-জীবনের বিকাশের পথে সেটা হইবে ভয়ানক প্রতিবন্ধক। তাতে আমাদের কৃষ্টিক মুক্তির দিন পিছাইয়া যাইবে।

আমাদের চিন্তাবিদ সাহিত্যিকরা যথাসময়ে হুশিয়ার হইলে এ বিপদ আমরা কাটাইতে পারিব। উপরোক্ত দুইটা প্রবল প্রতিবন্ধক আমাদের সাংস্কৃতিক আযাদি ঠেকাইয়া রাখিতে পারিবে না। পাকিস্তান সংগ্রামেও এমনি দুইটা প্রবল প্রতিবন্ধক আমাদের সামনে ছিল : একদিকে ছিল বিপুল শক্তিশালী বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী, অপরদিকে ছিল অসামান্য প্রভাবশালী হিন্দু ফিউডাল অলিগার্কি। জনগণ ও সুধী সমাজের সংকল্পের সামনে অমন 'বাধার বিন্ধ্যাচল'ও উড়িয়া গিয়াছিল।

আমাদের কর্তব্য

কি করিতে হইবে আমাদের তবে? কর্তব্য আমাদের অতি সুস্পষ্ট। আমাদের লেখক-সাহিত্যিকরা পূর্ব-বাংলার স্ট্যাণ্ডার্ডাইয্ড কথ্য ভাষাকে তাঁদের সাহিত্যে স্থান দিবেন। কথ্য ভাষা মানে কোনও জিলা বা অঞ্চলের অবিকল ডায়লেক্ট নয়। যে সফিস্‌টিকেটেড বাংলায় আমাদের রাজধানী ও অন্যান্য শহর -নগরের সুধীসমাজ কথা বলেন, যে ভাষায় বক্তৃতা করিয়া আমাদের বিগত ও বর্তমান রাজনৈতিক নেতারা যুগে যুগে বিভিন্ন আন্দোলন করিয়া আসিয়াছেন, যে ভাষায় আমাদের আলেম-সমাজ যুগ যুগ ধরিয়া ওয়ায-নসিহত খোতবা পাঠ ও ধর্ম প্রচার করিয়া আসিতেছেন, যে ভাষায় পল্লী অঞ্চলের হিন্দু-মুসলমান শিক্ষক-অধ্যাপক ও জমিদার-তালুকদারেরা শতাব্দী কাল ধরিয়া কথা বলিয়া আসিয়াছেন, সেইটাই পূর্ব-বাংলার স্টাণ্ডার্ডাইয্ড কথ্য বাংলা ভাষা।

এটা অভদ্র অশালীন ও ভালগার ভাষা নয়। এ ভাষাকে অভদ্র ভাষা বলিলে আমাদের যুগ-যুগের জননেতা আলেম পণ্ডিত জমিদার-তালুকদার জজ-হাকিম উকিল মোখতার সবাইকে অভদ্র বলিতে হয়। আমাদের লেখক-সাহিত্যিকরা নিশ্চয়ই তা বলেন না। তাঁদের মুখের ভাষাকে সাহিত্যে স্থান না দেওয়ার অর্থ কিন্তু তাই।

আমাদের নিজস্ব সুধী সমাজের সাথে আজ যোগ দিয়াছেন বহিরাগত দুইটি সুধী সমাজ। একদিকে পশ্চিম-বাংলার পঞ্চাশ লাখ মুসলমান পূর্ব-বাংলায় আসিয়াছেন। তাঁদের অধিকাংশই শিক্ষিত। আমাদের রাষ্ট্রেও সমাজে তাঁরা প্রভাবশালী পদে ও মর্যাদায় অধিষ্ঠিত। এঁদের মুখের ভাষা পশ্চিম-বাংলার কথ্য বাংলা। অপরদিকে বিহার যুক্ত প্রদেশ হইতে বহু মুসলমান আসিয়াছেন। পূর্ব-বাংলাকে এঁরা স্থায়ী বাসভূমিরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। এঁদের মুখের ভাষা উর্দু।

www.pathagar.com

কাজেই আমাদের স্ট্যাণ্ডার্ডাইযড কথ্য বাংলা হইবে এই তিনের ভাষার একটা খিচুড়ি। হউক, তাতে দোষ নাই। ভাষা মাত্রই খিচুড়ি। কথ্য ভাষা ত বটেই। এটাই হইবে আমাদের রাজধানীর ঢাকাইয়া বাংলা। কলিকাতাইয়া বাংলার স্থানে এটাই হইবে আমাদের গল্প-উপন্যাস ও স্টেজ-সিনেমার ডায়লগের ভাষা।

এই ঢাকাইয়া কথ্য বাংলা সাহিত্যে দানা বাঁধিবার আগে পর্যন্ত, এমনকি পরেও, একটা সাধারণ নিয়ম আমাদের সাহিত্যিকদের মানিয়া চলিতে হইবে। সেটা এই :

ক. প্রবন্ধে-নিবন্ধে তাঁরা সর্বদাই সহজ সাধু বা লেখ্য ভাষা ব্যবহার করিবেন। লেখকেরা মনে রাখিবেন, সাধু ভাষা মানে কঠিন ভাষা নয়। শুধু ক্রিয়াপদটা কথ্য করিলেই ভাষাটা সহজ হয় না। ঠিক তেমনি, শুধু ক্রিয়াপদটা কথ্য না করিলেই ভাষা কঠিন হয় না।

খ. গল্পকার ও ঔপন্যাসিকরা তাঁদের গল্প-উপন্যাসে গল্পকারের ভাষা সাধু রাখিবেন। শুধু পাত্র-পাত্রীর ভাষা কথ্য করিবেন। পাত্র-পাত্রীর শ্রেণীভেদে কথ্য বাংলার রূপও ভিন্ন হইতে পারে। গল্পের চরিত্রের মধ্যে যাঁরা পশ্চিম-বাংলার মোহাজের তাঁদের মুখে পশ্চিম-বাংলার কথ্য বাংলা এবং যাঁরা যুক্তপ্রদেশ-বিহারের মোহাজের তাঁদের মুখে সহজ উর্দু দিলে গল্প-নাটক স্বাভাবিকও হইবে, শ্রোতা-দর্শক-পাঠকদের বুঝিবারও সুবিধা হইবে।

বাংলা একাডেমীর এ ব্যাপারে অনেকে করণীয় আছে। বাংলা উন্নয়ন বোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগেরও দায়িত্ব কম নয়। এঁরা সকলে একত্রে বা পৃথক-পৃথক সেমিনারের আয়োজন করিলে এ বিষয়ে শীঘ্র পথের সন্ধান পাওয়া যাইবে। সেই পথ তাঁদের বাহির করিতেই হইবে। এ দায়িত্ব মূলত তাঁদেরই।

২৪শে মাঘ। ১৩৬৯ সন।

www.pathagar.com

ভাষা আন্দোলনের মর্মকথা

কেন মাতৃভাষা?

একইশা ফেব্রুয়ারির ঘটনাকে শুধুমাত্র ভাষা আন্দোলন বলিলে ভুল হইবে। ব্যাপারটাকে ছোট করা হইবে। তাতে এর স্থূল রূপটাই শুধু দেখা হইবে। অন্তর্নিহিত বাণীটা উপেক্ষিত হইবে।

পরের ভাষার বদলে নিজের মাতৃভাষাকে রাষ্ট্রের ভাষা করার দাবিতেই শহীদরা প্রাণ দিয়াছে, এটা এর প্রত্যক্ষ ও বাহিরের দিক মাত্র। এর অমর মর্মবাণী শাশ্বত সত্য ও চিরঞ্জীব গসপেল আসলে জাতীয় স্বকীয়তার বাণী।

স্বাধীন দেশ পাইলেই মানুষ আজাদ হয় না। স্বকীয়তা হাসিলের দ্বারা আজাদ হইতে হয়। উনিশ শতকের মাঝামাঝি অস্ট্রীয় সাম্রাজ্যবাদীর কবল হইতে মুক্ত স্বাধীন ও সম্মিলিত ইটালি স্থাপন করিয়া গ্যারিবলডি বলিয়াছিলেন : 'আমরা ইটালি সৃষ্টি করিয়াছি, এখন আমাদের কাজ ইটালিয়ান সৃষ্টি করা।'

ঠিক একশ' বছর পরে বিশ শতকের মাঝামাঝি ঢাকার ছাত্র তরুণরা গ্যারিবলডির ভাষায় বলিয়াছে : 'পাঁচ বছর আগে আমরা পাকিস্তান বানাইয়াছি, আজ আমরা পাকিস্তানী বানাইতেছি।' এটা ছিল নূতন জাতির নয়া জিন্দেগির চিরন্তন ফুকার। গুলির আওয়াজে সে অভ্রভেদী ফুকার স্তব্ধ করিতে চাহিয়াছিল যারা তারা মূর্খ।

মাতৃ-ভাষার দাবি এই স্বকীয়তার গোড়ার কথা। ভাষার ইংরাজী টাং, ফারসী জবান, আরবী লিসান, জার্মানী যুংগে, ল্যাটিন ডিংগুয়া সবেরই অর্থ জিভ। মানুষের ভাব প্রকাশের মিডিয়াম জিভ ছাড়াইয়া কবে কলম তুলি টাইপ মেশিনে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, তবু ভাষার নাম আজও জিভ রহিয়া গিয়াছে। মায়ের মুখ হইতে কথা বলা শিখিবার পর মানুষ কত পণ্ডিতের কাছে পণ্ডিতি ভাষা শিখিয়াছে। তবু সে ভাষার নাম রহিয়া গিয়াছে মাতৃভাষা।

মনে রাখিবেন মাতৃভাষা, পিতৃভাষা নয়। কারণ এটা বিবরণ নয় প্রতীক, এটা ডিসক্রিপশন নয় সিম্বল। এটা নাড়ির যোগের কথা, বাহিরের সম্পর্কের কথা নয়। মানুষের নাড়ির যোগ মায়ের সাথে, বাপের সাথে নয়। মা এখানে জাতির মা, ব্যক্তির মা নয়। মাতৃভাষা এখানে জাতির মাতৃভাষা, ব্যক্তির মাতৃভাষা নয়। ব্যক্তির জীবনে মাতৃভাষার গুরুত্ব তেমন বেশি নয়। ব্যক্তি মায়ের ভাষা ভুলিতে পারে, পরের ভাষায় পণ্ডিত হইতে পারে। কিন্তু জাতি তা পারে না।

www.pathagar.com

জাতির ব্যক্তিত্ব

কিন্তু জাতিরও একটা ব্যক্তিত্ব একটা পার্সনালিটি আছে। মুখের কথা যেমন ইনডিভিজুয়েল পার্সনালিটির সবটুকু নয়, মাতৃভাষাও তেমনি ন্যাশনাল পার্সনালিটির সবটুকু নয়। মাতৃভাষার প্রভাব পরিধি ও তাৎপর্য ব্যক্তির জীবনের মতোই জাতির জীবনেও সবচেয়ে বেশি। তবু কিন্তু ভাষার মধ্যেই জাতির ব্যক্তিত্ব সীমিত নয়। শিক্ষা-সভ্যতা ধর্ম-নীতি শিল্প-সাহিত্য খোরাক-পোশাক প্রথা-সংস্কার এ সবের মধ্যে সে ব্যক্তি পরিব্যাপ্ত।

এক কথায় ব্যক্তির যা পার্সনালিটি জাতির তাই কালচার। কালচারই জাতির ব্যক্তিত্ব। এই ব্যক্তিত্ব তার স্বকীয়তা। এই স্বকীয়তারই মূল সূত্র, ফার্স্ট প্রিন্সিপল, মাতৃভাষা। অতএব পূর্ব-বাংগালী স্বাধীন রাষ্ট্রের মালিক হইয়া যেদিন মাতৃভাষাকে রাষ্ট্রের ভাষা করিবার দাবি তুলিয়াছিল, যে দাবির স্পিয়ারহেড রূপে ছাত্র-তরুণসমাজ জান কোরবানি করিতে আগাইয়া আসিয়াছিল, সেটা মুখ্যত আমাদের নিজস্ব ভাষার দাবি ছিল বটে, কিন্তু মূলত ইহা ছিল আমাদের জাতীয় স্বকীয়তার দাবি। দৃশ্যত সে দাবি ছিল : আমাদের রাষ্ট্রের সকল কাজ পরিচালিত হইবে আমাদেরই মাতৃভাষায়। তার মানে কি?

রাষ্ট্রীয় সত্তা আজ দুনিয়ার সর্বত্রই জাতীয় সত্তার পনর আনা। আমাদেরও তাই। কাজেই ও দাবির অর্থ এও ছিল যে, আমাদের শিক্ষা সংস্কৃতি শিল্প-বাণিজ্য প্রচার-প্রপাগ্যাণ্ডা যান-বাহন আর্ট-সাহিত্য আমোদ-প্রমোদ সবই চলিবে আমাদের মাতৃভাষায়। ও দাবির মানে অতএব এও ছিল যে, খোরাকে-পোশাকে চালে-চলনে খেলাধূলায় আচার-আচরণে আমরা পুরাপুরি 'আমরা' হইব।

আমরা কে?

এই আমরা মানে সমাজের উপর-তলার কতিপয় নয়। এ আমরা গোটা জাতি। এই গোটা জাতির জনগণ একদিকে রাষ্ট্রীয় হক-হকুক ভিক্ষা চাহিতে যেমন রাষ্ট্রের প্রাসাদের দুয়ারে আসিবে না স্বয়ং রাষ্ট্রই যেমন যাইবে জনগণের কুটির দুয়ারে, তেমনি সে জনগণ 'জ্ঞানের তালাসে সুদূর চীন দেশ' ত নয়ই জ্ঞানীর বিদ্যায়তনেও যাইবে না। স্বয়ং জ্ঞানীরাই জ্ঞানের খাঞ্চা মাথায় করিয়া যাইবেন জনগণের আংগিনায়।

এমনি করিয়া রাষ্ট্র বিদেশী ধুপদুরুস্ত পোশাক ও শরাফতির ঢং ছাড়িয়া শাসকের উচ্চ আসন হইতে পথের ধূলায় জনগণের মধ্যে নামিয়া আসিবে। জনগণের ভাষায় তাদের সাথে কথা বলিবে। এমনিভাবে আমাদের রাষ্ট্রকে এবং সেই সংগে তার সর্বংগীন সত্তাকে পূর্ব-পাকিস্তানী হইতে হইবে।

দেশ-প্রেমের অর্থ

একবার কল্পনা করুন আমাদের সর্বাংগীন জাতীয় সত্তার এই পূর্ব-পাকিস্তানী রূপ! এর কোন্ রূপে আমরা কুৎসিত? কোন্ গুণে আমরা হীন? কোন্ সম্পদে আমরা দরিদ্র? বীরত্ব-মহত্ত্ব সভ্যতা-সংস্কৃতি ভাষা-সাহিত্য ইতিহাস-ঐতিহ্য শিল্প-বাণিজ্য কোন্টায় আমরা গৌরবান্বিত ছিলাম না? দুইশ' বছরের গোলামি জীবনের উপেক্ষা-অবহেলায় তার সবগুলিই আবর্জনায় চাপা পড়িয়াছে সত্য। কোন-কোনটায়

মরিচা ধরিয়াছে তাও ঠিক। কিন্তু আজিকার আযাদির প্রখর আলোকে স্বকীয়তার উদ্দীপনার আগুনে আত্মবিকাশের অনুপ্রেরণার উদ্দীপ্ত জ্যোতিতে সেসব আবর্জনাস্তূপ কি জ্বলিয়া-পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইবে না? সাধনার অগ্নিশিখায় সে মরিচা পুড়িয়া খাঁটিত্বের ঔজ্জ্বল্যে আমাদের সত্তা ঝলমল করিয়া উঠিবে না কি? আধুনিকতার স্পর্শে সে সত্তা কি হইয়া উঠিবে না দীপ্যমান? নিশ্চয়ই হইবে, আলবৎ হইবে। চাই শুধু আত্ম-মর্যাদাবোধ ও আত্মবিশ্বাসের অন্তরভেদী রঞ্জন রশ্মি।

এটা পাইতে হইলে আমাদের সুধী সমাজকে মনে-প্রাণে পূর্ব পাকিস্তানী হইতে হইবে। পূর্ব-বাংলার নদী-নালা চান-সুরুজ আসমান-জমিন ও তরুলতার রূপে মাতোয়ারা হইতে হইবে। পূর্ব বাংলার চাষীর সুরে নদীর ডাকে পাখীর গানে মোহিত হইতে হইবে। পূর্ব-বাংলার ভাষায় কথা বলিতে হইবে। চিন্তা করিতে হইবে। জ্ঞান আহরণ ও বিতরণ করিতে হইবে। সাহিত্য ও সংগীত রচনা ও সাধনা করিতে হইবে। তবে না আমি পূর্ব-বাংগালী হইব? তবে না আমি মায়ের ধন্য সন্তান হইব? তবে না মা আমার মহীয়সী-গরীয়সী মা হইবে? আমার মা কুরূপা কাংগালিনী? আমার মায়ের ভাষা অসভ্য অশালীন? তাই বলিয়া পরে রূপসী সুবাসিনী মাকে মা বলিব? তাই বলিয়া আমার অশালীন মাতৃভাষা ছাড়িয়া অপরের শালীন ভাষাকে নিজের মায়ের ভাষা বলিয়া চালাইব?

এমন আত্মবঞ্চনার জন্য আমাদের ছাত্র-তরুণরা জীবন-কোরবানি দেয় নাই। আমরা যদি মূর্খ হই, তবে নিজেরাই আমরা জ্ঞানী হইবার চেষ্টা করিব। পরের জ্ঞান ধার করিয়া জ্ঞানীর অভিনয় করিব না। দেশ যদি আমাদের শিল্প-বাণিজ্যে অনুন্নত হয় তবে তাকেই নিজ হাতে শিল্পায়িত করিব। তাকে পরের শিল্পের বাজার করিয়া রাখিব না।

ঠিক তেমনি আমার মাতৃভাষা যদি রাষ্ট্র ও সাহিত্যের অনুপযোগী অশালীন ভাষা হয়, তবে তাকেই রাষ্ট্র ও সাহিত্যের উপযোগী করিব। কারণ ওটা যে আমারই মায়ের ভাষা। আমরা নিজেরা সভ্যতার দাবি করিব, অথচ নিজের মায়ের ভাষাকে অসভ্য ভাষা বলিয়া পরিহার করিব, এমন হইতে পারে না।

আমাদের গায়ের পোশাক যদি যুগোপযোগী সুন্দর না হয় তবে কাটিয়া-ছাটিয়া তাকেই সময়োপযোগী রুচিসম্মত সুন্দর করিয়া লইব। পরের পোশাক পরিয়া বাবু সভ্য হইবার ফাঁকা বাহাদুরি করিব না।

আমাদের সামাজিক রীতিনীতিতে আচার-অনুষ্ঠানে আমোদ-প্রমোদে যদি কোন ত্রুটি থাকে, তবে তার সংস্কার-সংশোধন করিয়া আধুনিক রুচিমাফিক করিয়া লইব। তবু পরের আচার অনুষ্ঠানের অন্ধ অনুকরণ করিব না। সবকেই নিজের করিয়া লইব। নিজেকে পরের করিব না। এটা জিদের ব্যাপার নয়। পরহিংসার কথাও নয়। সংস্কার-বিরোধী স্থবিরতাও নয়। এটা স্বকীয়তার কথা। আত্মমর্যাদা-জ্ঞান ও জাতীয়তাবোধের কথা। নিজেকে চিনিবার কথা। নিজেকে পুনরুদ্ধার ও পুনর্জীবিত করার কথা।

আমাদের ব্যর্থতা

আমরা একইশা ফেব্রুয়ারির শহীদানের আত্মত্যাগের ও মাতৃভাষাকে রাষ্ট্র ভাষা করিবার দাবির অন্তর্নিহিত বাণীর তাৎপর্য বুঝিতে ব্যর্থ হইয়াছি। এটা বুঝিতে হইলে

www.pathagar.com

মনে রাখিতে হইবে আন্তর্জাতিকতা ও জাতীয়তার বৈশিষ্ট্যের ভিতরকার পার্থক্যের সূক্ষ্মতার কথা। জাতিতে-জাতিতে ও মানুষে-মানুষে অনৈক্যের চেয়ে ঐক্য, পার্থক্যের চেয়ে সাদৃশ্য, ভিন্নতার চেয়ে সামঞ্জস্য হাজার গুণ বেশি। তবু ঐ সামান্য অনৈক্য ও বিভিন্নতাই জাতি এবং ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য। ঐ বৈশিষ্ট্য লইয়াই তারা গৌরব করে। কারণ ঐটুকুই তাদের পরিচয়। এই স্বকীয়তা এই স্বাজাতিকতা এবং এই বৈশিষ্ট্যের পূর্ণ বিকাশের জন্য চাই অবাধ সুযোগ ও অধিকার। এই অবাধ সুযোগের জন্যই দরকার রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক স্বাধীনতা। এই দরকার পূরণের উদ্দেশ্যেই হাসিল করা হইয়াছে পাকিস্তান। পাকিস্তান হাসিলের পুরা পাঁচ বছর পরে পূর্ব-বাংলাকে মাতৃভাষার জন্য সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল ঠিক এই কারণেই।

যে স্বকীয়তা লাভ ও বিকাশই ছিল পাকিস্তান সংগ্রামের মূল কথা, পাকিস্তান হাসিলের পাঁচ বছর পরে দেখা গেল পাকিস্তানের মেজরিটি পূর্ব-বাংগালীরাই সে স্বকীয়তা হইতে বঞ্চিত হইতে যাইতেছে। তাদের মুখের ভাষার বদলে পরের ভাষা উর্দুকে তাদের মুখে চাপাইয়া দেওয়া হইতেছে। নিতান্ত আত্মরক্ষার তাগিদে পূর্ব-বাংলার সুধী সমাজ ও জনগণ এই হামলার বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইল। পূর্ব-বাংলার তরুণ ইন্টেলিজেনশিয়া ও ভবিষ্যৎ নাগরিক ছাত্র-তরুণরা এই সংগ্রামের নেতৃত্ব গ্রহণ করিল। পুলিশের গুলিতে "শির্ দিল তবু তারা নাহি দিল আমামা।"

সে আত্মত্যাগ ব্যর্থ হইল না। সংগ্রাম সফল হইল। বাংলা পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্র ভাষা হইল। পূর্ব-পাকিস্তানীর মাতৃভাষা স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হইল।

কিন্তু কথাটা আংশিক মাত্র সত্য। বাংলা ভাষা শাসনতন্ত্রে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে এইটুকুই মাত্র সত্য। এটা কাগজী সত্য, বাস্তব সত্য নয়। আমাদের জীবনে এটা সত্য করিতে হইলে প্রথমত বাংলাকে আমাদের সামগ্রিক জীবনের ভাষা করিতে হইবে। দ্বিতীয়ত সে বাংলা হইবে পূর্ব-বাংগালীর নিজস্ব বাংলা। বাংলা পাকিস্তানের রাষ্ট্র-ভাষা হওয়ায় এই দুইটার একটাও সফল হয় নাই। সফল করিবার পথ উন্মুক্ত হইয়াছে মাত্র।

ভাষা সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে পূর্ব-বাংলার স্বকীয়তা ও নিজস্বতা কি তা বুঝিতে হইলে আমাদিগকে ইতিহাসের পাতা উল্টাইতে হইবে। তা যদি করি তবে আমরা দেখিতে পাইব যে, আমাদের একটা ইতিহাস আছে তা গৌরবময়, আমাদের একটা ঐতিহ্য তা সম্পদে-সম্ভারে ভরা।

মুসলিম আমলের প্রাক্কালে বাংলা

খৃষ্টীয় সনের তের শতকের আগেতক বাংলাদেশ বংগ পুণ্ড্র ও বংগাল এই তিনটি জনপদে বিভক্ত ছিল। পরে এই তিনটি জনপদে মোটামুটি পশ্চিম বংগ, উত্তর বংগ ও পূর্ব বংগ নামে পরিচিত হয়। এই তিনটি জনপদ আবার ভাষা ও সাহিত্যের দিক হইতে মাত্র দুইটি সাংস্কৃতিক অঞ্চলে বিভক্ত ছিল। আজিকার পূর্ব-বাংলা, মানে তৎকালীন পুণ্ড্র-বংগাল, ছিল বংগ এলাকা। আজিকার পশ্চিম বাংলা, মানে তৎকালীন বংগ, ছিল অবংগ বা অংগ এলাকা।

গুপ্ত ও পাল সম্রাটদের উত্তর ভারতীয় সাম্রাজ্যের অংগ হিসাবে পশ্চিম বংগ ছিল বিশুদ্ধ সংস্কৃতের আওতাভুক্ত। বৌদ্ধ-হিন্দু-নির্বিশেষে ও দেশের উচ্চশ্রেণীর সকলে লেখাপড়া করিতেন রাজকার্য চালাইতেন বিশুদ্ধ সংস্কৃতে। পাটলিপুত্র বরাবর গুপ্তদের

www.pathagar.com

এবং কান্যকুব্জ কিছুদিন পালদের রাজধানী ছিল। এই দুটি মহানগরী ছিল তৎকালে সংস্কৃত সাহিত্যের পীঠস্থান।

পক্ষান্তরে পাল রাজাদের রাজধানী গৌড়ও পুণ্ড্র-বংগাল দেশের ভাষা ছিল বৌদ্ধ-সংস্কৃত। বৌদ্ধ-সংস্কৃত ছিল মাগধ-প্রাকৃত দেশজ ভাষাসমূহের সংমিশ্রণে একটা চলতি ভাষা। বৌদ্ধ-ধর্মীয় নেতারা এই চলতি ভাষাকেই সাহিত্যিক মর্যাদা দান করেন। বৌদ্ধ পণ্ডিতেরা তাঁদের শাস্ত্রীয় গ্রন্থাদির বেশির ভাগই এই ভাষাতেই লেখেন। জনগণের সাথে যোগাযোগ রক্ষার খাতিরে এটা ছিল অপরিহার্য। বর্ণাশ্রম-বিরোধী সাম্যবাদী ধর্ম হিসাবে বৌদ্ধধর্ম স্বভাবতই ছিল জনগণের ধর্ম। কাজেই তার ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির পুঁথি-পুস্তকও রচিত হইত ঐ ভাষাতেই। ইতিহাসের পাঠকমাত্রই জানেন যে, তৎকালীন ভারতের সর্বপ্রধান বিহারগুলির অধিকাংশ ছিল পুণ্ড্র-বংগাল অর্থাৎ বর্তমান পূর্ব-পাকিস্তানে। ঢাকা জিলার বিক্রমপুরী বিহার ও রামপালী বিহার, রাজশাহী জিলার সোমপুরী বিহার, বগুড়া জিলার মহাস্থান বিহার, কুমিল্লা জিলার ময়নামতী বিহার ও চট্টগ্রাম জিলার পণ্ডিত বিহার ছিল সারা ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ মহাবিদ্যালয়গুলির অন্যতম। বাংলার বাহিরের মাত্র নালন্দা ও তক্ষশীলা মহাবিদ্যালয়কেই এদের সমমর্যাদায় গণ্য করা হইত।

এইভাবে গোটা বাংলাদেশ তৎকালে দুইটা স্বতন্ত্র ভাষিক ও সাংস্কৃতিক অঞ্চলে বিভক্ত ছিল। গুপ্ত পাল বংশের সম্রাটদের পৃষ্ঠপোষকতায় বিশুদ্ধ সংস্কৃত উত্তর-ভারতসহ রাঢ়-উৎকল অঞ্চলের উন্নত রাষ্ট্রভাষা ও সাহিত্যের ভাষারূপে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। পক্ষান্তরে গৌড়রাজ শশাংক গোপাল ও তাঁদের পরবর্তী রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় ও বৌদ্ধধর্মের খাতিরে পাটলিপুত্রের বৌদ্ধ সম্রাটদের পরোক্ষ অনুমোদনক্রমে পুণ্ড্র-বংগালে বৌদ্ধ-সংস্কৃত ভাষা সমৃদ্ধি লাভ করে। পরে সেন বংশের অভ্যুত্থানে হিন্দু ধর্মের পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা চলে। তাতে বাংলায় বৌদ্ধ ধর্মের পতন ঘটে। বৌদ্ধ সংস্কৃত ভাষাও বিপদের সম্মুখীন হয়।

এই সময়ে বাংলায় মুসলিম রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রায় ছয়শ' বছর বাংলায় মুসলিম শাসন কায়েম থাকে। এই ছয়শ' বছরের মধ্যে প্রায় পৌনে তিনশ' বছর বাংলা পাঠান সুলতানদের নেতৃত্বে স্বাধীন বাংলা এবং তিনশ' বছর দিল্লীর মুঘল-সাম্রাজ্যের অধীনে প্রায়-স্বায়ত্তশাসিত সুবে-বাংলা রূপে প্রতিষ্ঠিত থাকে। যে রাষ্ট্রীয় অবস্থায়ই থাকুক, গৌড় পাণ্ডুয়া লক্ষণাবতী সোনারগাঁও ঢাকা জংগলবাড়ী বা মুর্শিদাবাদ যেখানেই বাংলার রাজধানী থাকুক, সর্বঅবস্থায় সর্বস্থানে গৌড়-বাংলার রাষ্ট্রনেতারা বৌদ্ধ আমলের প্রচলিত বৌদ্ধ সংস্কৃত ভাষা ও তার পরিবর্তিত রূপের স্থানীয় ভাষারই পৃষ্ঠপোষকতা করিতেছিলেন।

এই ভাষার পরিবর্তিত ও সংশোধিত রূপই চর্য্যাপদের ভাষা। এই ভাষাই বাংলা ভাষা বা পূর্ব-বাংলার বাংলা। এই ভাষাই ছিল তৎকালের সাহিত্যের বাংলা। পক্ষান্তরে পশ্চিম-বংগ তখন বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষার আওতাভুক্ত থাকায় বাংলাভাষা বিকাশের কোনও কারণ ও সম্ভাবনাই ছিল না। বৌদ্ধ-প্রভাবের অবসানে সেন বংশের রাজাদের উদ্যোগে উত্তর-পূর্ব বংগ হইতে বৌদ্ধ সংস্কৃত ভাষার উৎখাত করিয়া সে স্থলে বিশুদ্ধ সংস্কৃত চালাইবার চেষ্টা চলিয়াছিল সত্য, কিন্তু গৌড়ের মুসলিম শাসকরা গোড়াতেই সে চেষ্টায় প্রবল ও সক্রিয় বাধা দিয়াছিলেন। নিজেদের শাসনব্যবস্থাকে জনগণের কাছে

www.pathagar.com

পরিচিত ও প্রিয় করার জন্য এবং জনগণের সহিত যোগাযোগ রক্ষার উপায় স্বরূপে মুসলিম সুলতানরা স্বভাবতই প্রচলিত ভাষাকেই সমর্থন দিতেন। তারপর বিশেষ করিয়া নাসিরুদ্দিন বগড়া শাহ হোসেন শাহ তাঁর পুত্র নসরত শাহ তাঁর সেনাপতি পরাগল খাঁ ও ছুটি খাঁ এবং তাঁদের বংশধরগণের আমলে ও পরবর্তীকালে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য অভূতপূর্ব সমৃদ্ধি লাভ করে।

মুসলিম নরপতিদের দেখাদেখি ও তাঁদের উৎসাহে তাঁদের অনুগত হিন্দু রাজা-মহারাজারাও বাংলাভাষা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। এ ব্যাপারে যশোর নাটোর সুশুং ত্রিপুরা চট্টগ্রাম ও আরাকানের রাজাদের ভূমিকা ইতিহাস-বিখ্যাত। এদের রাজ-দরবারের আরবী ফারসী ভাষার পণ্ডিতদের সংগে সংগে বাংলা ভাষার কবি সাহিত্যিকদেরও সমাবেশ হইত। চণ্ডিদাস কৃত্তিবাস কাশীরাম মালাধর বসু ও ভারচন্দ্রের মত বাংলা সাহিত্যের দিকপালদের অভ্যুদয় হয় বাংলার মুসলিম শাসকদের আমলেই।

বাংলা সাহিত্যের আদি যুগ

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উত্থান-উন্নতির স্তর বিভাগ বা ইতিহাস রচনা আমার উদ্দেশ্য নয়। এ সম্পর্কে পশ্চিম ও পূর্ব বাংলার প্রতিভাবান সাহিত্য-ঐতিহাসিকদের কথার বাহিরে আমার নতুন কিছুই বলার নাই। প্রাচীন মধ্য ও আধুনিক নামে তাঁরা বাংলা সাহিত্যের যে তিনটা স্তর বিভাগ করিয়াছে একটু সংশোধিত আকারে আমি তাই মানিয়া লইতেছি। তাঁরা যেটাকে বলেন মধ্য যুগ, আমি তাকেই বলি আদি যুগ। আমার প্রতিপাদ্য এই যে সাহিত্যিক বাংলা ভাষার জন্মদান গৌড়কেন্দ্রিক পূর্ব-বাংলা। বৌদ্ধ যুগের মাগধ-প্রাকৃত-দেশজ মিশ্রিত বৌদ্ধ সংস্কৃতই বাংলা ভাষার জননী। গৌড়রাজ মুসলিম সুলতানরা আরাকানের রাজারা এবং তাঁদের অনুগত হিন্দু রাজা মহারাজারাই সে সন্তানদের পালক পিতা।

এই পালন ও পৃষ্ঠপোষকতা চলে একটানা তিনশ' বছরেরও বেশি। এই যুগের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের রূপ ও আংগিকে মুসলিম-প্রভাবিত একটা পূর্ব-বাংগালিত্ব ছিল। পূর্ব-বাংলার হিন্দু কৃষ্টির মধ্যেও এই যুগে একটা বৌদ্ধ উদারতা ইসলামী সাম্য ও বারেন্দ্র আভিজাত্য ছিল। এই যুগের বাংলা-সাহিত্যে ছিল তা প্রকট।

পক্ষান্তরে বর্তমানের পশ্চিম বাংলায় এই যুগে কোন বাংলা ভাষাই ছিল না, সাহিত্য ত দূরের কথা। আসলে ঐ যুগের পশ্চিম বংগবাসী জাতিতে বাংগালী ছিল না। বিশাল গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ও রাজধানী পাটলিপুত্রের নিকটতম দেশের অধিবাসী হিসাবে পশ্চিম বাংগালীরা এই সময় ছিল জাতিতে ভারতীয়। ফলে এই যুগের বাংলা ভাষা ও সহিত্যের কোন উৎকলী বা রাঢ়ীয় রূপ ছিল না। একমাত্র বারেন্দ্র রূপই ছিল তার পরিচয়। চণ্ডিদাস কাশীরাম কবীন্দ্র পরমেশ্বর কৃত্তিবাস মালাধর বসু শ্রীকর নন্দী কবিকঙ্কন বিজয় গুপ্ত ও ভারতচন্দ্র প্রভৃতি বহু হিন্দু মনীষী, মুহাম্মদ সগীর দৌলত কাজী আলাওল বাহরাম খাঁ সাইফুল্লা সৈয়দ সুলতান সৈয়দ হামযা ও গরীবুল্লাহ প্রমুখ শত শত মুসলিম মনীষী বাংলা সাহিত্যের সেবা করেন এই রূপেই।

এই যুগের কাব্য ও উপাখ্যানের সাম্প্রদায়িক রূপ ছিল না। প্রেম ও বীরত্বের বর্ণনায় রোমান্টিক আর্ট সৃষ্টিই ছিল এ যুগের সাহিত্যের প্রাণ। সত্য পীরের পাঁচালি বাউল ভাটিয়ালি মুর্শিদী ভাওয়াইয়া ভাসান জারি সারি ও দেহতত্ত্ব প্রভৃতি কাব্যে ও

www.pathagar.com

গানে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, ভাষায় সাহিত্যে ও আধ্যাত্মিকতায় এই যুগে হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ এক ঐক্যের ময়দানে মিলিত হইবার চেষ্টা করিতেছিল। কালক্রমে সত্যপীর যখন সত্য নারায়ণ হইয়া গেলেন তখনও তাঁর ভোগ থাকিল শিরনী। বস্তুত সাম্প্রদায়িক প্রীতি ও আধ্যাত্মিক ঐক্যের বাণী বাহক পূর্ব বাংলার স্বকীয়তা সৃষ্টি ও বিকাশের দিক হইতে এই মুদ্দতটা ছিল বাংলা সাহিত্যের আদি ও স্বর্ণযুগ।

বাংলা সাহিত্যের মধ্য যুগ

এর পরে আসে বাংলা সাহিত্যের মধ্য যুগ। গৌড়রাজ হোসেন শাহের গৌরবময় শাসন আমলে ষোল শতকে পূর্ব–বাংগালী পরিবেশের সন্তান সিলেটের গৌরাংগ নবদ্বীপের শ্রীচৈতন্য রূপে আবির্ভূত হন এবং হিন্দুধর্মের প্রেমের বাণী ও ইসলামের সাম্য–ভ্রাতৃত্বের বাণীর সমন্বয়ে এক নয়া জীবনধারা প্রচার শুরু করেন মুসলিম শাসকদের উদারতার ছায়াতলে। প্রায় দুইশ' বছর পরে আঠার শতকে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের ও তাঁর বংশধরদের পৃষ্ঠপোষকতায় এই নয়া জাগরণের বাণী শেষ পর্যন্ত সাহিত্যে রূপায়িত হয়। এই সাহিত্যের ভাষা সংস্কৃত ছিল না, ছিল তৎকালীন প্রচলিত বাংলা। ধর্মের দিক হইতে চৈতন্যবাদ পন্থীরা ইসলামের সাথে কোনও বিরোধ বাধাইল না। কারণ ইসলামের জনপ্রিয়তার বন্যা হইতে হিন্দুকে বাঁচাইবার জন্য চৈতন্যবাদের আবির্ভাব হইলেও ইসলামের সাম্য–ভ্রাতৃত্ববাদই ছিল তার বুনিয়াদ।

কিন্তু সাহিত্যের ভাষায় ক্রমে–ক্রমে ধীরে ধীরে দৃঢ়ভাবে পূর্ব বাংলার প্রভাবের স্থলে পশ্চিম বাংলার প্রভাব প্রবর্তনের চেষ্টা চলিতে থাকে।

নবদ্বীপ অনেক আগে হইতেই সংস্কৃত পাণ্ডিত্যের কেন্দ্র ভূমি ছিল। এই পাণ্ডিত্য আগে পাটলিপুত্র ও কন্যকুব্জমুখী ছিল। শ্রীচৈতন্যের আধ্যাত্মিক ও কৃষ্ণরাজ পরিবারের সরকারী প্রভাবে এই পণ্ডিতরা বাংলামুখী হইলেন বটে কিন্তু নিজেদের প্রেস্টিজ রক্ষার্থ তাঁরা বাংলাভাষার প্রচলিত পূর্ব বাংগালিত্ব ঘুচাইয়া তাকে পশ্চিম–বাংগালী অর্থাৎ রাঢ়ীয় করিয়া লইবার চেষ্টা চালাইলেন। এই কারণে এই সময়কার চৈতন্য সাহিত্যে প্রচ্ছন্ন ও প্রকাশ উভয়ভাবে বাংগালবিরোধী প্রচারণা চলিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ চৈতন্য ভাগবৎ গ্রন্থের একটি অংশ উদ্ধৃত করিতেছি। প্রভু চৈতন্যের ভাগবৎ গ্রন্থের একটি অংশ উদ্ধৃত করিতেছি। প্রভু চৈতন্যের দরবার বর্ণনায় এই গ্রন্থে লেখা হইয়াছে :

বঙ্গদেশী বাক্য অনুকরণ করিয়া।
বাঙ্গালেরে কদর্থেন হাসিয়া হাসিয়া
বিশেষ চালেন প্রভু দেখি শ্রীহট্টিয়া
কদর্থেন সেইমত বচন বলিয়া।।

এই যুগের একটি সংস্কৃত শ্লোক এইরূপ :

'আশীর্বাদং ন গৃহ্নিয়াৎ পূর্ব বঙ্গ নিবাসিন :
শতায়ুবিতি বক্তব্যে হতায়ুর্বদতি যতঃ।

অর্থাৎ পূর্ব বাংগালীর আশীর্বাদ গ্রহণ করিও না। উহারা 'শতায়ু হউক' বলিতে গিয়া 'হতায়ু হউক' বলিয়া ফেলে।

এই পূর্ব বাংগালীবিদ্বেষ পরবর্তীকালে পশ্চিম বাংলার ভাষা সাহিত্যে ও শিক্ষা সংস্কৃতিতে এমন দানা বাঁধিয়া উঠে যে, বিশ শতকের গোড়াতেই পশ্চিম–বাংলার

www.pathagar.com

জনপ্রিয় প্রবচন হয় এইটি :

বাংগাল মনুষ্য নয় উড়ে এক জন্তু
লাফ দিয়া গাছে উঠে লেজ নাই কিন্তু।

বাংগাল-বিরোধী এই প্রচারণার ফলে চৈতন্য যুগের কাব্য-উপাখ্যানে স্বভাবতঃই ক্রমে ক্রমে পূর্ব বাংগালী শব্দাবলী ও বাক্য বিন্যাস বর্জিত হইতে থাকে। এই যুগের কীর্তন পদাবলী ও চৈতন্যে চরিতামৃতে এই বিবর্তন সুস্পষ্ট। গোড়ার দিকে এই বাংগাল-বিরোধী ভাব কিন্তু মুসলিম-বিরোধী ছিল না। বরঞ্চ সাম্য ও ভ্রাতৃত্ববাদ প্রচারে ইসলাম ও হিন্দুধর্মের মৌলিক ঐক্য ও সাদৃশ্য দেখাইবার চেষ্টা চলে আরও একশ' বছর ধরিয়া।

সাহিত্যে সাম্প্রদায়িকতার প্রবেশ

কিন্তু এরপর এই ভাবে রক্ষা করিয়া চলা সম্ভবও ছিল না, দরকারও ছিল না। চৈতন্যবাদ ছিল মূলত হিন্দু রেনেসাঁ আন্দোলন। এই রেনেসাঁকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য অত্যাবশ্যক হইয়া পড়ে হিন্দু মানস ও চিন্তাধারাকে পাঁচশ' বছরের মুসলিম-প্রভাব মুক্ত করা। মুসলিম প্রভাব কাটাইতে হইলে কিছুটা মুসলিম বিদ্বেষ নিশ্চয়ই প্রচার করিতে হয়। আঠার শতকের বাংলা সাহিত্যে এই ভাবের প্রথম উন্মেষ দেখা দেয়। জোর ধরে তাতে উনিশ শতকে।

এই মনোভাবের দরুন বাংলা ভাষা হইতে বহু যুগের সুপ্রচলিত আরবী ফারসী শব্দ বর্জনের প্রয়াস জন্মলাভ করে। বাংলায় প্রচলিত আরবী-ফারসী শব্দ মানে তাদের মূল আরবী ফারসী রূপ নয়। ঐ সব শব্দের বাংগালী লোক্যালাইয্‌ড রূপ। আজকাল যেমন আমরা কথাবার্তায় হাজার হাজার আরবী ফারসী শব্দ বাংলারূপে ব্যবহার করি, আরবী ফারসী শব্দ বলিয়া যেমন তাদেরে চিনাই যায় না, তৎকালেও তাই ছিল। তবু নবজাগরণে সঞ্জীবিত হিন্দুরা বাংগালিকৃত ঐসব আরবী ফারসী শব্দও বরদাশ্‌ত করিতে রাজী ছিল না।

তাই হিন্দু কবিরা আরবী ফারসীমূলক ঐসব শব্দ বাদ দিয়া সেই স্থলে ভাষায় সংস্কৃত শব্দ ও সাহিত্যের বিষয়বস্তুতে হিন্দুয়ানি প্রবর্তনের চেষ্টা করেন। মুসলিম কবি সাহিত্যিকদের মধ্যে এর প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। কাব্যে হিন্দুয়ানি প্রবর্তনের জবাবে তাঁরা মুসলমানি আমদানি শুরু করেন। সংস্কৃত শব্দ আমদানির জবাবে তাঁরা আনকোরা নতুন নতুন আরবী ফারসী শব্দ আমদানি শুরু করেন।

এর ফলে আঠার শতকের বাংলা সাহিত্যে হিন্দু ধারা ও মুসলিম ধারা রূপে দুইটি স্বতন্ত্র ধারার দেখা পাওয়া যায়। গোড়াতে এই দুই ধারার মধ্যে কোনও সংঘাত ছিল না। রেল-লাইনের দুইটি রেলের মতোই তারা সমান্তরালভাবে দুই খাতে পাশাপাশি প্রবাহিত হইত। কাব্যের উপাখ্যান ভাগ আগের মতোই রোমান্টিক থাকিত। শুধু কিতাবের গোড়াতে হিন্দু কবিরা ঈশ্বর ও দেব দেবীর বন্দনা করিতেন। মুসলিম কবিরা করিতেন আল্লা রসুলের বন্দনা হামদ ও নাত লিখিয়া। ক্রমে এই স্বাতন্ত্র্যবোধ আরও সুস্পষ্ট ও তীব্র হয়। হিন্দু কবিদের আখ্যানবস্তু হিন্দু দেব দেবী ও রাজপুরুষদের বীরত্ব মহিমা বর্ণনায় এবং মুসলিম কবিদের আখ্যান বস্তু মুসলিম পীর পয়গাম্বর ও বীর পুরুষদের বীরত্ব মাজেযা বর্ণনায় সীমাবদ্ধ হইতে থাকে।

www.pathagar.com

বাংলার সংস্কৃতিকরণ

এই অবস্থায় আসে ইংরাজ শাসন। উনিশ শতকের গোড়া হইতেই বাংলার সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে ইংরাজরা সক্রিয় হস্তক্ষেপ শুরু করে। নব-লব্ধ রাজ্য রক্ষা ও কায়েম করার জন্য এটা তাদের দরকারও ছিল। মুসলমানরা ইংরাজ শাসন মানিয়া লয় নাই। পতন যুগের মুসলমানদের সাংস্কৃতিক আত্মরক্ষার শেষ প্রয়াস 'ওহাবী আন্দোলন' শেষ পর্যন্ত ইংরাজবিরোধী সিপাই-বিদ্রোহ নামে জেহাদী স্বাধীনতা সংগ্রামে পরিণত হয়। বিদ্রোহী মুসলমানদের শায়েস্তা করিবার মতলবে ইংরাজরা হিন্দুদের সহায়তা নেয়। নব-জাগরণে-উদ্বুদ্ধ হিন্দুর নবজাত এই মুসলিম-বিদ্বেষে তারা ইন্ধন যোগায় খুব। চাকুরী-বাকুরী ও শিল্পে-বাণিজ্যে হিন্দুদের প্রাধান্য স্থাপনের চেষ্টা করে। সাম্রাজ্যবাদী 'ডিভাইড এণ্ড রুল' নীতি তারা ভাষা ও সাহিত্যেও প্রয়োগ করে। হিন্দু কলেজ-সংস্কৃত কলেজ স্থাপনের সংগে-সংগে প্রচলিত বাংলাকে এককভাবে হিন্দু ভাষা করিবার ব্যবস্থা করে।

ছয়শ' বছরের মুসলিম শাসনের ভাল দিকের সংগে খারাপ দিকও ছিল স্বভাবতই। ইংরাজরা হিন্দুদের মন মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিষায়িত করিবার উদ্দেশ্যে বাছিয়া-বাছিয়া কেবল খারাপ দিক দেখায়। একদিকে মিথ্যা ও আধা-সত্য ইতিহাস সৃষ্টি করিয়া তারা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করে যে, মুসলমানরা হিন্দু ধর্ম ও হিন্দু নারীর সতীত্ব নষ্ট করিয়াছে। অন্যদিকে তেমনি দেখায় মুসলমানরা আরবী ফারসী শব্দ ঢুকাইয়া বাংলা ভাষারও সতীত্ব নষ্ট করিয়াছে। বাংলা ভাষার পবিত্রতা রক্ষার জন্য এইসব আরবী ফারসী শব্দকে বাংলা ভাষার পবিত্রতা রক্ষার জন্য এইসব আরবী ফারসী শব্দকে বাংলা ভাষা হইতে দূর করা দরকার। কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়মের ও হুগলির শ্রীরামপুরের ফরস্টার মার্শম্যান ও উইলিয়ম ক্যারি প্রমুখ পাদ্রী-রাজনীতিক এই বাংলা ভাষা সংস্কার আন্দোলনের গোড়া পত্তন করেন। এঁরা আরবী ফারসী শব্দ বর্জিত বিশুদ্ধ বাংলাগদ্যে নিজেদের ধর্মীয় প্রচার-পত্র প্রকাশ করিতে শুরু করেন। এই বিশুদ্ধ বাংলাতে তাঁরা হুগলি হইতে বাংলা ভাষার প্রথম সপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশ করেন।

এখানে প্রসংগক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, অনেকের ধারণা এই পাদ্রীরাই এই সময়ে সর্বপ্রথম বাংলা গদ্যের প্রচলন করেন। তাঁরা মনে করেন ইংরাজ আগমনের আগে বাংলা ভাষার লিখিত কোনও গদ্যরূপ ছিল না। ইংরাজ পাদ্রীরাই উনিশ শতকের গোড়াতে প্রথম বাংলা গদ্য প্রবর্তন করেন। কথাটা মোটেই সত্য নয়। মুসলিম শাসন-আমলে বাংলা গদ্য লেখা সুপ্রচিলিত ছিল। এত্তেলানামা দরখাস্ত পরওয়ানা আদালতের আরযি জবাব রায় চিঠিপত্র জায়দাদ সম্পর্কিত দলিল তমসুক ও তওলিয়াতনামা হেবানামা দানপত্র ইত্যাদি সমস্তই গদ্য ভাষায় লেখা হইত। ছোটভাই রাধাকৃষ্ণের বরাবরে মহারাজা নন্দ কুমারের সতর'শ ছাপ্পান্ন খৃষ্টাব্দে লিখিত ইতিহাস বিখ্যাত চিঠি এবং লণ্ডন জাদুঘরে রক্ষিত আরও দুই চারখানা গদ্য লেখা তার প্রমাণ। এইসব দলিল পত্রে স্বভাবতই সুপ্রচলিত আরবী ফারসীজাত বহু শব্দ ব্যবহার করা হইত।

অতএব ইংরাজ পাদ্রীরা উনিশ শতকের গোড়াতে প্রথম বাংলা গদ্য প্রবর্তন করেন, এ কথার অর্থ এই যে, তাঁরা আরবী ফারসী শব্দবিবর্জিত সংস্কৃত শব্দবহুল বাংলা গদ্য প্রবর্তন করেন। হিন্দু সুধী সমাজকে এ কাজে উদ্বুদ্ধ করার মতলবে এই

www.pathagar.com

পাদ্রীরা ইংরাজীতে বাংলা ভাষার প্রথম অভিধান প্রণয়ন করেন। তাতে বাংলা ভাষায় প্রচলিত কোন্ কোন শব্দ আরবী ফারসী তা দেখাইয়া দেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মৃত্যুঞ্জয় তর্কালংকার প্রমুখ পণ্ডিত এই সময় সংস্কৃত শব্দ ভারাক্রান্ত নূতন বংগ ভাষার প্রবর্তন করেন। এঁরা নিজেদের লেখা বই পুস্তকে বৌদ্ধ-মুসলিম-পর্তুগিজ প্রবর্তিত সুপ্রচলিত শব্দসমূহ সম্পূর্ণ বর্জন করিয়া সে স্থলে সংস্কৃত শব্দ প্রয়োগ করেন। কলমকে 'লেখনী' কাগজকে 'ভূর্জপত্র' দোয়াতকে 'মস্যাধার' করার চেষ্টা এই সময় করা হয়। বাংলা ভাষাকে সংস্কৃতের কন্যা বলিয়া দাবি এই যুগেই শুরু হয়। 'ব্যাকরণ কৌমুদী' ও ব্যাকরণ মঞ্জুষা' লেখা হয় এই সময়ে বাংলাকে সংস্কৃতের খাতে ফেলিবার উদ্দেশ্যে। খাওয়াকে 'আহার করা' পরাকে 'পরিধান করা' বসাকে 'উপবেশন করা' ইত্যাদি সংস্কার শুরু হয় খুবই দ্রুত গতিতেই। নদীয়াবাসী প্রতিভাবান সংস্কৃত পণ্ডিতদের শক্তিশালী লেখনী-মুখে বাংলা ভাষা যে সাহিত্যিক রূপ পায়, তার শব্দ প্রয়োগে বাক্য বিন্যাসে নদীয়ার বাকরীতি ও ভাষিক বৈশিষ্ট্যই প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সাময়িকভাবে বাংলা ভাষা সত্যসত্যই সংস্কৃতের পালিতা কন্যা হইয়া যায়। ভাষা ও সাহিত্যে হিন্দু-বাংলা ও মুসলিম-বাংলার পৃথকীকরণ সম্পূর্ণ হয়। এইটাই বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ।

আধুনিক যুগ

কিন্তু নবজীবনের বাণীতে সঞ্জীবিত বাংগালী হিন্দু সংস্কৃতের এই আধিপত্য বেশি দিন মানিয়া চলে নাই। সংস্কৃত পণ্ডিতদের সংস্কৃতায়িত এই বংগ ভাষাকে তারা 'উৎকট উৎকলী' বাংলা বলিয়া পরিত্যাগ করে। বড়-বড় বাংগালী হিন্দু মনীষীর অভ্যুদয়ে এবং ইংরাজী-ফরাসী সাহিত্যের সংশ্রবে এরপর বিপুল সমৃদ্ধশালী এক বাংলা সাহিত্যের সৃষ্টি হয়। সে সাহিত্য বিশ্ব-সাহিত্যের দরবারে সম্মানের আসন লাভ করে। ঐ সাহিত্যের ভাষা হিসাবে এমন একটি উন্নত বাংলা ভাষার সৃষ্টি হয় যা বর্ধমান হইতে চট্টগ্রাম রংপুর হইতে ডায়মণ্ডহারবার পর্যন্ত গোটা বাংলাদেশের সাহিত্যের বাংলারূপে গৃহীত হয়। গল্প-উপন্যাস কাব্য-নাটকে এই যুগ নব্য বাংলা সাহিত্যের স্বর্ণযুগ।

তবে এই স্বর্ণযুগের আলোকোজ্জ্বল মজলিসে মুসলিম-বাংলার স্থান ছিল না। বাংলার বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের কাব্যের আকাশে শুধু শরতের চন্দ্র উদিত হইত এবং সে চন্দ্রোদয়ে 'আনন্দময়ীর আগমনে আনন্দে যাইত দেশ ছেয়ে'। কিন্তু সে কাব্যাকাশে ঈদ-মোহররমের চাঁদ কখনও উঠিত না। ঈদের আনন্দে ও মোহররমের শোকে দেশ কখনও 'ছেয়ে'ও যাইত না। বরঞ্চ এই সাহিত্যের আলোকের প্রখরতায় মুসলিম-বাংলার নিজস্ব সাহিত্য। 'বটতলার পুঁথি সাহিত্যে'র বদনাম লইয়া পল্লী-বাংলায় মুখ লুকাইল। ঈশ্বরগুপ্ত ও বঙ্কিমচন্দ্র 'নেড়ে যবন' গাল দিয়া মুসলিম-বাংলাকে সেই যে সাহিত্যের মজলিস হইতে তাড়াইলেন, রবীন্দ্র-শরৎচন্দ্রের সাহিত্যের বিরাট আকর্ষণী শক্তিও আর তাদেরে সে মজলিসে ফিরাইয়া আনিতে পারিল না। এই না পারার স্বাভাবিক কারণও ছিল।

হিন্দু রেনেসাঁর প্লাবনে ইতিমধ্যে বাংলা সাহিত্য যে গতি-পথে চলিয়াছিল, তা হইতে ফিরিয়ার কোনও উপায় ছিল না। পক্ষান্তরে মুসলিম-বাংলার পক্ষে সে পথে যাওয়াও সম্ভব ছিল না। শিল্প-সাহিত্যের এই স্বর্ণযুগে পশ্চিম-বংগ গোটা বাংলার

www.pathagar.com

যে মুসলিমহীন ইমেজ তৈয়ার করিয়াছে তা যতই সুন্দর হউক, ষোল-সতর শতকের বাংলার ইমেজ হইতে এটা সম্পূর্ণ পৃথক। আজিকার এই ইমেজে শুধু মসলিম-বাংলা নয় পূর্ব-বাংলাও নির্বাণ লাভ করিয়াছে এবং চিরতরেই করিয়াছে।

পাকিস্তান যুগ

তবু এই কথাটা বুঝিতে অনেকের অসুবিধা হয়। কারণ এই দৃষ্টিকোণ হইতে ব্যাপারটার বিচার আজও হয় নাই। হইতে পারে নাই।

পাকিস্তান দাবির মধ্যে সাম্প্রদায়িক আওয়াজ ও গণতান্ত্রিক জাতীয় আওয়াজ দুইটাই ছিল। কিন্তু সাম্প্রদায়িক দাবির মোটা আওয়াজের নিচে পূর্ব-বাংলার স্বকীয়তার গণতান্ত্রিক জাতীয় দাবির ক্ষীণ আওয়াজটা চাপা পড়িয়া গিয়াছিল অবস্থা গতিকে। ফলে গোটা দাবিকেই মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক দাবি বলিয়া ভুল করা হইয়াছে।

এই ভুল শুধু হিন্দুরা করে নাই। অনেক মুসলমানও করিয়াছে। পূর্ব-বাংলার ভাষিক ও সাহিত্যিক স্বকীয়তার দাবীকে এই কারণেই অনেক মুসলিম সাহিত্যিকও বাংলা ভাষা ও সাহিত্য পার্টিশন করার সাম্প্রদায়িক দাবি মনে করেন। এঁদের বুঝিতে কিছু সময় লাগিবে যে, এই ধারণা ভুল।

পরাধীন আমলের ভারতবর্ষের মডারেটরা ইংরাজ শাসনে বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত থাকাকে গৌরবের বিষয় মনে করিতেন। কংগ্রেসের স্বাধীনতার দাবিকে এঁরা একটা বিশ্বজয়ী সভ্য সাম্রাজ্যের মেম্বরগিরি হারাইবার প্রগতি-বিরোধী আত্মঘাতী দাবি মনে করিতেন। আমাদের দেশের উপরোক্ত শ্রেণীর সাহিত্যিকদের মনোভাব কতকটা এইরূপ। রবীন্দ্রনাথের পুরাতন ভৃত্যের মতোই এঁরা মনিবের সম্পদকেই নিজের সম্পদ মনে করেন। এঁরা যে শুধু স্বাধীনতা চান না তা নয়, স্বাধীনতাকে দস্তুরমত ভয় পান এঁরা।

এখানে আসল ব্যাপার এই যে, কলিকাতা-কেন্দ্রিক আধুনিক বাংলা সাহিত্য তার বিশালতার চাপেই পূর্ব-বাংলা ও মুসলিম-বাংলাকে নিষ্পিষ্ট করিয়াছে। ইতিহাসের দিক হইতে পূর্ব-বাংলা-বিতাড়নের কাজটা মুসলিম-বাংলা-বিতাড়নের কয়েকদিন আগে হইতে শুরু হইলেও দুইটি অভিযানই চলে এক সংগে সমান্তরালভাবে অনেক দিন ধরিয়া। একদিকে যেমন চলে 'কলম'কে 'লেখনী' 'তাজ'কে 'মুকুট' 'তলওয়ার'কে তরবারি' 'ঘোড়-সওয়ার'কে 'অশ্বারোহী' শহরকে 'নগর' 'আয়নাকে' 'আরশী' গোশত'কে 'মাংস' ও লহুকে 'রক্ত' করার অভিযান, অপরদিকে তেমনি চলে 'থনে'কে 'হইতে' 'ঠাই'কে 'নিকটে' 'ত'কে 'তে' 'রে'কে 'কে' এবং ক্রিয়াপদে 'কহিয়া'কে 'বলিয়া' 'থুইয়াকে' 'রাখিয়া' জিগাইয়াকে' 'শুধাইয়া' করার অভিযান।

'পানি'কে 'জল' আর 'কাংকই'কে 'চিরুণী' করার মধ্যে কতটা মুসলিম-বিদ্বেষ আর কতটা বাংগাল-বিদ্বেষ আছে তা কওয়া মুশকিল। শুধুমাত্র পশ্চিম-বাংলার হিন্দুরা ছাড়া আর সর্ব-ভারতীয় হিন্দুরাই 'পানি' ও 'কাংকই' ব্যবহার করিয়া থাকে। আর শব্দ দুইটিও আরবী-ফারসী নয়, একেবারেই বিশুদ্ধ হিন্দী। ইহা হইতে এই সিদ্ধান্ত একরকম অনিবার্য হইয়া পড়ে যে, পশ্চিম-বাংলার হিন্দুদের 'পানি' ও 'কাংকই' বর্জনের মধ্যে মুসলিম-বর্জনের চেয়ে পূর্ব-বংগ বর্জনই বেশি সুস্পষ্ট।

পরবর্তীকালে পূর্ব-বাংলার হিন্দুদেরও অনেকে যে এই দুইটি শব্দ বর্জন করিয়া চলিত তার কারণ পশ্চিম-বাংলার ভাষিক ও সাহিত্যিক প্রভাব দুর্নিবার হইয়া উঠিয়াছিল। সে প্রভাব প্রতিফলিত হইয়াছিল শুধু হিন্দুর উপরে নয়, অনেক মুসলমানের উপরেও।

www.pathagar.com

সে প্রভাব ক্রমে ব্যাকরণের বিভক্তিতেও ছড়াইয়া পড়ে। মধ্যম বা দ্বিতীয় পুরুষের ক্রিয়াপদে সম্ভ্রম-সূচক 'বা' এর বদলে তুচ্ছার্থবোধক 'বে' প্রবর্তন করা হয়। পূর্ব-বাংলার সর্বত্র 'তুমি খাইবা' 'তুমি যাইবা' ইত্যাদি চালু আছে। তৎকালীন সাহিত্যে এই ব্যবহারই চালু ছিল। পশ্চিম-বংগীকরণে এই 'তুমি খাইবা' 'যাইবা'র জায়গায় 'তুমি খাইবে' 'যাইবে' প্রবর্তন করা হয়। ছোট-বড় উচ্চ-নীচ ভক্তি-আদর বুঝাইবার জন্য উর্দু-হিন্দীর মত বাংলায়ও 'আপনে', 'তুমি' ও 'তুই' বলার রেওয়াজ আছে। পূর্ব বাংলায় 'যাওয়া' ক্রিয়ার ব্যবহারে 'আপনে যাইবেন' 'তুমি যাইবা' ও 'তুই যাইবি' ব্যবহার করা হয়। স্পষ্টতই এটা ভদ্র ও শালীন ব্যবহার। বাঞ্ছনীয়ও বটে। শুনিতেও মিঠা।

পূর্ব-বাংলার প্রাধান্য থাকাকালে অর্থাৎ মুসলিম আমলে বাংলা সাহিত্যে এইরূপ ব্যবহার প্রচলিত ছিল। দৌলত কাযী আলাওল ও ফয়যুল্লা প্রভৃতি মুসলিম কবির লেখায় ত বটেই হিন্দু কবিদের লেখাতেও এইরূপ ব্যবহার করা হইত। পুরাতন তওলিয়তনামা, হিন্দুদের উইল ও দান-পত্র, মামলা-মোকদ্দমার রায় ইত্যাদি দলিল-পত্রাদিতেও এইরূপ করা হইত দেখা যায়। যতদিন ভাষায় মধ্যম বা দ্বিতীয় পুরুষে ঐরূপ তিনটি স্তর আছে, ততদিন ক্রিয়াপদেও তিন স্তরের পার্থক্য থাকাটা দোষের ত নয়ই বরঞ্চ ব্যাকরণ-সম্মত সুবিধাজনক ও ভদ্রতাসূচক। কিন্তু পশ্চিম-বাংলায় ও কলিকাতায় 'তুমি যাইবা' বলা বাংগালপনা বলিয়া নিন্দিত।

অসংগত ও অযৌক্তিক

আরেকটি দৃষ্টান্ত নেন। পূর্ব-বাংলার প্রায় সর্বত্র 'হইতে'র প্রতিশব্দ 'থনে' আর 'কাছে' বা 'নিকটে'র প্রতিশব্দ 'ঠাই'। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যেও 'থনে' ও 'ঠাই' এর প্রচুর ব্যবহার দেখা যায়। মধ্যযুগের ও বর্তমান যুগের সাহিত্যে 'থনে'র ও'ঠাই'-এর ব্যবহার একদম নিষিদ্ধ। 'হতে' 'চেয়ে' 'থেকে' এবং 'কাছে' ও 'নিকটে' তাদের জায়গা দখল করিয়াছে।

আরব ও পারস্যের সংশ্রবের দরুনই হউক বা দ্রাবিড় মংগোলীয় অভ্যাসের দরুনই হউক, পূর্ব-বাংলার লোক চন্দ্রবিন্দুর অনুনাসিক উচ্চারণ করিতে পারে না। তার বদলে 'ন' উচ্চারণ করিয়া থাকে। তারা চাঁদের বদলে 'চান্দ' ফাঁদের বদলে 'ফান্দ' কাঁদার বদলে 'কান্দা' ব্যবহার করে। বাংলা সাহিত্যের আদি যুগে এই ব্যবহার সুপ্রচলিত ছিল। মধ্য ও বর্তমান যুগের বাংলা সাহিত্যে এটা অশালীন বলিয়া পরিত্যক্ত। 'র' ও 'ড়'-এর বেলাও তাই হইয়াছে।

ক্রিয়াপদের রূপান্তরের একটি উদাহরণ দেই। 'বসাইয়া' 'করাইয়া' 'ধরাইয়া' ইত্যাদি শব্দের কথ্যরূপ পূর্ব-বাংলায় 'বসা'য়া' 'করা'য়া ও 'ধরা'য়া'। ঐ শব্দগুলির শুদ্ধ কবিতা রূপ যথা 'বসায়ে' 'করায়ে' ও 'ধরায়ে'র অতি ঘনিষ্ঠ রূপ এরা। তবু পশ্চিম-বাংলা শুধু যেন পূর্ব-বাংলা হইতে নিজেদের দূরত্ব প্রমাণের জন্যই যিদ করিয়া ওগুলিকে 'বসিয়ে' 'করিয়ে' ও 'ধরিয়ে' করিয়াছে।

সংখ্যা-বাচক শব্দের একটি মাত্র উদাহরণ দিয়াই আমি এদিককার কর্তব্য শেষ করিব। এক দুই তিন ইত্যাদি কার্ডিন্যাল বা অংকবাচক সংখ্যার অর্ডিন্যাল বা মান-বাচক সংখ্যারূপে পূর্ব-বাংলায় পয়লা দুসরা তেসরা ও চৌথা ব্যবহার করা হয়। এর

৬—

www.pathagar.com

পরে আঠার পর্যন্ত সংখ্যার শেষে 'ই' যোগ করিয়া এবং তারও পরে সংখ্যা-শব্দের উচ্চারণ ভেদে 'আ' বা 'ই' যোগ করিয়া শব্দ গঠন করা হয়। যথা : তেরই পনরই সতরই একইশা ত্রিশা চল্লিশা ষাইটা সত্তুরা বাহাওরা একাশিয়া বিরানব্বইআ ইত্যাদি। প্রাচীন বাংলা-সাহিত্যেও এইরূপ ব্যবহার হইত।

কিন্তু পশ্চিম-বাংলার মধ্যযুগের সংস্কৃত-ঘেঁষা বাংলা সাহিত্যে এক হইতে চার পর্যন্ত প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় ও চতুর্থ লেখার পর পাঁচ হইতে তদূর্ধ সংখ্যায় 'ম' 'তম' ও 'তিতম' প্রত্যয় যোগ করিয়া সমস্ত মানবাচক সংখ্যাকে দুরুচ্চার সংস্কৃত শব্দ করা হইয়াছে। এ ব্যবস্থায় লিখিবার সময় সকল সংখ্যার পর সংক্ষেপে 'ম' বসাইয়া কাজ সারা হয় বটে, কিন্তু পড়িবার সময় পঞ্চবিংশতিতম ষষ্ঠষষ্ঠিতম, অষ্টসপ্ততিতম ইত্যাদি উচ্চারণ করিতেই হয়। এটার দুঃসাধ্যতা স্বীকৃতির ফলে অনেকেই ইদানীং পড়িবার সময় প্রচলিত সহজ বাংলা অংকসংখ্যার পর শুধু 'তম' উচ্চারণ করিয়া থাকে। যথা পঁচিশতম একচল্লিশতম বিরাশিতম ও একশতম ইত্যাদি। এটা কি যুক্তিসংগত না ব্যাকরণ-সম্মত? এর একটাও না। তবু এটা করা হইয়া থাকে। কারণ বিকল্প সহজ শব্দটি বাংগাল।

পরিভাষার ছুতা

আমাদের মাতৃভাষাকে আজও সরকারী দফতরের অফিশিয়াল ল্যাংগুয়েজ করা হয় নাই বলিয়া গবর্নমেন্টকে আমরা দোষ দেই। কিন্তু আমাদের বেসরকারী ও ব্যক্তিগত কায়-কারবারে দোকান-পাটে রাস্তা-ঘাটে স্কুল-কলেজে আমরা যে বাংলার প্রাপ্য মর্যাদা দিতেছি না এটা কার দোষ? আমরা যে ক্লাবে পার্টিতে, সভা-সমিতিতে, ব্যক্তিগত চিঠি পত্রে, বিয়া-শাদির দাওয়াত-নামায় পর্যন্ত ইংরাজী চালাইতেছি, তার জন্যও কি সরকার দায়ী? শহর মফস্বলের সমস্ত মিউনিসিপালিটির রাস্তা-ঘাটের নাম-ফলক, মায় ইউনিয়ন কাউন্সিলের চিঠি-পত্র, তাদের ছাপা শিরোনামা, খেলা-ধুলার অনুষ্ঠান-পত্র সবই যে চলিয়াছে আগের মতোই ইংরাজীতে, এ দোষ আমরা চাপাইব কার ঘাড়ে? মোট কথা পরধীনতার আমলে এবং বাংলাকে রাষ্ট্র-ভাষা করিবার আগে অবস্থা পরিবেশ এবং মনোভাব যা ছিল, আজো ঠিক তাই আছে।

মাতৃভাষা প্রয়োগ সম্পর্কে দ্বিমত নাই। কিন্তু বিভ্রান্তি আছে। বিভ্রান্তি আমাদের সুধী সমাজে। শিক্ষক অধ্যাপক ও সাহিত্যিক সাংবাদিকরাই সুধী সমাজের অগ্রণী। কারণ এঁরাই স্বাধীনভাবে চিন্তা ও কাজ করিতে পারেন।

শিক্ষকদের কথাটাই আগে বলি। মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের আবশ্যকতা সম্বন্ধে সকলেই একমত। কিন্তু সেটা হয় নাই। আরম্ভই হয় নাই। কারণ বাংলায় আজো পাঠ্য-পুস্তক, বিশেষত বিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তক, লেখা হয় নাই। যেহেতু আজো পরিভাষা সৃষ্টি হয় নাই। কেন হয় নাই? প্রয়োজনীয় পরিভাষা সৃষ্টির জন্য বাংলা একাডেমি ও ইউনিভার্সিটির পরিভাষা কমিটিরা চেষ্টা করিতেছেন। যতদিন ও-কাজ সমাপ্ত না হইবে ততদিন মাতৃভাষায় শিক্ষাদান স্থগিত থাকিবে।

কথাটা যে কত বড় অসত্য তা যে-কোন কাণ্ডজ্ঞানী লোকের বুঝিবার কথা। পরিভাষা সৃষ্টির প্রচেষ্টা যে কত কৃত্রিম অনাবশ্যক ও অসংগত চেষ্টা, অসংগত চেষ্টা, অর্থ শক্তি ও সময়ের যে কত বড় অপচয়, সুধী সমাজকে তা বুঝাইবার চেষ্টা করাও

www.pathagar.com

শক্তি ও সময়ের অপচয় মাত্র। যে শব্দ বাংলাদেশের সকলে বুঝে ও বলে, সেটাই বাংলা শব্দ। যে ভাষায় আমরা রোজ কথা কই, যে ভাষায় ছাত্র-শিক্ষকরা নিজেদের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান করেন, সেটাই বাংলাভাষা। তার আবার পরিভাষা কি? সে ভাষার কোন্ শব্দটা ইংরাজি কোন্টা সংস্কৃত কোন্টা আরবী কোন্টা ফারসী কোন্টা পর্তুগীয সেটা বিবেচ্য বিষয় ভাষা-বিজ্ঞানীর, শিক্ষক ছাত্র লেখক ও জনসাধারণের বিবেচ্য নয়।

ভাষার পরিচয় যে শুধু ক্রিয়া পদে, এটাও কি কাউকে বুঝাইয়া দিতে হইবে? দশটা বাংলা-ইংরাজি শব্দ একত্র করিয়া তার সাথে 'হোতা হ্যায়', 'করতা হ্যায়' লাগাইয়া দিলেই হিন্দী-উর্দু বাক্য হইয়া যায়, এটা একেবারে ফাঁকা রসিকতা নয়। 'আমাদের কলেজের প্রফেসাররা ক্লাসরুমে লেকচার দিবার সময় ব্ল্যাকবোর্ডে ড্রয়িং আঁকিয়া লেসন দিয়া থাকেন। আর স্টুডেন্টরা সে সব নোট করিয়া লয় এবং প্রাকটিক্যাল ক্লাস করার সময় ল্যাবরেটরিতে তদনুসারে এক্সপেরিমেন্ট করিয়া থাকে।' এটা কি বাংলা নয়? এই ভাষায় বাংলা হরফে টেক্স্ট বুক লেখা যায় না? টেক্স্টবুক বোর্ড বাংলা পরিভাষা সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত ঐ বোর্ড গঠন স্থগিত থাকিল না কেন? পরিভাষা সৃষ্টি হইবার আগেই সেকেণ্ডারি এডুকেশন বোর্ডই বা গঠিত হইল কেমন করিয়া। হসপিটাল বেড নার্স ক্যাবিন ওয়ার্ড মেডিসিন ইনজেকশন অপারেশন ইমারজেন্সির পরিভাষা সৃষ্টি হওয়ার আগেই হাসপাতাল খোলা হইল কোন্ যুক্তিতে? থার্মোমিটার স্টেথিসকোপ ও সিরিঞ্জের পরিভাষা সৃষ্টি হওয়ার আগেই আমরা বাড়িতেই বা ডাক্তারকে কল দেই কোন অধিকারে? আর ডাক্তাররাই বা পরিভাষা সৃষ্টির আগেই প্রেসক্রিপশন লিখিয়া ভিযিট ক্লেইম করেন কোন্ আইনে? আর আমরা জনসাধারণই বা সেই প্রেসক্রিপশন লইয়া ডিস্‌পেনসারিতে কমপাউন্ডারের কাছে যাই কোন্ আক্কেলে? আর সেই বা মিকচার দিয়া ক্যাশ মেমো কাটে কিরূপে?

সুতরাং বুঝা গেল পরিভাষার অভাবের অজুহাত একটা বাজে অজুহাত মাত্র। আমাদের বদভ্যাস ও গোলামি মনোভাব ঢাকা দেওয়ার একটা অপকৌশলমাত্র। এটা ত গেল আমাদের শিক্ষকদের কথা। আমাদের লেখক-সাহিত্যিকদের অবস্থা আরও অনেক বেশি শোচনীয়।

আদর্শের দিকভ্রান্তি

পাকিস্তান হাসিলের আগে আমরা লেখক-সাহিত্যিকরা যে পথে যেদিকে যাইতেছিলাম আজও সেই পথে ঠিক সেই দিকে যাইতেছিলাম আজও সেই পথে ঠিক সেই দিকে যাইতেছি। স্বাধীনতার আগে কলিকাতায় বসিয়া আমরা যে-ভাষায় লেখিয়া যে ধরনের সাহিত্য রচনা করিতাম, পূর্ব-পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকায় বসিয়াও সেই ভাষায় সেই ধরনের সাহিত্য সৃষ্টি করিতেছি।

ইতিমধ্যে মুসলিম-ভারতের তমদ্দুনী বৈশিষ্ট্যের দাবিতে পাকিস্তান নামে যে একটা রাষ্ট্রীয় বিপ্লব হইয়া গেল, মুসলিম-বাংলার ও হিন্দু-বাংলার নিজ-নিজ স্বকীয়তার দাবিতে যে এক বাংলা দুই বাংলা হইয়া গেল, সে বিপ্লবের ঝড়-তুফানে যে লক্ষ-লক্ষ মানুষ জান দিল এবং কোটি-কোটি মানুষ ছিন্নমূল বাস্তুহারা হইল, তাতেও আমাদের লেখক-সাহিত্যিকদের পাষাণ হৃদয়ে ও জমাট মস্তকে একটা

www.pathagar.com

আঁচড়ও লাগিল না। কলিকাতার উন্নত সাহিত্যিক ঐতিহ্যের কড়া নেশা আজো তাঁদের কাটে নাই। তাঁরা আজও কলিকাতার আর্টের আবিরে দেহমুখ রাংগাইয়া কলিকাতার ভাষার হুলুধ্বনি দিয়া চলিয়াছেন।

পূর্ব-পাকিস্তানের জাতীয়তাকে পূর্ব-বাংলার স্বকীয়তাকে রূপায়িত ও সঞ্জীবিত করিবার, পূর্ব-বাংগালীর ভাষাকে সাহিত্যিক আভিজাত্য দিবার কোনও চেষ্টাই তাঁরা করিতেছেন না বরঞ্চ পূর্ব-বাংলার ভাষিক বৈশিষ্ট্য ও কৃষ্টির শ্রেষ্ঠত্বকে অভদ্রতা ও অশালীনতার তহমত দিয়া পশ্চিম-বাংলার শালীন ভাষায় আমাদেরে শুদ্ধি করিবার অভিযান চালাইয়াছেন।

এ সম্পর্কে আমরা ক্ষুদ্র অভিমত বিভিন্ন ভাষণে ও প্রবন্ধে একাধিকবার বলিবার চেষ্টা করিয়াছি। আজ তার পুনরুক্তি করিব না। শুধু এইটুকুই স্মরণ করাইয়া দিব :

ভাষিক বিভ্রান্তি

দুনিয়ার সব উন্নত ভাষার মতোই বাংলারই লেখ্য ও কথ্য দুইটা রূপ। কথ্য বাংলারও স্বভাবতই আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্য আছে। কিন্তু লেখ্য বাংলা নিখিলবংগীয় ভাষা। তাতে পূর্ব-পশ্চিমা কোনও উল্লেখযোগ্য পার্থক্য নাই। উহাই উভয় বাংলার পাঠ্য-পুস্তকের বাংলা বর্ণপরিচয় বাল্যশিক্ষা হইতে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত। বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের ইংলণ্ড আয়ার্ল্যাণ্ড ওয়েলস ও স্কটল্যাণ্ডের, এমনকি রাজধানী লণ্ডন শহরেরও নিজস্ব আঞ্চলিক ইংরাজি আছে। তা সত্ত্বেও সারা গ্রেটবৃটেনে একটা স্ট্যাণ্ডার্ড ইংরাজি আছে। এটাই সাহিত্যের ও টেক্স্ট বুকের ইংরাজি। গল্প উপন্যাসে নাটক-নভেলে স্বাভাবিকতা ও লোক্যাল কালার দেওয়ার জন্য প্রয়োজনমতো আঞ্চলিক ভাষা প্রযুক্ত হইলেও কোন আঞ্চলিক ভাষাকেই স্ট্যাণ্ডার্ড ইংরেজিতে প্রাধান্য দেওয়া হয় না। অপেক্ষাকৃত উন্নত বলিয়া এক অঞ্চলের ভাষাকে অন্য অঞ্চল কদাচ তার স্ট্যাণ্ডার্ড ভাষা করে না। এমনকি খোদ রাজধানী লণ্ডনের ভাষাও না। 'কিংস ইংলিশ' বা রাজার ইংরাজিই সর্বত্র স্ট্যান্ডার্ড ইংরাজি ও সাহিত্যের ভাষা।

ফ্রান্স জার্মানি ইটালি মার্কিন মুল্লুকেও তাই। জার্মানিতে কান্দা জার্মান (হাই জার্মান) ও নামা জার্মান (লো জার্মান) নামে দুইটা আঞ্চলিক জার্মানি ভাষা প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। এ দুইয়ের মধ্যে হরফ ও শব্দের উচ্চারণে ক্রিয়াপদে ও বাক্য-বিন্যাসে মৌলিক পার্থক্য রহিয়াছে। পনর শ' একত্রিশ সালে মার্টিন লুথারের মতো প্রভাবশালী উভয় জার্মানির ধর্মীয় নেতা এই দুই অঞ্চলের ভাষার মধ্যে আপোস ঘটাইবার চেষ্টা করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি লো এবং হাই জার্মানির সংমিশ্রণের এক সংশোধিত জার্মান ভাষা সৃষ্টি করিয়া সেই ভাষায় বাইবেল অনুবাদ করেন। কিন্তু সমন্বয়িত লুথারিয়ান জার্মানে হাই জার্মানের প্রধান্য আছে, এই অজুহাতে লো জার্মানিরা লুথারের ভাষা গ্রহণ করে নাই। ফলে হাই-জার্মানি এখন তার আভিজাত্যের দাবি ত্যাগ করিয়া স্ট্যাণ্ডার্ড জার্মানিকেই সাহিত্য দর্শন বিজ্ঞানের ভাষা বলিয়া মানিয়া লইয়াছে। ফ্রান্স ইটালি ও যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরেও তেমনি উত্তর-দক্ষিণ ও পূর্ব-পশ্চিম আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্য আছে। তা সত্ত্বেও ওদের সাহিত্য সাংবাদিকতা চলে স্ট্যাণ্ডার্ড ভাষায়। প্রাধান্য তাতে স্বীকৃত হয় নাই।

সভ্য দুনিয়ার সর্বত্র এই অবস্থা। একই দেশ ও রাষ্ট্রের মধ্যেও। কিন্তু বাংলাদেশের অবস্থা কি? আমাদের লেখক-সাহিত্যিকরা শুধু পূর্ব-বাংলার বাংলাকে নয় খোদ

স্ট্যাণ্ডার্ড বাংলাকে বর্জন করিয়া পশ্চিম-বাংলার কথ্য বাংলাকে সাহিত্যের ভাষা করিয়াছেন। শুধু গল্প-উপন্যাস সিনেমা-নাটকের পাত্র-পাত্রীর ডায়লগই নয়, স্বয়ং গল্পকারের ভাষাও এরা পশ্চিম-বাংলার কথ্য বাংলায় লিখিতেছেন। শুধু গল্প উপন্যাসও নয়। ধর্ম দর্শন ইতিহাস ও জীবনীর মতো গুরুগম্ভীর বিষয়ের প্রবন্ধগুলিও এঁরা পশ্চিম-বাংলার কথ্য ভাষায় লিখিতেছেন। পূর্ব-বাংলার প্রকাশিত মাসিক ত্রৈমাসিক ম্যাগাযিনগুলির সব প্রবন্ধই এই ভাষায় লেখা হইতেছে। একটি কাগযেও আর স্ট্যাণ্ডার্ড বাংলা-ভাষার লেখা বড় একটা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

মাসিকাদি সাহিত্যিক কাগযের লেখকরাই শুধু নয়, দৈনিক সাপ্তাহিকের ফিচার রাইটাররা পর্যন্ত এই সাহিত্যিক টেডিযম চালাইয়াছেন। একমাত্র ভরসা সাংবাদিকরা, মানে রিপোর্টাররা ও সম্পাদকীয় লেখকরা। কেবল মাত্র এঁরাই প্রবল প্রতিকূলতার মধ্যে সাহস করিয়া স্ট্যাণ্ডার্ড বাংলা চালাইয়া যাইতেছেন। কিন্তু আর কতদিন তাঁরা এই টেডিযমের বন্যার স্রোতের মুখে দাঁড়াইয়া এটা চালাইতে পারিবেন বলা কঠিন। কারণ সরকারী প্রচার দফতর হইতে প্রচারিত প্রেসনোট ফিচার ও নেতাদের বিবৃতি বক্তৃতাও ইদানীং এই টেডি ভাষায় লেখা শুরু হইয়াছে। মন্ত্রীদের ছাপা বক্তৃতা এবং রেডিও টকাদিও হইতেছে এই ভাষায়। সাহিত্যের এই টেডিযম এমন ফ্যাশানে পরিণত হইয়াছে যে বিদেশী দূতাবাস ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে প্রচারিত প্রচার-পত্র ও বিজ্ঞাপনাদিও এই ভাষায় চলিয়াছে। চলিবেই ত। ও-সবের রচয়িতাও যে আমাদের লেখক-সাহিত্যিকরাই। এই আধুনিকতার টেডিযম ও অন্ধ অনুকরণের ভ্যাণ্ডালিযম পূর্ব-বাংলার সাহিত্যিক সাংবাদিক ও সমগ্র ইন্টেলেকচুয়েল জীবনকে পশ্চিমবংগীকরণে প্রায় সফলকাম হইয়া উঠিয়াছে। এই ব্যাপারে আমরা রাজার চেয়ে বেশি রাজভক্ত হইয়া উঠিয়াছি।

ডাক্তার শহীদুল্লাহ ও মওলানা আকরাম খাঁ সাহেবের মতো পূর্ব-পাকিস্তানী মনীষীদের মধ্যে যাঁদের জন্ম-কর্ম শিক্ষা-দীক্ষা পশ্চিম-বাংলায়, তথাকার কথ্য বাংলায় লিখিবার ও বলিবার যোগ্যতা ও অধিকার যাঁদের আছে, তাঁরা যেখানে স্ট্যাণ্ডার্ড বাংলায় লিখিতেছেন, সেখানে পর্যন্ত আমাদের 'খাস বাংগাল' লেখক-সাহিত্যিকরা পশ্চিম-বাংলায় কথ্য বাংলা লিখিতেছেন।

শুধু কি তাই? খোদ পশ্চিম-বাংলার খ্যাতনামা লেখকরা যেখানে যেসব বিষয় স্ট্যাণ্ডার্ড বাংলায় লিখিতেছেন সেখানেও এবং যেসব বিষয়েও পূর্ব-পাকিস্তানীরা পশ্চিম-বাংলার কথ্য ভাষায় লিখিতেছেন। বোধ হয় দেখাইতে চান, তাঁরা পশ্চিম-বাংলার অনুসরণ করেন।

অন্ধ অনুকরণ

একটি অতিসাম্প্রতিক নযির দেই। ঢাকার একটি মাসিক কাগযের মাত্র সেদিনকার এক সংখ্যায় এক সাহিত্য-বিষয়ক প্রবন্ধে পূর্ব-বাংলার একজন লেখক পশ্চিম-বাংলার বর্তমান সময়ের একজন খ্যাতনামা লেখকের লেখার এই অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন : "তাঁহারা উপন্যাসে যে সমস্ত ঘাতপ্রতিঘাতের এবং মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার বর্ণনা করেন তাহাতে মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের পরিবর্তে কাব্যোচ্ছ্বাসেরই প্রাধান্য। বিশ্লেষণ যাহা কিছু আছে তাহা কবিত্ব সুষমায় রূপান্তরিত হইয়া কবির উচ্ছ্বসিত

www.pathagar.com

আবেগ ও গীতি ঝঙ্কার প্রকাশ করে।" এইখানে পশ্চিম-বাংলার লেখকদের কোটেশন শেষ। পণ্ডিত লেখকেরা যেমন বিদেশী কোটেশন দিয়া অল্প বিদ্যার পাঠকদের সুবিধার জন্য দেশী ভাষায় তার ব্যাখ্যা করেন, ঠিক তেমনি পূর্ব-বাংলার উক্ত প্রবন্ধের পশ্চিম বাংলার লেখকের উক্ত স্ট্যাণ্ডার্ড বাংলা কোটেশনের মর্মবাণী পূর্ব-বাংলার পাঠকদেরে বুঝাইবার জন্য নিম্নরূপ লিখিয়াছেন? "অর্থাৎ তিনি বলতে চেয়েছেন যে এদের লক্ষ্য যদিও মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ তবু তাঁরা তাঁদের উপন্যাসে বিশ্লেষণের বিজ্ঞান-সম্মত পথ ধরে অগ্রসর হননি। কাব্যিক ভাবানুষঙ্গিক প্রতিফলন ঘটিয়েছেন ইত্যাদি।" কোটেশন শেষ। পূর্ব-বাংলার পাঠক এই বার কথাটা বুঝিলেন ত? উভয় বাংলার স্ট্যাণ্ডার্ড ভাষায় লেখা পশ্চিম-বাংলার লেখকের লেখাটা পূর্ব-বাংলার লেখক পশ্চিম-বাংলার কথ্য ভাষায়, অবশ্য শুধু ক্রিয়াপদে, তর্জমা করিয়া কেমন পানির মতন তরল করিয়া কত সুন্দরভাবে আপনাদের বুঝাইয়া দিলেন।

এমনি করিয়া আমাদের আধুনিক লেখকরা আমরা বাংগালদেরে বিদগ্ধ করিবার আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছেন। তাঁদের ভাষাজ্ঞানের উত্তাপে আমরা দগ্ধ হইতেছি বটে, কিন্তু সংগে-সংগে বিদগ্ধও কিছুটা হইতেছি না কি? পশ্চিম-বাংলার বিদগ্ধ সমাজে আমরা বাংগালদেরে গ্রহণযোগ্য করিবার মহৎ উদ্দেশ্যে এঁরা আমাদের মুখের ভাষার চাষামিকে আর্য্যমিতে শুদ্ধি করিতেছেন। আমাদের গ্রাম-বাংলার জনগণের হরহামেশা এস্তেমাল করা মুসলিম ঐতিহ্যবাহী হাজার-হাজার লফ্‌যকে এঁরা ভাষা-শৈলীর শলার ঝাঁটায় ঝাঁটইয়া বই-পুস্তকের পৃষ্ঠা হইতে নিশ্চিহ্ন করিয়া মুছিয়া ফেলিতেছেন। তাদের বদলে ভদ্রলোকের ব্যবহৃত বিশুদ্ধ আর্য শব্দাবলীর প্রবর্তন করিতেছেন।

মুখ শুদ্ধিকরণ

এই সংস্কারকরা আমাদের চৌদ্দ পুরুষের মুখাগ্নি করিয়া তাঁদের মুখের খানাকে 'খাদ্য' গোশতকে 'মাংস' আণ্ডাকে 'ডিম' সালুনকে 'ব্যঞ্জন' সুরুয়াকে 'ঝোল' বরতনকে 'থাল' নওলা-লুকমাকে 'গ্রাস' করিয়া ফেলিয়াছেন। গোসলের বদলে এঁরা আমাদের স্নান করাইতেছেন। আমাদের বাড়ির বিলাইকে 'বিড়াল' কুত্তাকে 'কুকুর' আমাদের ঘরের চালের কাউয়াকে 'কাক' করিয়া ফেলিয়াছেন। আমাদের সমাজের আদব-কায়দা ও তমিয-লেহাযকে শিষ্টাচার বিনয়-নম্রতায় উন্নত করিয়াছেন। আমাদের 'মেহমানদেরে দাওয়াত' না করিয়া এঁরা 'অতিথিদের নিমন্ত্রণ' করিতেছেন। এত করিবার পরেও যাতে আমাদের কেউ বাংগাল বলিয়া চিনিয়া না ফেলে, সেই উদ্দেশ্যে এই সাহিত্যিকরা আমাদিগকে পশ্চিম-বাংলার ভাষিক বিকৃতি ও স্ল্যাংগুলিতে পর্যন্ত ট্রেনিং দিতেছেন। এই জন্যই তাঁরা লেখ্য স্ট্যাণ্ডার্ড এবং আমাদের কথ্য বাংলার তুলাকে 'তুলো' নেওয়াকে 'নেয়া' এমন কি আরবী উল্লাকে 'উল্লা' দেওয়ানকে 'দেয়ান' করিয়া ফেলিয়াছেন। রেডিও নিউয বুলেটিন হইতে একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। কর্তাদের সখের কথা বাংলাতেও যেখানে সহজেই বলা চলে : "আমাদের প্রধান মন্ত্রী আগামী এপ্রিল মাসে লণ্ডন যাবেন বলে আশা করা যায়", সেখানেও রেডিও পাকিস্তান বলিতেছেন; "আমাদের মুখ্যমন্ত্রী আগামী এপ্রিল মাসে লণ্ডন যাচ্ছেন বলে আশা করা যাচ্ছে।"

www.pathagar.com

কথ্য বনাম লেখ্য

বলিবার সময় কথ্য শব্দ ব্যবহার দরকার হইতে পারে। বলাও যাইতে পারে। কিন্তু লেখার সময় কেন? কথ্য ভাষা মানে পরস্পর সাক্ষাৎ বাক্যালাপ। সামনাসামনি আলাপে বক্তারা ও শ্রোতারা দুই পক্ষেই কথা বলে। সেটা হয় ডায়লগ। রেডিও ইত্যাদিতে আমরা যে 'টক' দেই তা 'টক' নয় পাঠ। রেডিও নিউয বুলেটিন যে 'বলা' হয় না 'পড়া' হয় এটা ঠিকই করা হয়। ওতে বক্তা-শ্রোতার মধ্যে ডায়লগ হয় না। শুধু বক্তার এক-তরফা কথা হয়। কাজেই টকের দোহাই দিয়া ও-সবে কথা (তাও আবার অন্য বাংলার কথা) ভাষা প্রয়োগের কোনও যুক্তি নাই। তবু ভদ্র হইবার আশায় তাও আমরা করি। এতেও আমরা মূঢ় বাংগালরা পুরাপুরি ভদ্রলোক নাও হইতে পারি। সে আশঙ্কা দূর করিবার জন্য এঁরা আমাদের সভাসমিতিতে শুধুমাত্র সভাপতিত্ব না করিয়া, এমন কি ঈদের জমাতে ইমামতি না করিয়া ঈদ-সমাবেশেও পৌরোহিত্য করিতেছেন। আমাদের আত্মীয়-বিয়োগে শোক প্রকাশ না করিয়া এঁরা স্মৃতিতর্পণ করিতেছেন। আমাদের বুঝিবার সুবিধার জন্য ম্যানেজারকে কর্মাধ্যক্ষ, গ্র্যাজুয়েটকে স্নাতক, আইন সভাকে বিধান সভা, গভর্নরকে প্রদেশপাল, চ্যান্সেলারকে আচার্য ও ভাইস চ্যান্সেলরকে উপাচার্য আখ্যা দিতেছেন। এখন প্রগতির পথে আরেকটু আগাইয়া হলের প্রভোস্টকে 'প্রকোষ্ঠের ভট্টাচার্য' এবং ইউনিয়ন কাউন্সিলকে 'মিলন সংঘ' করিয়া ফেলিলেই বাংগালরা সভ্য ও তাদের ভাষা শালীন হইয়া উঠিবে। তার আর বেশি দেরিও নাই।

আমাদের সাহিত্যিকরা একটা করিতেছেন যুগের দাবিতে আধুনিক হওয়ার তাগিদে। সাহিত্যকে যুগোপযোগী গণমুখী করিতে হইলে স্ট্যাণ্ডার্ড ভাষা ছাড়িয়া কথ্য ভাষায় লিখিতে হয়।

তাই তাঁরা কথ্য ভাষায় গণ-সাহিত্য রচিতেছেন। কিন্তু এঁরা ভুলিয়া গিয়াছেন যে শুধু ক্রিয়াপদ ও কতিপয় শব্দ কথ্য করিলেই সাহিত্য গণ-সাহিত্য হয় না; ভাষাও সরল প্রাঞ্জল গণ-ভাষা হয় না। জনগণের মুখের কথায় সোজা শব্দের সহজ প্রয়োগে সরল বাক্য রচনাই কেবল ভাষাকে গণ-ভাষা ও সাহিত্যকে গণ-সাহিত্য করিতে পারে। আবার সে কথ্য ক্রিয়াপদ ও শব্দগুলি যদি অন্যদেশের আঞ্চলিক বিকৃতি হয়, তবে বিপদ ও বিভ্রান্তির আর সীমা থাকে না।

এ সম্পর্কে খোদ পশ্চিম-বংগের ভাষা-বিজ্ঞানের অথরিটি ডা. সুনীতি চ্যাটার্জির মত এই : 'ভালর জন্যই হউক আর মন্দের জন্যই হউক উচিতই হউক আর অনুচিতই হউক ভাগীরথী নদীর সংলগ্ন স্থানের বিশেষত কলিকাতা অঞ্চলের ভদ্র সমাজের কথ্য ভাষা আজকাল সাহিত্যে ব্যবহৃত হইতেছে। এই ভাষা অঞ্চল বিশেষের মৌখিক ভাষা। ইহার ব্যাকরণ ও উচ্চারণ-রীতি সমগ্র বাঙ্গালার শিক্ষিত ব্যক্তিগণ ব্যবহারিকভাবে স্বীকার করিয়া লইলেও নিজ মাতৃভাষার ভাষাগত রিক্‌থ-হিসাবে উহার বিশেষত্বের অধিকারী হয় নাই। সে জন্য অবিসংবোদিতার্থ সাধু ভাষার রাজপথ ছাড়িয়া যাঁরা কলিকাতার আঞ্চলিক ভাষার পথে চলিতেছেন, অচেনা পথে চলার জন্য তাঁদের অনেকে এমন অনেক বিভ্রাট ঘটাইয়া থাকেন যাহা লেখক ও পাঠক উভয়ের পক্ষেই কষ্টকর। আজকালকার যে কোনও বাঙ্গালা দৈনিক সাপ্তাহিক মাসিক পত্রের অনেক লেখকের লেখা পড়িলেই এ কথা বেশ বুঝিতে পারা যায়।' ডা. চ্যাটার্জি পশ্চিম-

www.pathagar.com

বাংলার লেখকদের সম্বন্ধে যা বলিয়াছেন পাক-বাংলার লেখকদের সম্বন্ধে সে কথা আরও বেশি সত্য।

আমাদের কথা 'অকথ্য'

পূর্ব-বাংলার কথ্য ভাষা অশালীন। তাই আমরা পশ্চিম-বাংলার শালীন কথ্য ভাষায় পূর্ব-বাংলার জন্য গণমুখী সাহিত্য রচনা করিতেছি। যতদিন পূর্ব-বাংলার কথ্য ভাষা শালীন না হয়, ততদিন আমরা পশ্চিম-বাংলার কথ্য ভাষায় লিখিতে থাকিব।

পূর্ব-বাংলায় কথ্য ভাষাকে লেখকরা সাহিত্যে স্থান না দিলে শালীন হইবে কেমন করিয়া? এই প্রশ্ন করিবেন? এর উত্তর সোজা। অশালীন ভাষা কারও ফরমায়েশ-মতো শালীন সাহিত্যের ভাষা হয় না। সে জন্য দরকার প্রতিভাধরের জন্ম। পূর্ব-বাংলায় আগে যুগ-প্রবর্তক আর্ট-স্রষ্টার জন্ম হউক, তাঁর অগ্নি-ক্ষরা কলমের আগায় পূর্ব-বাংলার কথ্য ভাষা পশ্চিম-বাংলার ভাষার সাথে প্রতিযোগিতা করিয়া পরীক্ষায় পাশ করুক। তার পরে পূর্ব-বাংলার ভাষা সাহিত্যে স্থান পাইবে। তার আগে নয়।

কিন্তু ইতিমধ্যে আমরা সাহিত্যিকরা পশ্চিম-বাংলার প্রতিভাবান সাহিত্যিকদের সাথে প্রতিযোগিতা না করিয়াই, পশ্চিম-বাংলার উন্নত সাহিত্যের পরীক্ষায় পাশ না করিয়াই, বাংলা একাডেমি ও আদমজি-দাউদের সাহিত্য পুরস্কার নিতেছি এবং নিতে থাকিব। আমাদের পলিটিশিয়ানরাও ভারতীয় নেতাদের সহিত প্রতিযোগিতা না করিয়াই, ভারতীয় রাজনীতির পরীক্ষায় পাশ না করিয়াই, মন্ত্রী-মেম্বর হইতে থাকিবেন। আমাদের চাকুরিয়া শিক্ষক সওদাগর শিল্পপতি কাউকেই পশ্চিম-বাংলার বা ভারতের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিতে হইবে না। পাকিস্তান স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হওয়ার দাবিতেই তাঁরা ও-সব করিতে পারিবেন। শুধু মাত্র পূর্ব-বাংলার ভাষা ও সাহিত্যকেই পশ্চিম-বাংলার ও ভারতের সাথে প্রতিযোগিতার পরীক্ষায় পাশ করিতে হইবে। কি বিচার।

লজিকের সীমা

অতএব যতদিন তা না হয় ততদিন আমাদের সাহিত্যের ভাষা, আমাদের বাংলা একাডেমি ও ইসলামিক একাডেমির মুখপত্র সহ সমস্ত মাসিক-পত্রের ও দৈনিক খবরের কাগজের ফিচারের ভাষা হইবে পশ্চিম-বাংলার কথ্য ভাষা।

তা যদি উচিত হয়, তবে খানকতক দৈনিকের সম্পাদকীয় ও খবর সরবরাহের রিপোর্টিং-এ স্ট্যাণ্ডার্ড বাংলা চালাইবার আবশ্যকতা কি? যুক্তি কোথায়? ইউনিটি ফেইথ এণ্ড ডিসিপ্লিনের খাতিরে তাদেরও উচিত আধুনিকতার এই মিছিলে জিন্দাবাদ বলিয়া শামিল হইয়া পড়া।

আর অধ্যাপক-শিক্ষক ও পাঠ্য-পুস্তক-প্রকাশক-রচয়িতাদেরেও বলি, যে-ভাষা পূর্ব-বাংলার সাহিত্যে সাংবাদিকতায় চলিবে না, চাকুরি বাকুরিতে লাগিবে না, সেই প্রাচীন স্ট্যাণ্ডার্ড লেখ্য বাংলা আর ছাত্রদেরে পড়াইয়া আপনাদের নিজেদের সময় ও ছেলেমেয়েদের মাথা নষ্ট করিতেছেন কেন? আপনারাও অতঃপর ঐক্যের নামে পশ্চিম-বাংলার শালীন কথ্য ভাষায় পাঠ্য-পুস্তক ব্যাকরণাদি রচনা ও শিক্ষা দান শুরু করেন। ঐসব নয়া পুস্তক মফস্বলের ও পাড়াগাঁয়ের প্রাইমারি স্কুলের পাঠ্য করিয়া

www.pathagar.com

ফেলেন। ছাত্রদের ঠিকমত উচ্চারণ শিখাইবার জন্য পশ্চিম-বাংলা হইতে শিক্ষক আমদানি করুন। পাড়াগাঁয়ের শিশুরা পর্যন্ত পশ্চিম-বাংলার ভাষায় চিঠি-পত্র ও রচনা লিখিতে ও পড়িতে পারিবে।

শিশুদের বাপ-দাদারাও ঐ ভাষাতেই রেজিস্টারি আফিসের দলিল-তমসুক, আদালতের আরযি-দরখাস্ত, থানা-পুলিসে এযহার ও সভা-সমিতির প্রস্তাবাদি লিখিতে পারিবেন। পূর্ব-বাংলা অন্তত লেখা-পড়ায় পশ্চিম-বাংলা হইয়া যাইবে। আমরাও আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতি পশ্চিম-বাংলার হেফাযতে ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিত হইতে পারিব।

আত্ম-বিস্মৃতি

ঠাট্টা-তামাশা নয়। আমাদের অবস্থা সত্যই এই। কিন্তু কেন এমন হইল? কেন আমাদের তরুণ সাহিত্যিকদের মধ্যে এমন স্বকীয়তা-বিরোধী আত্ম-মর্যাদা-বোধহীন বিদেশী প্রবণতা দেখা দিল?

যে পূর্ব-বাংলার ভাষার সারা গায় মুসলিম তমদ্দুনের ছাপ, যে পূর্ব-বাংলার প্রচলিত যবানী গণ-ভাষার শতকরা ষাইটটার মতো লফ্য আরবী ফারসীমূলক শব্দ, কলিকাতার হিন্দু সাহিত্যরথীরা যে জনগণের ভাষাকে মুসলমানী বাংলা বা দুভাষী বাংলা বলিয়া সাহিত্যে স্থান দিতে অস্বীকার করিলেন, যে অন্যায় অস্বীকৃতিই মুসলিম-বাংলার ভাষিক সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য-বোধের জন্মদাতা, মুসলিম-বাংলার যে স্বাতন্ত্র্যবোধই শেষ পর্যন্ত পাকিস্তান হাসিলে রূপায়িত, সেই পূর্ব-বাংলার ভাষার প্রতি পাকিস্তানের খাঁটি সন্তান তরুণ সাহিত্যিকদের মনে এমন বিতৃষ্ণা এমন নফরত এমন হেকারত পয়দা হইল কেমন করিয়া? কেন তারা তাহযিব-তমদ্দুনের চেয়ে কৃষ্টি-সংস্কৃতিকে অধিক ভালবাসে? কেনই বা এরা দোআ-খায়ের অপেক্ষা আশীষ-আশীর্বাদ বেশি চায়? কেন তারা তারিফ-তাযিমের চেয়ে প্রশংসা-সম্মানের বেশি আকাঙ্ক্ষী? কেনই বা তাদের জিভে আণ্ডার চেয়ে ডিমে এবং গোশ্‌তের চেয়ে মাংসে এত বেশি স্বাদ লাগে?

বহুদিন গভীর চিন্তা করিয়াও এ-সব প্রশ্নের কোনো উত্তর পাই নাই। কিন্তু সেদিন বয়সে আমারও মরুব্বি একজন প্রবীণ সাহিত্যিক-রাজনীতিক এর একটা জবাব দিয়াছেন। তিনি বলেন, পূর্ব-বাংলার তরুণদের সংগত কারণেই উর্দু-ফোবিয়ায় পাইয়াছে। পাকিস্তানের রাষ্ট্র-নায়কদের উর্দুর দিকে অতি উৎসাহকেই তিনি ফোবিয়া সৃষ্টির জন্য দায়ী করেন। পূর্ব-বাংলার কথ্য ভাষায় আরবী ফারসী শব্দের প্রাচুর্য হেতু এ ভাষা উর্দুর কাছাকাছি। এই যুক্তিতেই নেতারা উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্র-ভাষা করার এবং অন্তত আরবী হরফে বাংলা লেখাইবার চেষ্টা করেন। এর ফলে আমাদের তরুণদের মনে স্বভাবতই এই ডর সান্ধাইয়াছে যে, যতদিন আমাদের ভাষায় আরবী-ফারসী শব্দের প্রাচুর্য থাকিবে, ততদিন উর্দুর হামলার সম্ভাবনা দূর হইবে না। তাই তরুণ সাহিত্যিকদের এই আরবী-ফারসী-বিরোধী অভিযান। তাঁর সুচিন্তিত মত এই যে, আমাদের তরুণদের সাম্প্রতিক রবীন্দ্র-ভক্তির আতিশয্য আসলে আমাদের ঘাড়ে ইকবাল চাপাইবার অশুভ চেষ্টার প্রতিবাদ ও প্রতিক্রিয়া মাত্র।

কিন্তু আমরা উভয়েই একমত হইয়াছিলাম, এ ডর অমূলক ও হাস্যকর। আরবী-ফারসী শব্দের প্রাচুর্য সত্ত্বেও যখন আমরা উর্দুর দুই-দুইটা হামলার সামনে টিকিয়া

www.pathagar.com

আছি, তখন ভবিষ্যতেও থাকিব। সে হামলার ভয়ে আমরা ঐতিহ্য বিসর্জন দিব না। বিশেষত আমাদের ছাত্র-তরুণরা বাংলার জন্য জান কোরবানি করিয়াছিল পশ্চিম-পাকিস্তানের ইকবালকে বাংলাদেশের মাথার উপর হইতে সরাইয়া পশ্চিম-বাংলার রবীন্দ্রনাথকে মাথায় বসাইবার জন্য নয়। তারা এটা করিয়াছিল বাংলাদেশের নিজস্ব ইকবাল-রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টির জন্য। তা ছাড়া মুখের ভাষায় আরবী-ফারসীর প্রাচুর্য যদি ঐ কারণেই বর্জন করিতে হয়, তবে ঐ যুক্তিতেই আমাদের সব মুসলমানের এবং সব কয়টা বাংলা দৈনিকের আরবী-ফারসী নাম বদলাইয়া রাখিতে হয় সংস্কৃত নাম।

পোশাকে গোলামি

এতক্ষণ ভাষার কথা বলিলাম। এইবার আসুন পোশাকের কথাটা আলোচনা করি। ভাষা ও সাহিত্যের মতই আমরা পোশাক-পাতিতেও নয়া জাতীয়তার উদ্দীপনার ও নয়া যিন্দেগি উপলব্ধির কোন প্রমাণ দিতেছি না।

আমাদের প্রেসিডেন্ট-মিনিস্টার হইতে শুরু করিয়া চুনাপুঁটি অফিসাররা পর্যন্ত, আইন সভাসমূহের স্পীকার-মেম্বর হইতে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ পর্যন্ত আদালতের জজ-ম্যাজিস্ট্রেট হইতে শুরু করিয়া উকিল-ব্যারিস্টার-মোখতার পর্যন্ত, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্সেলর হইতে শুরু করিয়া প্রফেসার-লেকচারার পর্যন্ত, শিল্প-বাণিজ্যের বড়কর্তা হইতে শুরু করিয়া কেরানিকুল পর্যন্ত সকলে, এক কথায় সারা পকিস্তানের গোটা সুধী সমাজই, আজও গোলামি যুগের বিদেশী পোশাকেই আমাদের লজ্জাহীন লজ্জা ঢাকিয়া বেড়াইতেছেন।

গুটিকতক 'পুরাতনপন্থী' লোক বাদে আর সবাই প্রগতির নামে ভূতপূর্ব মনিবদের তকমা আজও বহন করিতেছেন। তাঁরা পিঠে কোট চড়াইয়া ও গলায় টাই-এর দড়ি বাঁধিয়া নিজেদের আজাদির পিঠে বোঝা ও তাহযিব-তমদ্দুনের গলায় দড়ি দিতেছেন।

যেন গোলামি যুগের আগে পাকিস্তানবাসীদের কোন সভ্য শালীন পোশাক ছিল না। সভ্য পোশাকওয়ালা ইংরাজরাই যে ন্যাংটা পাকিস্তানবাসীকে সর্ব-প্রথম সভ্য পোশাক পরিতে শিখাইয়াছেন। যেন এই কারণে কৃতজ্ঞতাবশে ভক্তিভরে আমরা আযাদির ষোল বছর পরেও বরফের দেশের ইংরেজের মোটা পোশাকের তারি এবং দামী বস্তাটা পিঠে করিয়া বেড়াইতেছি।

দামের কথাটা যখন উঠিয়াই পড়িল তখন সেটাই আগে বলিয়া ফেলি। জামা-পাজামা লুংগি-পাঞ্জাবি কুর্তা-সদরিয়া ও আচকান-শির-ওয়ানিতে আজ আমাদের মন ওঠে না। তাই আমরা দশগুণ দামে কোট-প্যান্ট-টাই লাগাই। কোট-প্যান্ট-টাই এর সাথে মিশ খাওয়াতেই আমাদের তিনগুণ দামে শু কিনিতে হয়।

তাতে অবস্থা এই দাঁড়িইয়াছে যে যে-দেশের জনপ্রতি বার্ষিক আয় গড়ে একশ আশি টাকা, যে-দেশের জনগণ শীতাতপে শরীর রক্ষা ত দূরের কথা ছতর ঢাকিবার কাপড় পায় না, সেই দেশের নেতা ও সুধী সমাজের প্রত্যেকে একসেট পোশাক বানাইতে খরচ করেন সে বার্ষিক আয়ের তিনগুণ। এই লজ্জাকর অর্থনৈতিক বৈষম্যটাই আমাদের কর্তব্য নির্দেশের জন্য যথেষ্ট হওয়া উচিত ছিল।

তার উপর আছে জাতীয় আত্ম-মর্যাদার প্রশ্নটা। সরকারী মিটিং-কনফারেন্স, সামাজিক বৈঠক-মজলিস, আনন্দ-উৎসবের ক্লাবপার্টির কোথাও গিয়া আপনি

www.pathagar.com

বুঝিতেই পারিবেন না সমবেত ভদ্রলোকেরা পাকিস্তানেরই লোক। কার বাপের সাধ্য বলিবে এঁরাই ইসলামী রাষ্ট্র পাকিস্তানের ভাগ্য-নিয়ন্তা নাগরিক?

ছেলেরা সব টেডি হইয়া যাইতেছে বলিয়া বাপ-চাচা মুরুব্বিদের হায়-আফসোসের সীমা নাই। এঁরা নিজেরা যখন বিলাতী টেডিযম করিতে লজ্জা পান না, তখন তাঁদের ছেলেরা মার্কিন টেডিযম করিতে লজ্জা পাইবে কেন? যাঁরা নিজেরাই নিজস্বতায় বিশ্বাসী নন, তাঁদের ছেলেরা স্বকীয়তা পাইবে কোথায়?

এই সব কথাকে কেউ প্রাচীন-প্রীতি প্রগতি-বিরোধী নস্টালজিয়া মনে করিবেন না। প্রগতি-বিরোধী প্রাচীন পন্থী নস্টালজিক আমি নই। আমি ভয়ানক প্রগতিবাদী। অনেকের চেয়ে বেশি বিপ্লবী। আমাদের সুধী সমাজ ও তরুণরা প্রগতি ও বিপ্লবের পথে বেশি মাত্রায় আগাইয়া গিয়াছে, এটা আমার অভিযোগ নয়। বরঞ্চ আমার অভিযোগ, ষোল বছরের আযাদির জীবনে এরা এক পা অগ্রসর হয় নাই।

ষোল বছর আগে যেখানে তারা ছিল, আজো সেইখানেই আছে। গোলামির যুগে লণ্ডনে বসিয়া বিদেশী শাসকরা যে ভাষায় ও যে পোশাকে আমাদেরে শাসন করিতেন এবং শাসকদের অনুকরণে যে রাজপোশাক পরিয়া এবং যে রাজ-ভাষা বলিয়া আমরা গৌরব বোধ করিতাম, আযাদির আমলে ঢাকা-পিণ্ডিতে বসিয়া দেশী শাসকরা সেই পোশাকে সেই ভাষায় আমাদেরে শাসন করিতেছেন। পোশাকে ও ভাষায় আমরা আজও তেমনিভাবে রাজ-পুরুষদের অনুকরণেই গর্ববোধ করিতেছি।

সত্তুর কোটি চীনার নেতা চৌ-এন লাই নিজের জাতীয় পোশাক পরিয়া এবং চল্লিশ কোটি ভারতীয়ের নেতা নেহরু আমাদের পোশাক পরিয়া আমাদের দেশে আসেন। আর আমরা তাঁদেরে অভ্যর্থনা করি ইংরেজী পোশাক পরিয়া।

গোলামি সাহিত্য

আযাদি-পূর্ব কালে পূর্ব-বাংগালী লেখক-সাহিত্যিকরা পরাধীন পরিবেশের চাপে যে-ভাষায় যে-ধরনের সাহিত্য রচনা করিতেন, আযাদি যুগে মুসলিম-প্রধান ঢাকার মুক্ত আবহাওয়াও তাঁরা আগের মতই পরানুকরণে পরের ভাষায় গোলামি সাহিত্য রচনা করিয়া চলিয়াছেন।

অধিকন্তু স্বাধীনতা-প্রাপ্ত পশ্চিম বাংলা। তার নিজস্ব কৃষ্টি সাংস্কৃতিকে নিজস্ব ধারায় বিদ্যুৎ গতিতে আগাইয়া নিয়া চলিয়াছে। তাই দেখিয়া আমরা তাদের অনুকরণে তাদেরই পথে তাদেরই পিছনে ধাওয়া করিতেছি। না বুঝিয়া ছোট মুখে বড় গলায় বড়-বড় কথা আওড়াইতেছি। বলিতেছি সাহিত্য সার্বজনীন, আর্ট দেশ-কালের উর্ধে ইত্যাদি।

আমরা ভুলিয়া যাইতেছি, ওসব বড় কথার অর্থ দেশহীনতা নয়। দেশ ও কালের উর্ধে হাওয়ায় আর্ট সৃষ্টি হইতে পারে না। প্রগতিও আসিতে পারে না। যতই দক্ষ হউক, পরানুকরণ বিপ্লব বা প্রগতি নয়। প্রগতি বিপ্লব ও রেনেসাঁ কেবল স্বকীয়তার মধ্যেই সম্ভব। আমরা আজও তা বুঝি নাই। কি মনে কি চিন্তায় কি সাহিত্যে কি সংস্কৃতিতে কি দেহে কি পোশাকে কোথাও আযাদির হাওয়া আমাদেরে স্পর্শ করে নাই। ফলে আমাদের রাজনৈতিক দায়িত্ব পিণ্ডির উপর, পোশাক-নৈতিক কর্তব্য লণ্ডনের উপর এবং সাহিত্য-নৈতিক বিচারভার কলিকাতার উপর ছাড়িয়া দিয়া আমরা দিব্যি নিশ্চিন্তে বড় আরামে দিন কাটাইতেছি।

www.pathagar.com

ভাষা আন্দোলনের মর্মবাণী

এই সার্বজনীন পরকীয়তার পক্ষাঘাত হইতে আরোগ্য লাভই ভাষা আন্দোলনের মর্মবাণী। আমরা একটা জাতি। স্বকীয়তা আমাদের অধিকার ও দায়িত্ব। মুসলমান হওয়াটাই সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা নয়। পূর্ব-বাংগালী হওয়াটাই সংকীর্ণ আঞ্চলিকতা নয়।

আমাদের দেশ ও ধর্ম লইয়াই আমরা একটা জাতি। যে ভাষায় আমরা কথা কই, সে ভাষা নিজেই একটি জাতীয় ভাষা। আমরা নিজেরা যদি অসভ্য অভদ্র ও অশালীন না হই, তবে আমাদের মুখের ভাষা অসভ্য ও অশালীন হইতে পারে না। আমরা যেমন দেশের মাটি ত্যাগ করিতে পারি না, তেমনি মুখের ভাষাও ত্যাগ করিতে পারি না। দেশের মাটি আমাদের যতই শিল্পহীন অসুন্দর অনুর্বর হউক, বুদ্ধি-কৌশল ও শ্রমের দ্বারা তাকেই আমরা শিল্পায়িত সুন্দর ও উর্বর করিয়া তুলিব।

তেমনি আমাদের জাতীয় ভাষা যতই ক্রুটিপূর্ণ হউক, সংস্কার করিয়া তাকেই আমরা সভ্য জাতির যুগোপযোগী ভাষা করিয়া তুলিব। একটা স্বাধীন রাষ্ট্র চালাইবার যোগ্যতা যদি আমাদের মধ্যে থাকিয়া থাকে, তবে স্বাধীন জাতির সাহিত্য সৃষ্টি করিবার যোগ্যতাও আমাদের ভাষায় সুপ্ত রহিয়াছে। এই সুপ্ত অনুভূতির নিঃশব্দ তন্ত্রীতে ঝংকার সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই আমাদের ছাত্র-তরুণরা শহীদ হইয়াছিল। সে আত্মত্যাগকে ব্যর্থ হইতে আমরা দিতে পারি না।

সভ্য মানুষ হিসাবে আমরা প্রাচীন হইলেও নেশন হিসাবে আমরা তরুণ। শত-শত বৎসর ধরিয়া আমরা পরাধীনতার যিন্দানখানায় বন্দী ছিলাম। চলার কায়দা আমরা ভুলিয়া গিয়াছিলাম। সদ্যমুক্ত দায়মূলের কয়েদীর মতই আমরা প্রাথমিক জড়তায় ভুগিতেছি। এই জড়তা সাময়িক। এটা কাটিয়া যাওয়ার পর আমরা এতদিনের হারানো সময় উসুল করিবার জন্যই দুর্বার গতিতে আগাইয়া চলিব। যুগ-যুগ ধরিয়া আমাদের মুখের ভাষা অবরুদ্ধ ও অপাংক্তের ছিল। আজ আমরা মুক্ত-কণ্ঠ বটে, কিন্তু যুগ-যুগান্তরের অবরোধে গলা আমাদের আড়ষ্ট। এই প্রাথমিক আড়ষ্টতা কাটিবার পর আমাদের মুখের ভাষা সদ্য-পিঞ্জরা-মুক্ত পাখীর মতই নিজের সুরে গলা ফাটাইয়া গান করিয়া নীল আকাশে উড়িয়া ফিরিবে। বাঁধ-ভাংগা নিরুদ্ধ যৌবনের জোয়ারের স্রোত আমাদের জীবনের দুই কূল ছাপাইয়া গোটা জাতিকে প্রাণ-রসে প্লাবিত করিবে। সে রসে সঞ্জীবিত হইয়া আমাদের জীবনে বহু তরুলতা আবার ফুলে-ফলে মঞ্জরিত হইয়া উঠিবে। আমাদের দেশ হইয়া উঠিবে নিজস্ব তমদ্দুনে রঞ্জিত ও প্রাণবন্ত শিল্প-সাহিত্যের ফুলবাগিচা।

এইভাবে আমরা নতুন করিয়া নিজেদেরে এবং নিজেদের দেশকে চিনিতে পারিব। এটাই হইবে পূর্ব-বাংলার রি-ডিসকভারি। সেই দিন হইব আমরা জীবনের সকল ক্ষেত্রে স্বকীয়তায় প্রতিষ্ঠিত গর্বিত ও গৌরবান্বিত জাতি। পাকিস্তান হাসিলের ইহাই ছিল উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য রূপায়ণের পথনির্দেশই ভাষা আন্দোলনের মর্মকথা।

২১শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৪

www.pathagar.com

পাক-বাংলার রেনেসাঁ

মুখবন্ধ

হাজেরানে মজলিস,

পূর্ব-পাকিস্তানে রেনেসাঁ সম্মিলনীর এই পয়লা বৈঠকের মূল সভাপতি মনোনীত করে আপনারা আমাকে সরফরাজ করেছেন। সে জন্য আপনারা আমার শুকরিয়া জানবেন।

এ জলসা শুধু পূর্ব-পাকিস্তানের পয়লা বৈঠক নয়। এ ধরনের সম্মিলন সারা ভারতেও এই প্রথম। কাজেই এই সম্মিলনীর আদর্শ উদ্দেশ্য ও নিয়ত মকসেদ সম্বন্ধে শুরুতেই কিছু আরজ করা দরকার। এই সম্মিলনীর অভ্যর্থনা সমিতির সুযোগ্য সভাপতি সাহেব এ বিষয়ে অনেক কথাই বলে ফেলেছেন। তিনিই পূর্ব-পাকিস্তানের রেনেসাঁ সোসাইটীর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও প্রাণ। সুতরাং এ ব্যাপারে কথা বলবার অধিকার ও যোগ্যতা সবচেয়ে বেশি তাঁরই। তাঁর মুখে আপনারা যে সব মূল্যবান কথা শুনেছেন, সে-সব আমি আর দুহরাতে চাই না। আমি আর এক দিক থেকে দু'চারটি কথা আরজ কচ্ছি। পূর্ব-পাকিস্তান রেনেসাঁ সম্মিলনীর মর্ম কথা বুঝতে হলে আগে 'পাকিস্তান' ও 'রেনেসাঁ' দুটি কথারই তাৎপর্য গওর করে বুঝতে হবে।

পাকিস্তান কি?

পয়লা ধরা যাক 'পাকিস্তানের' কথা। 'পাকিস্তান' মুসলিম লীগের রাজনৈতিক দাবি। মুসলিম লীগই ভারতের জাতীয় প্রতিষ্ঠান ও মুখপাত। এ-কথায় যাঁদের সন্দেহ রয়েছে তাঁদেরও নিশ্চয়ই এটা জানা আছে যে, মুসলিম লীগ ছাড়া আর যে সব রাজনৈতিক দল মুসলমান সমাজে রয়েছেন তাঁরাও প্রকারান্তরে ও ভাষান্তরে পাকিস্তানেরই কথা বলছেন। সুতরাং পাকিস্তান দাবিকে নিঃসন্দেহে মুসলিম ভারতের রাষ্ট্রীয় আদর্শ বলা যেতে পারে। তবু এই পাকিস্তান নিয়ে রাজনীতিক মহলে তর্ক-বিতর্কের ও সীমা নেই; রাগারাগি গালাগালিরও অন্ত নেই। কিন্তু এ হল্লা অস্বাভাবিক নয়। কারণ এটা একটা নয়া কথা। নতুন যতই দরকারী ও স্বাভাবিক হোক, বিনা-প্রতিবাদে বিনা-হল্লায় কেউ কখনো তাকে গ্রহণ করেনি। মা যেমন করে দামালকের মধ্যে নয়া শিশু প্রসব করেন, জাতিও তেমনি দামালকের মধ্যে নয়া চিন্তা প্রসব করে। রাজনৈতিক মহলে আপনারা আজকার দিনে যে দামালকে দেখেছেন, আমরা সাহিত্যিকরা এটাকে তাই জননীর প্রসব বেদনার চীৎকার বলেই দার্শনিক নির্লিপ্ততায় গ্রহণ কচ্ছি।

www.pathagar.com

কারণ রাজনীতিকের বিচারে 'পাকিস্তানের' অর্থ যাই হোক না কেন, সাহিত্যের কাছে তার অর্থ তমদ্দুনী আজাদি, সাংস্কৃতিক স্বরাজ, কালচারাল অটনমি। রাজনৈতিক আযাদি ছাড়া কোন জাতি বাঁচতে পারে কি না সে প্রশ্নের জবাব পাবেন আপনারা রাষ্ট্র-নেতাদের কাছে। আমরা সাহিত্যিকরা শুধু এই কথাটাই বলতে পারি যে, তমদ্দুনী আযাদি ছাড়া কোনো সাহিত্য বাঁচতে পারা ত পরের কথা, জন্মাতেই পারে না।

রাজনৈতিক পাকিস্তান নিয়ে বাদ বিতণ্ডা এই জন্য যে, এতে হিন্দু ও মুসলমানকে এক রাজনৈতিক জাতি বলা হচ্ছে না। রাজনীতির ক্ষেত্রে হিন্দু ও মুসলমানরা আলাদা জাতি কি না, তা নিয়ে ত তর্কের অবকাশ আছে : কিন্তু সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তারা যে আলাদা জাত, এতে কোনো তর্কের জায়গা নেই। এই সম্মিলনীর তাহযিব-তমদ্দুন শাখার সভাপতির ভাষণ থেকে আপনারা তা ভাল করেই জানতে পারবেন। এ কথা মানি যে, হিন্দুর সংস্কৃতিতে ও মুসলমানের তমুদ্দুনে এক শ' একটা মিল রয়েছে। কিন্তু এটাও মানতে হবে যে, তাদের মধ্যে গরমিলও রয়েছে প্রচুর। এ কথা আপনারা সবাই জানেন যে, জীবে-জীবে, জাতিতে-জাতিতে, এমন কি ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতেও মিলটা সত্য নয়, গরমিলটাই সত্য। কারণ ঐটাই সত্তা। ঐটুকু দিয়েই এককে অন্য থেকে আলাদা করে চেনা যায়। 'আমি' ও 'তুমির' মধ্যে একশ' একটা মিল রয়েছে। তার তুলনায় গরমিলের সংখ্যা কত কম। তবু আমরা 'আমি' ও 'তুমি'র বিচার করি ঐ গরমিলটুকু দিয়েই, মিলটুকু দিয়ে নয়। এমন কি মানুষে পশুতেও গরমিলের চেয়ে মিলের সংখ্যাই কি বেশি নয়? তবু ঐ গরমিল টুকুকেই আমরা মানুষের বৈশিষ্ট্য বলে গর্ব করে থাকি।

কালচার‍্যাল অটনমি

সংস্কৃতির ব্যাপারটাও এই। শুধু হিন্দু-মুসলিমের নয়, তামাম দুনিয়ার সকল জাতির সংস্কৃতিই মূলত এক। তবু জাতিতে-জাতিতে সংস্কৃতিগত পার্থক্য কত সুস্পষ্ট। হরেক জাতির রাজনৈতিক আযাদি নিশ্চয়ই হবে অদূরাগত ভবিষ্যতের যুগবাণী। কিন্তু সে রাজনৈতিক স্বরাজের সার্থকতা হবে জাতির স্বকীয় নিরংকুশ বিকাশে। এই বিকাশের মর্মবাণী হচ্ছে তমদ্দুনী আযাদি বা কালচার‍্যাল অটনমি। এরই নাম পাকিস্তান। কৃষ্টিগত পর-সহিষ্ণুতা পাকিস্তানের বুনিয়াদ। "লাকুম দিনুকুম ওলিয়াদিন, তোমার ধর্ম তোমার আমার ধর্ম আমার" কোরানের এই উদার বাণীই পাকিস্তানের গোড়ার কথা।

ভারতের বুকে এ বাণী স্পন্দিত হয়েছে, ভারতের মাটিতেই এর পরখ হবে, এটা খুবই স্বাভাবিক হয়েছে। ভারতের হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই এক একটা গৌরবময় ঐতিহ্য ও মহান সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী। পদ্মফুল ও বসরাই গোলাপ যেমন করে একই বাগিচায় নিজ নিজ স্থানে প্রস্ফুটিত হতে পারে, ভারতের বুকেও তেমনি হিন্দু ও মুসলিম সংস্কৃতিকে নিজ নিজ স্বকীয়তায় বাড়তে দিতে হবে। যাঁরা অতীতে হিন্দু-মুসলিম-সংস্কৃতিকে ভেঙ্গেচুরে এক করতে চেয়েছেন, তাঁদের উদ্দেশ্যের সাধুতায় শ্রদ্ধা জানিয়েও আমরা বলতে বাধ্য, তাঁরা ঠিক কাজ করেন নি। ঠিক কাজ করেন নি এই জন্য যে, তাঁরা চেয়েছেন এই উভয় সংস্কৃতিকে তাদের প্রাণ-ধর্ম বা ফাণ্ডামেন্টাল থেকে বিচ্যুত করতে। তাঁরা প্রকৃতির বিরুদ্ধে চেষ্টা করেছেন বলেই যুগে যুগে সে চেষ্টা

www.pathagar.com

তাঁদের ব্যর্থ হয়েছে। ভারতীয় মনীষা তাকে নিজের ভ্রান্তি উপলব্ধি করতে পেরেছে বলেই আজ পাকিস্তানবাদের উদ্ভব হয়েছে।

অনেক বন্ধুর ধারণা, পাকিস্তান আন্দোলনটা প্রগতি-বিরোধী। কারণ এতে জোর দেওয়া হচ্ছে ধর্মোন্মাদনার দিকে এবং তাতে করে উপেক্ষা করা হচ্ছে বিজ্ঞান প্রগতি ও মুক্তবুদ্ধিকে। বন্ধুদের এ কথাটা শুধু যে স্থূলদর্শী ও অজ্ঞতা-প্রসূত তাই নয়, কথাটা অবৈজ্ঞানিকও বটে অনৈতিহাসিকও বটে। কারণ কোনো জাতি বা মানব গোষ্ঠীই নিজের সংস্কৃতিকে এড়িয়ে বা ডিঙিয়ে প্রগতির পথে এগুতে পারে না। যারা সে চেষ্টা করে, তারা অনুকরণ করে মাত্র, সৃষ্টি করে না। দুনিয়ার প্রগতিতে কোনো দান করতে তারা পারে না। অতএব সংস্কৃতিই হচ্ছে সকল জাতির জীবন সাধনার বুনিয়াদ। আর এই সংস্কৃতি হচ্ছে ধর্ম-বীজেরই ফুলে-ফুলে-মঞ্জরিত জীবন্ত গাছ। কিন্তু ঐ তথাকথিত প্রগতিবাদী বন্ধুরা কথাটা সহজে বুঝতে চান না। তাঁরা বলেন, বিজ্ঞানের প্রসারের দ্বারা মানব-মন যতই বিকশিত হবে, ধর্মীয় বাধা-বন্ধ ও সীমা-সরহদ্দ ভেঙে ততই মানব এক-ধর্মী হয়ে যাবে। তারা তখন স্থানীয় ও জাতীয় ধর্ম ছেড়ে এক উদার ডগ্‌মাহীন আন্তর্জাতিক ধর্ম গ্রহণ করবে। সে ধর্মের নাম হবে হিউম্যানিযম।

ইউনিফর্মিটি নয় বৈচিত্র্য

কথাটা নতুন নয়, অসাধারণও নয়। যাঁরা মানুষের প্রাণ-ধর্মে বিশ্বাসী নন যাঁরা যন্ত্র-ধর্মে বিশ্বাসী, তাঁরাই মানুষের মধ্যে এই যান্ত্রিক ইউনিফর্মিটি আনতে চান। অনেক দেশে অনেক জাতিতে এ মতবাদের পরখ হয়েছে। ইউরোপের পরখটা ত মাত্র সে দিনকার কথা। মধ্যযুগীয় ধর্মান্ধতার গোঁড়ামির বিরুদ্ধে তৎকালের চিন্তা-নায়করা যে বিদ্রোহ করেছিলেন, তা হিউম্যানিযম নামক নয়া ধর্মের রূপ গ্রহণ করেছিল। কিন্তু তা বেশীদিন টেকে নি। টেকে নি এই জন্য যে, ওটা স্বাভাবিক নয়। বাস্তবমানব-জীবনের সংগেও মতবাদের কোন যোগ নেই। তাই পণ্ডিতেভরা ইউরোপের বুকেও আজ ঐ মতবাদের প্রসার নেই। আলডুয়াস হাকসলি প্রমুখ জন কতক সাহিত্যিক আজো হিউম্যানিযমের গান গাইছেন বটে, কিন্তু সে গান জোরালো জীবন্ত কোরাস গান নয়, ওটা গতাসুপ্রায় ক্ষীণ কণ্ঠের বহদূর-নিসৃত সোলোর রেশ মাত্র। বস্তুত প্রাণ-ধর্মই জীবন ধর্ম; যান্ত্রিক ঐক্য বা মিকানিক্যাল ইউনিফরমিটি জীবন-ধর্ম নয়। তাই শুধু ইউনিফরর্মিটি দিয়ে ধর্মের প্রাণ যাচাই করা চলে না শুধু দুনিয়ার লাভ-লোকসান দিয়ে ধর্মের বিচার করলে সেটা আর ধর্ম থাকে না, তা হয়ে দাঁড়ায় ব্যবসাদারি। শুধু শরীর দিয়ে ধর্মের বিচার করলেও ধর্ম হয়ে দাঁড়ায় প্যাগানিযম। তা যদি হয়, তবে সে ধর্মের তত্ত্বজ্ঞান বা মেটাফিযিক্স শুভংকেরীর আর্যার কাছে হয় পরাজিত। মানুষ যতই স্বার্থপর ক্ষুধাতুর হোক, তার দৈহিক প্রয়োজন যতই দুর্বার হোক, তার কলেকটিভ মন ও সমষ্টিগত সত্তা আত্মার দৈন্য ও শূন্যতা বেশি দিন বরদাশ্‌ত করতে পারে না। কারণ মানুষ আর যাই হোক, একটা যন্ত্র। তার একটা প্রাণ আছে।

সোজা কথায় সমস্ত দুনিয়ার জীব-জন্তু ও গাছ-পালার জন্য যেমন একই মাটি একই আবহাওয়ার ব্যবস্থা করা যেতে পারে না, তেমনি সমস্ত দুনিয়ার মানুষের জন্যও একই ধর্ম ও একই সংস্কৃতির ব্যবস্থা দেওয়া যেতে পারে না। কাজেই কালক্রমে সমস্ত সংস্কৃতির আইল ভেঙে একই সংস্কৃতির বিশ্বজোড়া মাঠ তৈরি হবে, এ আশা যাঁরা

www.pathagar.com

কচ্ছেন, তাঁরা প্রকৃতি ও বিজ্ঞানকেই অস্বীকার কচ্ছেন। কাজেই এ বাণী ভবিষ্যৎ বিশ্বের বাণী হতে পারে না। যদি তেমন চেষ্টা হয় তবে সেটা হবে কালচার‍্যাল ফ্যাশিযম বা তমদ্দুনী যুলুমবাযি তার চেয়ে বরঞ্চ বিভিন্ন অঞ্চল ও আবহাওয়ার মানবগোষ্ঠী নিজ-নিজ ধর্ম ও সংস্কৃতির বুনিয়াদে আত্মবিকাশ করবে; প্রগতি ও কল্যাণের পথে হবে তাদের ভেতর সুন্দর ও সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা; খোদার বিচিত্র দুনিয়ায় রচিত হবে কল্যাণমুখী বৈচিত্র্যের এক বাগিচা : এইটাই ত সহজ, এই ত স্বাভাবিক; এই ত বৈজ্ঞানিক সত্য।

রাষ্ট্র-দর্শন নয় জীবন-দর্শন

সুতরাং পাকিস্তান রাষ্ট্র-দর্শনের কথা নয়; এটা জীবন-দর্শনের কথা। পাকিস্তান শুধু মুসলমানের জীবন-বাণী নয়; শুধু ভারতের হিন্দু-মুসলিমেরও বাণী নয়। পাকিস্তান সারা দুনিয়ার অদূরাগত ভবিষ্যতের বাণী।

এইবার আসুন পূর্ব-পাকিস্তানে। ভারতের হিন্দু ও মুসলমানরা এক জাতি নয়। তাদের সংস্কৃতিও এক নয়। এটা বেশ বোঝা গেল। কিন্তু হিন্দুরা বা মুসলমানরাই কি নিজেরা এক-একটা আস্ত জাতি? অথবা তাদের সংস্কৃতি এক-একটা আস্ত কৃষ্টি? তা' নয়। আরবী তুর্কী ফারসী আফগানরা একই মুসলমান হয়েও এক জাতি নয়। ইংরাজ ফারসী ইতালীয় জার্মান একই খৃষ্টান হয়েও এক জাতি নয়। এদের ধর্ম এক হলেও তমদ্দুন এক নয়। গাছ ও বীজের মধ্যে যা সম্পর্ক, ধর্ম সংস্কৃতির সম্পর্ক তাই। ধর্ম থেকেই সংস্কৃতির জন্ম। বীজ থেকেই গাছের জন্ম। আবার গাছের মধ্যেও বীজ রয়েছে। সংস্কৃতির মধ্যেও ধর্ম লুকিয়ে আছে। তবু গাছ ও বীজ এক নয়। ধর্ম ও সংস্কৃতি এক জিনিস নয়। ধর্ম ভূগোলের সীমা ছাপিয়ে উঠতে পারে। কিন্তু তমদ্দুন ভূগোলের সীমা এড়াতে পারে না। বরঞ্চ সে সীমাকে আশ্রয় করেই সংস্কৃতির পয়দায়েশ ও সমৃদ্ধি।

এইখানেই পূর্ব ও পশ্চিম-পাকিস্তানের সরহদ্দ। এই খানেই পূর্ব-পাকিস্তান একটা ভৌগোলিক সত্তা। এই জন্যই পূর্ব-পাকিস্তানের বাশিন্দারা ভারতের অন্যান্য জাত থেকে এবং পশ্চিম-পাকিস্তানের ধর্মীয় ভ্রাতাদের থেকে একটা স্বতন্ত্র আলাহিদা জাত। ইতিহাস শাখার সভাপতির ভাষণে এই দিকটার সুন্দর আলোচনা আপনারা দেখতে পাবেন।

পূর্ব-পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি তাই পূর্ব-পাকিস্তানেরই রেনেসাঁ আনতে চায়। পূর্ব-পাকিস্তান একটি ভৌগোলিক ইউনিট। কিন্তু সাহিত্যিকের চোখে, বিপ্লবীর বিচারে, মানুষ ছাড়া ভূগোলের কোনো আলাদা সত্তা নেই। তাই রেনেসাঁ সোসাইটি পূর্ব-পাকিস্তান বলতে এই ইউনিটের বাশেন্দাদেরেই বুঝে থাকে। সোসাইটি তাই ভূগোলের নয় মানুষের রেনেসাঁ আনতে চায়।

রেনেসাঁ কি?

এখন প্রশ্ন উঠে রেনেসাঁ কাকে বলে? জাতির মরা হাড়ে জীবনের বিদ্যুৎ চমকানোকেই আমরা এক কথায় রেনেসাঁ বলে থাকি। রাষ্ট্রে-সমাজে শিল্পে-সাহিত্যে ব্যবসা-বাণিজ্যে, এক কথায় জীবনের সকল স্তরে, বিপ্লব আনার নাম রেনেসাঁ। অনেক

www.pathagar.com

বন্ধু বলছেন : বিপ্লব আনবে, তবে রিভলিউশন বলছো না কেন? কেউ কেউ আবার বলছেন : জাতিকে জাগাবে, ত রিফরমেশন বা রিভাইভ্যাল নাম না রেখে সোসাইটির নাম রেনেসাঁ রাখলে কেন?

এর উত্তর খুবই সোজা। পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটির নাম রিভলিউশন সোসাইটি' হয় নি এইজন্য যে, রিভলিউশন দ্বারা আমরা সাধারণত : রাষ্ট্র-বিপব বুঝে থাকি। কিন্তু আমরা সাহিত্যিক, রাষ্ট্রনেতা আমরা নই। কাজেই আমরা শুধু রাষ্ট্র-বিপ্লবে সন্তুষ্ট হতে পারি না। আমরা চাই জাতির সর্বাঙ্গীন বিপ্লব। আর সে বিপ্লব হবে জনগণের কল্যাণে রূপায়িত। শুধু রাষ্ট্র-রূপের পরিবর্তনে অথবা রাষ্ট্র-নেতার হাতফেরিতে পর্যবসিত হবে না সে বিপ্লব। রিভলিউশনে যে রাষ্ট্র রূপায়ণ হবে, তাতে গণকল্যাণ হতেও পারে, নাও হতে পারে। তাতে বিপ্লবীরও জয় হতে পারে, আবার প্রতি-বিপ্লবীরও জয় হতে পারে। কিন্তু রেনেসাঁর পথে যে সর্বাঙ্গীন জয়লাভ হবে, তাতে এ ডিক্টেটর বা ও ডিক্টেটরের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে না; প্রতিষ্ঠিত হবে এক আল্লার রাজত্ব। সে রাষ্ট্রে তখন এ-শাসক ও-শাসিত বলে কেউ থাকবে না, সবাই হবে স্বরাট; সকলে হবে সমান। সে রাজ্যে এ ধনিক আর ও-শ্রমিক বলে কেউ থাকবে না সব ধনের মালিক হবেন আল্লাহ। আর আল্লার ধনের সমান ভোগী হবে তার সকল বান্দা। এ জন্য রেনেসাঁ সোসাইটি রিভলিউশনের চেয়ে রেনেসাঁয় বেশি বিশ্বাসী।

রিফরমেশন নয় কেন?

তারপর রিফরমেশন নয় কেন? রিফরমেশন ধর্মীয় সংস্কারের কথা। আমরা মুসলমান। ইসলাম আমাদের ধর্ম। ধর্ম আমাদের দীনে-মোকামে। কোন রিফরমেশনের এতে দরকার নেই; কোন সংস্কারের এতে গুঞ্জায়েশ নেই। ইউরোপে রিফরমেশনের দরকার পড়েছিল। কারণ খৃষ্ট-ধর্ম সেখানে স্বরূপ হারিয়ে গোঁড়া কুসংস্কারে পরিণত হয়েছিল। আমাদের ইসলামে তা হয়নি, এর চারপাশে অনেক আগাছা-আবর্জনা জন্ম নিয়েছে সত্য, কিন্তু কালের বিবর্তন ভূগোলের পরিবর্তন রাজার রাজদণ্ড কিছুই ইসলামকে তার স্বকীয়তা থেকে হটাতে পারে নি। কাজেই আমাদের ধর্ম-সংস্কার বা রিফরমেশনের দরকার নেই।

তারপর ধরুন, রিভাইভ্যালিযমের কথা। রিভাইভ্যলিযমটা হচ্ছে ফিরে চলার' ডাক, 'গোয়িং ব্যাকের আবাহন। আমরা কোথায় ফিরে যাব? দিল্লী-আগ্রার তখতে-তাউসেও ফিরে যেতে পারবো না, বাগদাদ-দামেশকের খেলাফতেও ফিরে যাওয়া চলবে না। সে আশা হবে বাতুলতা, আর সে চেষ্টা হবে আত্মঘাতী। আমরা জ্ঞান বিজ্ঞানকে ফাঁকি দিতে পারবো না। প্রগতিকে এড়িয়ে যেতে পারবো না। সেটা হবে আত্মহত্যারই শামিল।

বিগত গৌরবের যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞানের আবিষ্কর্তারূপে মুসলমান ছিল দুনিয়ার শিক্ষক। শিল্প-বাণিজ্যে ছিল তারা বিশ্বের নেতা। প্রগতির ছিল তারা অগ্রপথিক। এ যুগে আমাদের সে গৌরবের পথে ফিরে যেতে হলে, সে নেতৃত্বের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হলে আমাদের চলতে হবে যুগের আগে-আগে। প্রগতি থেকে মুখ ফিরিয়ে পিছন দিকে রওয়ানা হলে চলবে না। কাজেই রিভাইভ্যালিযম বা 'ফিরে চলোর' ডাক আমাদের আদর্শ হতে পারে না।

www.pathagar.com

পূর্ব-পাকিস্তানের জাগরণের জন্য তাই রেনেসাঁ অপরিহার্য। এটা আমরা বুঝতে পারি ইউরোপের রেনেসাঁর বিচার করলে। ইউরোপীয় রেনেসাঁর প্রাক্কালে তথাকার খৃষ্টান জাতিসমূহের যে দুরবস্থা হয়েছিল, পূর্ব-পাকিস্তানের বাশিন্দাদেরও আজ ঠিক সেই দুরবস্থা।

ইউরোপের রেনেসাঁ

ইউরোপে রেনেসাঁ শুরু হয়েছিল কখন? খৃষ্টীয় পনর শতকে। ইউরোপ তখন জীবনের সকল ক্ষেত্রে মুসলমানদের হাতে পর্যুদস্ত ও বিপর্যস্ত। দু'শ বছরের জেহাদে সারা ইউরোপের সমবেত খৃষ্টান রাজ শক্তি মুসলিম রাষ্ট্র শক্তিরা হাতে পরাজিত। পোপের আধিপত্য ও রোমক সাম্রাজ্য লণ্ড-ভণ্ড। বিশ্বব্যাপী খৃষ্টাধিপত্য স্থাপনের স্বপ্ন চুরমার। জ্ঞানে-বিজ্ঞানে শিল্পে-সাহিত্যে ব্যবসা-বাণিজ্যে খৃষ্টান-জগৎ তখন মুসলিম-জগতের অনুসারী ও অনুগ্রহ-ভিখারী। অশিক্ষা কুসংস্কার আত্মকলহ ও গৃহ-বিবাদে খৃষ্টান ইউরোপ তখন ছিন্ন-ভিন্ন। এই চরম বিপদের দিনে মুসলিম শক্তি খৃষ্টান ইউরোপের শিরে কঠোর আঘাত হানলো কনস্টান্টিনোপল দখল করে। রোমের সম্রাটরা এই কনস্টান্টিনোপলকেই রাজধানী করে সারা ইউরোপ ও এশিয়ার উপর রাজদণ্ড চালাবেন বলে পরিকল্পনা রচনা করে আসছিলেন। ১৪৫৩ খৃষ্টীয় সনে এই কনস্টান্টিনোপলই দখল করে নিল মুসলমানরা। খৃষ্টান সম্রাটদের সাধের কনস্টান্টিনোপল তাঁদের চোখের সামনে রূপান্তরিত হল ইসলামী রঙে-রঞ্জিত কস্তুনতুনিয়ায় ও ইস্তাম্বুলে। এই চরম আঘাত ক্লান্ত অলস ও তন্দ্রাগ্রস্ত খৃষ্টান-মনে যে তীব্র বেত্রাঘাত হানলো, তার প্রতিক্রিয়া নিয়ে এল খৃষ্টান-বুকে অফুরন্ত যৌবন জোয়ার। এই দিন থেকে শুরু হল তার রেনেসাঁ।

ইতালিতেই এ রেনেসাঁ শুরু হল স্বভাবতই। ১৪৪৪ সাল থেকে ১৪৯২ সাল তক এই পঞ্চাশ বছর একা ইতালীই খৃষ্টান ইউরোপের নওজোয়ানির পতাকা বহন করে আসছিলো। তারপর ঐ সালে অষ্টম চার্লস নেপলস আক্রমণ করে ইতালির দরজা খুলে দিলেন ফরাসী-জার্মান স্পেনিয়ার্ড-পর্তুগাল ও ইংরাজ-ওলন্দাজ সকলের জন্য। ঐ দিন থেকে ইতালির অর্দ্ধশতকের রেনেসাঁ-সাধনার স্ফুলিঙ্গ বিচ্ছুরিত হতে লাগলো সারা ইউরোপে। সমগ্র খৃষ্টান-জগৎ নব জাগরণের গানে মুখরিত হল। অভ্যুত্থানের কাজে তারা মেতে উঠলো।

এ সাধনা চললো প্রায় একশ' বছর। তার ফলে দেখা দিল আধুনিক যুগ। সমগ্র ইউরোপের রং-চেহারা গেল একদম বদলে। দেখ-দেখ করে খৃষ্টান ইউরোপ হয়ে উঠলো সারা দুনিয়ার নায়ক শাসক ও শোষক, ফেণ্ড ফিলসফার এণ্ড গাইড। যে ইতালীয় শিল্প, জার্মান বিজ্ঞান, স্পেনীয় নৌবহর, ফরাসী ও ইংরাজী সাহিত্য ইউরোপকে দুনিয়ার বাদশা বানিয়ে দিল, তা এই রেনেসাঁরই সৃষ্টি।

তবেই দেখা যাচ্ছে যে, মধ্য যুগের আঁধার থেকে মডার্ণ এজের আলোতে আসার যে আধো-আলো-আধো-আঁধার পথটুকু ইউরোপের বেলা তারই নাম রেনেসাঁর যুগ। এ রেনেসাঁর কোনো সজ্ঞো দেবার চেষ্টা বৃথা। একে শুধু বিশ্লেষণ করা যেতে পারে, এই বলে যে, অতীতের সংস্কার মোহ এবং তজ্জনিত দুর্বলতা কাটিয়ে উঠবার যে প্রবল বাসনা নও-জোয়ানির উন্মাদনায় রূপায়িত হয়, সেই নব উদ্‌গত কর্মোন্মাদনার নাম

www.pathagar.com

রেনেসাঁ। নতুন দৃষ্টিতে আল্লার দুনিয়াকে দেখা, তাঁর সৃষ্টি-রহস্যে কুদরতের সূর্য-কিরণে নিজেদের কুসংস্কারের জোনাকীর ঝিকিমিকি ভুলে যাওয়ার নামই মনের রেনেসাঁ। মনের রেনেসাঁ একবার এসে পড়লে কর্মের রেনেসাঁ আপনি আসতে বাধ্য। জীবনমৃত লাঞ্ছিত কোণ্-ঠাসা খৃষ্টান-জগৎ এই রেনেসাঁর পথেই আজ দুনিয়ার নেতা হয়েছে।

আমাদের অবস্থা

পূর্ব-পাকিস্তানের মুসলিম জাতিকেও অমনি করে রেনেসাঁর পথেই নওজোয়ানি লাভ করতে হবে। পনর শতকের খৃষ্টান ইউরোপের সঙ্গে পূর্ব-পাকিস্তানের মুসলিম জাতির আজিকার দুর্দশার তুলনা করুন। আঠারো শতকে এরাই বাংলার শাসক নায়ক, ফ্রেণ্ড ফিলসফার এণ্ড গাইড। বাংলার শিল্প-সাহিত্য তাহযিব তমদ্দুন ব্যবসা-বাণিজ্য শাসন-পালন সবই এদের হাতে। হঠাৎ একদিন পলাশীর ময়দানে এদের বিশ্বজয়ী শাণিত তলওয়ার বেইমানী ও জালজুয়াচুরির মুখে ভোঁতা হয়ে গেল। বিশ্বাসঘাতকতায় রাজ্য গেল, ভাষা পরিবর্তনে চাকুরী গেল, বাজেয়াফতিতে জমিদারি গেল, পোশাক পরিবর্তনে খান্দানির গৌরবটুকুরও অবসান হল। আগের দিনের বাদশা পরের দিনের পথের ফকির হল। গত কালের পণ্ডিত আজকার মূর্খ বনে গেল। বহু যুগের খান্দানী ভদ্রলোক এক রাত্রে 'চাষী ছোট লোক' হয়ে গেল। শিক্ষা-সভ্যতায় শিল্প-সাহিত্যে ব্যবসা-বাণিজ্যে সিনেমা-থিয়েটারে, সভা-সমিতিতে কোথাও আজ তাদের দেখা পাবেন না। রাজ দরবারে তাদের স্থান নেই। তাদের ভিড় দেখুন গে কাদা-নর্দমায়, নদী-নালায়। তাদের কাতার দেখুন গে জমিদারের কাছারীতে, মহাজনের আঙিনায়। তাদের মিছিল দেখুন গে শহর-বন্দরের ফুটপাথে। কুসংস্কারে তারা আকণ্ঠ নিমজ্জিত, আত্মকলহে তারা ছিন্ন-বিছিন্ন। নিজের শক্তি ও গৌরব এদের অজ্ঞাত। নিজের অধিকারে এরা উদাসীন। এদের সংখ্যা চারি কোটি। সমগ্র ইংলণ্ড ফ্রান্সের সমান।

মুক্তির পথ

এই বঞ্চিত লাঞ্ছিত আত্ম-ভোলা জাতকে বাঁচাবেন আপনারা দু'চারটা চাকরি দিয়ে? দু'চারটা স্কুল-কলেজ খুলে? আইন সভায় দু' দশটা প্রস্তাব পাশ করে? তা হয় না। এদের মুক্তি এদের আযাদি আনতে হলে চাই সর্বগ্রাসী বিপ্লব। সে বিপ্লবের আগুনে জুলুম ও বেইনসাফির সমস্ত জঞ্জাল-আবর্জনাকে নিঃশেষে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। কচুরিপানা পোড়াতে গেলেও ধান-টানও কিছু পোড়া যায় নিশ্চয়। তেমনি রেনেসাঁর দহন আগুনে সামাজিক অবিচার জুলুমের জঞ্জাল পোড়াতে গেলেও থোড়া-বহুত ভাল জিনিসও পোড়া যাবে নিশ্চয়। ভূতুড়ে বাড়ী ভেঙে নয়া বাড়ী তৈরি করতে গেলে অমন কিছু থোড়া-বহুত ভাল জিনিসেরও মায়া আমাদের কাটাতে হবে।

তবেই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে পূর্ব-পাকিস্তানের আযাদির জন্য রেনেসাঁর পথে যাওয়া ছাড়া আমাদের গত্যন্তর নেই। এটাও আপনারা বুঝতে পাচ্ছেন যে, রেনেসাঁ একটা তামাশার কথা নয়। এটা জাতীয় জীবনের একটা গুরুতর নৈতিক সাধনার বস্তু।

www.pathagar.com

একটা সর্বজনীন কর্মোন্মাদনার ব্যাপার। জাতীয় নওজোয়ানির পাহাড় ভাঙা পর্বত ডিঙানো দৃঢ় সংকল্পের রূপায়ন।

এটা কেমন করে ঘটতে পারে? কথায় কথায় যাঁরা বিপ্লবের বুলি আওড়ান, দুর্ভাগ্যবশত তাঁরা মানব-মনের রহস্য উপেক্ষা করে থাকেন। বিপ্লবের ইতিহাসও তাঁরা ভুলে যান। চিন্তার রাজ্যে জাতির কলেকটিভ মনে বিপ্লব না এলে কর্মে বিপ্লব আসতে পারে না। চিন্তায় বিপ্লব আনবার দায়িত্ব করি-সাহিত্যিকের। ফরাসী-বিপ্লব প্রভৃতি সত্যিকার বিপ্লবের দিকে নজর দিলেই আমরা এটা দেখতে পাই। রুশো-ভল্টেয়ার টলস্টয়-টুর্গেনিভ গোর্কি-ডস্টয়ভস্কি চিন্তার ক্ষেত্রে বিপ্লবের আগুন না ছড়ানো পর্যন্ত কর্মে বিপ্লব কেউ আনতে পারেননি।

আগে চাই সাহিত্যিক বিপ্লব

পাকিস্তানও একটা বিপ্লব। এ বিপ্লব আনতে হলে সাহিত্যের ভেতর দিয়েই তা করতে হবে। কিন্তু কোথায় পাকিস্তানের সাহিত্য? এ দিককার আলোচনা সাহিতে-শাখার সুযোগ্য সভাপতির ভাষণে শুনতে পাবেন। আমি শুধু প্রসঙ্গত মুখতসরভাবে এ বিষয়ে কয়েকটা ব্যাপারের দিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবো।

পূর্ব-পাকিস্তান অর্থাৎ বাঙলা ও আসামের সাহিত্য বলতে আজ আমরা যা বুঝি তা বিদ্যাসাগর-বঙ্কিমচন্দ্র থেকে রবীন্দ্র-শরৎচন্দ্র যুগের সাহিত্যিকদের সাহিত্য। এটা খুবই উন্নত সাহিত্য। বিশেষত রবীন্দ্রনাথ এ সাহিত্যকে বিশ্ব-সাহিত্যের দরবারে স্থান দিয়েগেছেন।

তবু এ সাহিত্য পূর্ব-পাকিস্তানের সাহিত্য নয়। কারণ এটা বাঙলার মুসলমানের সাহিত্য নয়। এ-সাহিত্যে মুসলমানদের উল্লেখযোগ্য কোনো দান নেই শুধু তা নয়, মুসলমানদের প্রতিও এ-সাহিত্যের কোনো দান নেই। অর্থাৎ এ-সাহিত্য থেকে মুসলিম সমাজ কোনো প্রেরণা পায়নি এবং পাচ্ছে না। এর কারণ আছে। সে কারণ এই যে এ-সাহিত্যের স্রষ্টাও মুসলমান নয়; এর বিষয়-বস্তুও মুসলমান নয়। এর স্পিরিটও মুসলমান নয়; এর ভাষাও মুসলমানের ভাষা নয়।

প্রথমত এ-সাহিত্যের স্পিরিটের কথাই ধরা যাক। এ সাহিত্য হিন্দু-মনীষীর সৃষ্টি। সুতরাং স্বভাবতই হিন্দু সংস্কৃতিকে বুনিয়াদ করেই তাঁরা সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। ঠিকই করেছেন তাঁরা। নইলে ওটা জীবন্ত সাহিত্য হতো না। হিন্দু ধর্মেরই সন্তান। হিন্দু ধর্ম ত্যাগ বৈরাগ্য ও মুনি ঋষির ধর্ম। হিন্দুর সংস্কৃতিও তাই ত্যাগ প্রেম ও ভক্তিবাদের সংস্কৃতি। এ সংস্কৃতির বুনিয়াদ প্রতীক-পূজা। কাজেই হিন্দুর শিল্পী মন সুন্দরের পূজারী। এতে করে এই বাঙলা সাহিত্যের প্রাণ হয়ে দাঁড়িয়েছে সত্যম শিবম্ সুন্দরমের সাধনা। সে সাধনার কামনা হচ্ছে "আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণ-ধূলার তলে।" সুন্দর ও প্রতীক-পূজারী এই রসিক মন স্বচ্ছন্দে 'আর্টের জন্যই আর্ট' এই মতবাদ প্রচার করেছে। প্রতীক পূজারী নিত্যানন্দ রস-পিপাসু মন স্পন্দিত হয়েছে পরকীয়া প্রেমে। আত্মার তসল্লির জন্য ভক্তিবাদ ও আর্টবাদের মিল ঘটাইবার উদ্দেশ্যে রাধা-কৃষ্ণ-প্রেমের সৃষ্টি হয়েছে। এইভাবে বাঙলা সাহিত্য গড়ে উঠেছে নারী-প্রেমকে কেন্দ্র করে। নারী এখানে সৌন্দর্যের প্রতীক। নারী-প্রেমের সাধনা করতে গিয়ে নারী-মনকে করে তোলা হয়েছে গভীর রহস্যপুরী। সে দুর্জ্ঞেয় রহস্যপুরীর ঘুমন্ত নারী-

www.pathagar.com

প্রেমকে জাগাবার সোনার কাঠির সন্ধানে গোটা তরুণ-বৃদ্ধ জাতীয় মনকে তোলা হয়েছে ক্ষেপিয়ে। ক্রমে শিল্পীর তুলিতে ত্যাগ বৈরাগ্য ভক্তি-প্রেম প্রভৃতি হিন্দু সংস্কৃতির বড় বড় মহান মূল সূত্রগুলিও শিল্পিত হয়ে উঠেছে নারী-প্রেমকে কেন্দ্র করেই।

ত্যাগের আদর্শ, বৈরাগ্যের আদর্শ, ভক্তিবাদের আদর্শ প্রেমের আদর্শ, সমস্তই উঁচু দরের আদর্শ। এইসব আদর্শকে বুনিয়াদ করে নারী-প্রেমকে কেন্দ্র করে হিন্দু শিল্প-মনীষা যে সাহিত্য রচনা করেছে, সে সবই হয়েছে উচ্চাঙ্গের সাহিত্য এবং তা পড়ে অপর সকলের মতই মুসলমান রস-পিপাসীরাও পিপাসা নিবারণ করে থাকে।

শিল্প দর্শনের ব্যবধান

কিন্তু সত্য কথা এই যে, ঐ সাহিত্যকে মুসলমানরা তাদের জাতীয় সাহিত্য মনে করতে পারে না। কারণ ত্যাগ-বৈরাগ্য-ভক্তি-প্রেম যতই উঁচুদরের আদর্শ হোক, মুসলমানের জীবনাদর্শ তা নয়। হিন্দুর ধর্ম যেমন ত্যাগ বৈরাগ্য ও মুনি-ঋষির ধর্ম, মুসলমানের ধর্ম তেমনি হক-ইনসাফ ও জেহাদ-শহীদের ধর্ম। প্রতীকবাদী সুন্দর-পূজারী আর্টবাদী হিন্দু সংস্কৃতি যেমন ব্যক্তি-কেন্দ্রিক, মুসলিম সংস্কৃতি তেমন ব্যক্তি কেন্দ্রিক নয়। হক-ইনসাফবাদী কল্যাণমুখী মুসলিম সংস্কৃতি তাই সমাজ-কেন্দ্রিক। মুসলমানের বিচারে তাই আর্টের জন্য আর্ট নয়, আর্ট সমাজের জন্য। এই সমবেত কল্যাণমুখিতার ফলে মুসলমান মূলত কর্মবাদী, ভক্তিবাদী নয়। এই জন্যই মুসলমানের সমাজ-ব্যবস্থা ত্যাগের বা বৈরাগ্যের বা দান-দক্ষিণার উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। মুসলিম সমাজ-ব্যবস্থা হক ও ইনসাফের উপর প্রতিষ্ঠিত। নারী মুসলমানের নজরে দেবী নয়, রহস্য-পুরীর রাক্ষসীও নয়। সে মানবী। বিধবা ও 'সতী' হিসেবে ত্যাগের মূর্তিমান দেবী রূপে তার যতই পূজা-অর্চনা করা হোক, তার ওয়ারিশী সম্পত্তি এবং দেনমোহরের টাকা আদায় না করা পর্যন্ত তার উপর ন্যায় বিচার করা হল না বলে মুসলমান মনে করে। হক ও ইনসাফের দ্বারা, অধিকার ও সাম্যের দ্বারা সমাজের অপর সব মেম্বরের মতোই নারীরও মন পাওয়া যেতে পারে। অভিসারের ঘোড়ায় চড়ে, 'দেহি পদ-পল্লব-মুদারমে'র সোনার কাঠি নিয়ে তার অন্তরের রহস্যপুরীতে প্রবেশ করে কান্নাকাটির বাণে রাক্ষস-খুক্ষস মারবার কোনো দরকার করে না।

মুসলিম সমাজ-মনের রায় এই যে, নিষ্কর্মা অলস ও নিদ্রাহীন হতভাগ্য অভিজাতেরাই নারী-হৃদয়কে রহস্যময় ও নারী-প্রেমকে সমস্যাপূর্ণ করে তুলেছে। বড় লোকের অনর্জিত অর্থ-রাশি ব্যয়ের অবসর-প্রচুর জীবন অতিবাহিত করবার জন্য ইনডোর খেলা হিসেবে রহস্যপূর্ণ নারী-হৃদয় খুবই চিত্তাকর্ষক। তা ছাড়া তাদের আদর নিষ্ঠাহীন জীবনে নারী-প্রেম সত্যই দুর্লভ বস্তু। তাদের বহুভোগী চঞ্চল চপল মনের কাছে নারী-হৃদয় সত্যই রহস্যপুরী। বাঙলার মুসলমান অনর্জিত বিত্তশালী অবসর-প্রচুর শ্রমকুণ্ঠ অভিজাত শ্রেণী নয়। কাজেই নারী-প্রেম তাদের দুর্লভও নয়, নারী-মন তাদের কাছে রহস্যপুরীও নয়। এই জন্যই বর্তমান বাঙলা সাহিত্য মুসলিম সমাজ মনে কোনো প্রেরণার স্পন্দন জাগাতে পারেনি। তাই রাধা কৃষ্ণের প্রেমে প্রতিবেশী হিন্দু ভাইকে আনন্দে নৃত্য করতে দেখেও মুসলিম সমাজ-মনের একটা তারও ঝনাৎ করে উঠেনি। তাই বিশ্ব-কবির 'মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণ-ধূলার তলে'র অত

www.pathagar.com

বড় আবেদনে একটি মুসলমানেরও মাথা এক ইঞ্চি হেঁট হলো না।

তার বদলে বরঞ্চ যেদিন এক অচেনা অজানা বালক হঠাৎ জিকির দিয়ে উঠলো : 'বল বীর উন্নত মম শির,' সেদিন রিক্ত ক্লান্ত ঘুমন্ত ও জীবন্মৃত মুসলমান ধড়্মড়্ করে জেগে উঠে চোখ রগড়াতে-রগড়াতে হুঙ্কার দিয়ে উঠলো : 'উন্নত মম শির'। কারণ এ যে তারই অন্তরের ঘুমন্ত শিশুর চীৎকার। এ যে তারই জীবনের কথা। তাই নজরুল ইসলামের আকস্মিক আবির্ভাব মুসলিম সমাজ-মনকে এমন করে আলোড়িত করতে পেরেছে। মুসলমানের বিবেচনায় মানব-জীবনের সুখ-দুঃখ আলো-আঁধার হাসি-কান্না, তাদের দেবত্ব-পশুত্ব, তাদের হীনতা-ক্ষুদ্রতা তাদের সংগ্রাম সাধনা, এ সবই সাহিত্যের বুনিয়াদ এবং নজরুল ইসলাম এই জীবনকে কেন্দ্র করেই সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। শুধু এই কারণেই নজরুল ইসলাম পূর্ব-পাকিস্তানের প্রথম জাতীয় কবি।

সাহিত্যের বিষয়-বস্তু

সাহিত্যের স্পিরিট সম্বন্ধে যা বলেছি বিষয়-বস্তু সম্বন্ধেও তাই বলতে হয়। সাহিত্যের নায়ক-নায়িকা যদি আমরা না হলাম, সাহিত্যের পটভূমি যদি আমার কর্ম-ভূমি না হলো, সাহিত্যের বাণী যদি আমার মর্মবাণী না হলো, তবে সে সাহিত্য আমার সাহিত্য হয় কিরূপে? আমার ঐতিহ্য, আমার ইতিহাস, আমার কিম্বদন্তী এবং আমার উপকথা যে সাহিত্যের উৎস নয়, সে সাহিত্য আমার জীবন-উৎসে হবে কেমন করে? রাম-লক্ষণ, ভীম-অর্জুন, সীতা-সাবিত্রী, রাধা-কৃষ্ণ, মথুরা-অযোধ্যা, উজ্জয়িনী-ইন্দ্রপ্রস্থ হিন্দুর মনে যে স্মৃতি কল্পনা ও রস সৃষ্টি করে; যে আইডিয়া অব এসোসিয়েশন জাগায়; মুসলিম মনে কি তা করতে পারে? তেমনি আবার আলী হামযা সোহরাব-রুস্তম শাহজাহান-আলমগীর হাযেরা রাবিয়া-চাঁদসুলতানা সিরাজ-কাসেম ঈসা খাঁ মুসা খাঁ গৌড়-সোনারগাঁ মুসলিম মনে যে স্মৃতি কল্পনা ও রস সৃষ্টি করে বা আইডিয়া-অব-এসেসিয়েশন জাগায়, হিন্দুর মনে তা করতে পারে না। এটা শুধু মুসলিমের কথা নয়। তামাম দুনিয়ার সকল জাতি সম্বন্ধেই এ কথা সত্য। সব জাতির জাতীয় চেতনাই জাগে তার ঐতিহ্যকে কেন্দ্র করে। যতদিন সে ঐতিহ্যকে বুনিয়াদ করে সাহিত্য রচিত না হবে ততদিন সে সাহিত্য থেকে কোনো জাতি প্রেরণা পাবে না। একটা অতি আধুনিক নজির দিচ্ছি।

ইতিহাসের নযির

ইংরেজী সাহিত্য খুবই উন্নত ও সম্পদশালী সাহিত্য। ওটা মিলটন-শেকসপিয়ার স্কট-শেলীর সাহিত্য। কিন্তু অতবড় সাহিত্যও আইরিশ জাতির প্রাণে প্রেরণা জাগাতে পারে নি। সুইফট বার্কলে গোল্ডস্মিথ ও বার্ণার্ড শ'র মতো অনেক প্রতিভাবান আইরিশ এই ইংরাজী সাহিত্যের সেবা করেছেন, বিশ্বজোড়া নামও করেছেন। কিন্তু তাঁদের সাহিত্য সেবা হয়েছে লণ্ডনে বসে, আয়ার্ল্যাণ্ডের মাটিতে নয়। আয়ার্ল্যাণ্ডবাসীর জাতীয় জীবনে সে সাহিত্য কোন স্পন্দন সৃষ্টি করতে পারে নি। তাই পার্নেল ড্যাভিট রেডমণ্ড প্রভৃতি রাষ্ট্রনেতার বিপুল ত্যাগ কঠোর সাধনা কিছুই আইরিশ জাতির মুক্তি আন্দোলন সফল করতে পারেনি।

www.pathagar.com

অথচ যেদিন আয়ার্ল্যাণ্ডের জাতীয় কবি ডব্লিউ. বি. ইয়েটস ইংরাজী প্রভাবমুক্ত স্বাধীন আইরিশ সাহিত্য সৃষ্টি করলেন, ইংরাজী কালচার অনুকরণমুক্ত করে তিনি যেদিন আইরিশ সাহিত্য সাধনাকে কেল্‌টিক সংস্কৃতির বুনিয়াদে নিজস্ব রূপ দান করলেন, সেই দিন আইরিশ গণ-মন নিজের হারানো ধন ফিরে পেল। নব-জন্মের আনন্দে সে মেতে উঠলো। নিজের ভাগ্য নির্মাণে সে কর্মোন্মত্ত হয়ে পড়ল। তার ফল হলো এই যে, আইরিশ জাতির দু'শো বছরের ব্যর্থ স্বাধীনতা আন্দোলন ডি ভেলেরার নেতৃত্বে কুড়ি বছরে জয়যুক্ত হলো।

আইরিশ জাতির কপালে যা যা ঘটেছিল পূর্ব-পাকিস্তানের মুসলিম জাতির কপালেও তাই ঘটেছে এবং সাহিত্যে স্বকীয়তা আনতে না পারলে বাকীটুকুও ঘটবে। বাঙলার মুসলমানকে জীবনের সকল ক্ষেত্রে জাগ্রত ও জীবন্ত করে তুলতে হলে, তার জীবনে রেনেসাঁ আনতে হলে তার সাহিত্য সাধনাকে অনুকরণ-অনুসরণ থেকে বাঁচাতে হবে। তাকে নিজস্ব সাহিত্য দিতে হবে। হিন্দুর সৃষ্ট বাঙলা সাহিত্য খুবই বড়। খুবই উচ্চাঙ্গের। কিন্তু তার নকল করে মুসলমান অমন বড় অমন জীবন্ত সাহিত্য-রচনা করতে পারবে না; হোমার মিল্টন শেকসপিয়ারকে নকল করে রবীন্দ্রনাথ অতবড় সাহিত্য রচনা করতে পারতেন না। তিনি তাঁর সাহিত্য সাধনাকে নিজস্ব কৃষ্টির উপর দাঁড় করাতে পেরেছেন বলেই তিনি আজ বিশ্ব-কবি রবীন্দ্রনাথ।

বাংলার মুসলমানও তেমনি রবীন্দ্রনাথের নকল করে বড় হতে পারবে না। তাকে বড় হতে হবে তার স্বকীয়ত্বের উপর দাঁড়িয়ে, নিজের কৃষ্টিকে বুনিয়াদ করে। বিশ্ব-কবি রবীন্দ্রনাথের বিশ্ব-ভারতীয় আকাশে কতবার শরতের চন্দ্রোদয় হয়েছে, তাতে শারদীয়া পূজায় 'আনন্দময়ী মা' কতবার এসেছে গিয়েছে, কিন্তু একদিনের তরেও সে বিশ্বের আকাশে ঈদ-মোহররমের চাঁদ উঠেনি। সে চাঁদ উঠাবার ভার ছিল নজরুল ইসলামের ওপর। এতে দুঃখ করবার কিছু নেই। কারণ এটা স্বাভাবিক। কাজেই কঠোর সত্য।

আমাদের ঐতিহ্য

তবে কি বাংলার মুসলমানের কোনো সাহিত্যিক ঐতিহ্য নেই? তাকে কি তবে সাহিত্য-সাধনার ক খ থেকে শুরু করতে হবে? না। অবস্থা অতটা নৈরাশ্যজনক নয়। বাংলার বর্তমান সাহিত্যে মুসলমানের কোনো দান নেই বলে বাঙালী মুসলমানের কোনো সাহিত্যই নেই, এ কথা ঠিক নয়। বাংলার বিশ্ববিদ্যালয়ে মুসলিম শিক্ষার্থীর ভিড় নেই বলে মুসলিম সমাজে বিদ্যাচর্চাই নেই, এ কথাও ঠিক নয়। বস্তুত বাংলার মুসলমানের যেমন একটা নিজস্ব সংস্কৃতি আছে, তেমনি তাদের একটা নিজস্ব সাহিত্যও আছে। সে সাহিত্যের নাম মুসলমানী বাংলা সাহিত্য বা পুঁথি সাহিত্য। মকতবে-মাদ্রাসায় শিক্ষিত লক্ষ লক্ষ মুসলমান পাঠক ঐ পুঁথি সাহিত্য থেকেই জীবনের প্রেরণা পাচ্ছে।

এই পুঁথি-সাহিত্য সম্বন্ধে আপনারা ঐ বিভাগের সভাপতির মুখে অনেক কথা শুনতে পাবেন। আমি শুধু এখানে এইটুকু বলতে চাই যে, পূর্ব-পাকিস্তানের সাহিত্যিক রেনেসাঁ আসবে এই পুঁথি সাহিত্যের বুনিয়াদে। আমরা আবার পুঁথি-সাহিত্যে ফিরে যাব, সে কথা আমি বলছি না। আমার মতলব এই যে, বাঙালী মুসলমানের সাহিত্যের প্রাণ হবে মুসলমানের প্রাণ এবং সে সাহিত্যের ভাষাও হবে মুসলমানেরই

www.pathagar.com

প্রাণ এবং সে সাহিত্যের ভাষাও হবে মুসলমানেরই মুখের ভাষা। এই দুই দিকেই আমরা পুঁথি সাহিত্য থেকে প্রচুর প্রেরণা ও উপাদান পাব।

আমাদের মুখের ভাষা

এখানে আমাদের ভাষার কথাও আপনি এসে পড়ছে। ভাষাবিজ্ঞান শাখার সভাপতির অভিভাষণ থেকে আপনারা ও দিককার কথা শুনবেন। আমি প্রসঙ্গত এখানে শুধু এইটুকু বলতে চাই যে, আজকার তথাকথিত জাতীয় সাহিত্যে বাংলার মেজরিটি মুসলমানের জীবনেই যে শুধু বাদ পড়েছে তা নয়, তার মুখের ভাষাও সে সাহিত্যে অপাংক্তেয় রয়েছে। মুসলমানের আল্লা-খোদা রোজা-নামাজ হজ-যাকাত এবাদৎ-বন্দেগি অজু-গোসল খানা-পানি সমস্তই বাংলা সাহিত্যের দিকপাল ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তাদের কাছে বিদেশী ভাষা। এ যুলুমবাযির মধ্যে কোনো জাতির সাহিত্য গড়ে উঠতে পারে না। সুতরাং পূর্ব-পাকিস্তানের সাহিত্য রচিত হবে পূর্ব-পাকিস্তানবাসীর মুখের ভাষায়। সে ভাষা সংস্কৃত ব্যাকরণের বা তথাকথিত বাংলা ব্যাকরণের কোনো তোয়াক্কা রাখবে না। পূর্ব-পাকিস্তানের বিশ্ববিদ্যালয় সে ভাষায় নিজস্ব সত্যকার বাংলা ব্যাকরণ রচনা করবে।

ভাষার কথা বলতে গেলেই হরফের কথাও এসে পড়ে। এ সম্পর্কেও আপনারা বিভাগীয় সভাপতির ভাষণে অনেক কথা শুনবেন। আমি শুধু এইটুকু বলে রাখছি যে, বাংলার বর্তমান বর্ণমালার আবর্জনা আমরা রাখবো না। এখন বাংলায় ৪৮টা হরফ আছে। এর উপর আছে কার ফলা ও যুক্তাক্ষর। এটা শুধু শিক্ষা সাহিত্যের উপর জুলুম নয়; ছাপা টাইপ ও টেলিগ্রাফ বেতার প্রভৃতি সকল রকম জ্ঞান-বিকাশের দিক থেকেও এই বর্ণ-বাহুল্য মারাত্মক রকম প্রগতি বিরোধী। পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটির অন্যতম বড় কাজ এই বর্ণমালা কমানো। রেনেসাঁ সোসাইটির তরফ থেকে যে পরিকল্পনা করা হয়েছে তাতে মাত্র কুড়িটি হরফ ও চারিটি হরকত বা কার থাকবে। ফলা ও যুক্তাক্ষর কিছু থাকবে না।

বন্ধুগণ,

আমার বক্তব্য শেষ হয়েছে। অতঃপর আমার সহকর্মী বন্ধুগণের ভাষণে রেনেসাঁ সোসাইটির আদর্শ-উদ্দেশ্য নিয়ত-মকসেদ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা শুনবেন। তাতে আপনারা দেখবেন, আমরা বিপুল আশা-আকাঙ্ক্ষার কল্পনার তাজমহল রচনা করে বসে আছি। হতে পারে এসব আমাদের স্বপ্ন। কিন্তু সে স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করার শক্তি-প্রাচুর্য আপনাদের মধ্যে সুপ্ত রয়েছে। আপনারা যদি আত্মবিশ্বাসী হন, আপনাদেরকে সে শক্তি প্রাচুর্য নিয়ে যদি আপনারা রুখে দাঁড়ান, পূর্ব-পাকিস্তানের তরুণ মন যদি কর্মোন্মাদনায় মেতে উঠে, তবে এ স্বপ্ন বাস্তবে রূপায়িত হবে, চার কোটি মুসলমান তাদের জীবন-জেহাদে জয়-যুক্ত হবে, এই আশা নিয়ে আমি আপনাদের খেদমতে আদাব আরজ করছি।

১৯৪৪ সালের পাঁচই মে কলিকাতা ইসলামিয়া কলেজ মিলনায়তনে পূর্ব-পাকিস্তান রেনেসাঁ সম্মিলনীর মূল-সভাপতির ভাষণ।

www.pathagar.com

শিক্ষার মিডিয়াম

চিনা চতুরালি

আজ একইশা ফেব্রুয়ারি। এটা বিপ্লবের দিন। ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের মর্মকথা জাতীয় স্বকীয়তা। সে স্বকীয়তা লাভ হইতে পারে শুধু নিজস্ব সাহিত্যে। নিজস্ব সাহিত্য হইতে পারে কেবলমাত্র মাতৃভাষায়।

শিক্ষা এসবের গোড়ার কথা। কাজেই এই বিপ্লব বার্ষিকীতে আমাদের শিক্ষার মাধ্যমের কথা উঠিয়াছে স্বাভাবিকভাবেই। যে ভাষায় মায়ের কাছে প্রথম বুলি শিখিয়াছি, যে ভাষায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিব, জীবনের শিক্ষা লাভ করিব, সেই ভাষাতেই, এটা ত পানির মতো সরল কথা।

তবু এটা লইয়া তর্ক বাধিয়াছে। বাংলা প্রচলনের জন্য ছাত্র-তরুণদের বছর-বছর 'সপ্তাহ' পালন করিতে হইতেছে। কারণ মায়ের বিরুদ্ধেও সন্তান আছে। তবে তাঁরা সোজাসুজি বিরোধিতা করিতেছেন না। অত আহাম্মক তাঁরা নন। মাতৃভাষার তাঁরা বিরোধিতা করিতেছেন সনাতন কৌশলে। বলিতেছেন : মাতৃভাষা ত নিশ্চয়ই। তবে তার জন্য প্রস্তুতি চাই। সাত তাড়াতাড়িতে ইষ্টের চেয়ে অনিষ্ট হইবে বেশি। শিক্ষার মান নিচু হইয়া যাইবে। দেশের সর্বনাশ হইবে। শিক্ষা বড় নাযুক ব্যাপার। আগুন লইয়া খেলা। ধীরে ধীরে আগ বাড়িতে হইবে।

আমাদের চিনা চতুরালি এসব। ভুক্তিত স্বার্থের ভেস্টেড ইন্টারেস্টের সেই গ্র্যাজুয়েল রিয়েলিযেশন-অব-সেল্ফ গভর্নমেন্ট। সেই কমিশন কমিটি এক্সপার্ট বডি নিয়োগের প্রস্তাব।

কৌশলটা ওখানেই শেষ নয়। তার সূক্ষ্ম নীতিরও খানিকটা রফ্‌ত করিয়াছেন। এদেরই একদল বলিলেন : 'এখনই বাংলা করা যায় না। তবে আগামী দুই-তিন বছরের মধ্যে করিবার চেষ্টা করিব।' প্রতিবাদ করিবার জন্য আমরা যেই কোমর বাঁধিলাম, অমনি আর একদল হায় হায় করিয়া উঠিলেন! ছাতি পিটাইয়া মাথায় হাত মারিয়া বলিলেন : 'দুই-তিন বছরে বাংলা আনিলে শিক্ষা গোল্লায় যাইবে। প্রস্তুতি করিতে কম-সে-কম ত্রিশ বছর লাগিবে।'

আমরা পাগড়ি ঘুরাইয়া বাঁধিলাম। দুই-তিন বছরওয়ালাদের তরফ হইতে মুষ্টি ফিরাইয়া ত্রিশ বছর ওয়ালাদের মোকাবেলায় রুখিয়া দাঁড়াইলাম। ত্রিশ বছরের চেয়ে তিন বছর কম, এ জ্ঞানটুকু আমরা বাংলা মাধ্যম ছাড়াই শিখিয়াছি। অতএব তিনে-ত্রিশে লাগিল ফ্রি-ফাইট। মাতৃভাষা আমাদের লাজুক গ্রাম্য গিরস্থের মেয়ে। তারে

www.pathagar.com

লইয়া ঝগড়া বাধায় লাজে সে ঘোমটা টানিল। শিক্ষার মানের আসন্ন বিপদ কাটিয়া গেল।

এ খেলা চিরন্তন। আমাদের স্বাধীনতার আঠার বছর। ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের পরেও চৌদ্দ বছর। রাষ্ট্র-ভাষারূপে স্বীকৃতি পাওয়ার পরেও দশ বছর। আরও যে কতদিন যাইবে, তা আল্লাই জানেন। কারণ তিন বছর-ত্রিশ-বছরে মুলতবি যাঁরা চাহিতেছেন, ফজলে-খোদা, তাঁরা সবাই ততদিন হায়াতে বাঁচিয়া থাকিলেও যাঁর-তাঁর চাকরিতে থাকিবেন না নিশ্চয়ই। তবু তাঁরা মুলতবি চান। তাঁদের ভাবখানা এই : কোন মতে আমার মুদ্দতটা কাটিয়া গেলেই বাঁচি। বাকী আল্লার মর্জি।

এখনই সম্ভব নয় কেন?

এই মুহূর্তে ইংরেজীর বদলে বাংলাকে শিক্ষার মাধ্যম করার বিরোধীরা যে সব অসুবিধার কথা বলিতেছেন, সংক্ষেপে তা এই :

১. বাংলায় পাঠ্য বই নাই।

২. প্রয়োজনীয় পরিভাষা নাই।

৩. উপযুক্ত শিক্ষক নাই।

৪. সরকারী-বেসরকারী অফিস ও আদালতে বাংলা চালু হয় নাই।

৫. পূর্ব-পাকিস্তানে উর্দু-ভাষী ও পশ্চিম-পাকিস্তানে বাংলা ভাষী শিক্ষকদের অসুবিধা।

৬. রাজনৈতিক তাগিদেই বাংলা প্রচলনের এই তাড়াহুড়া। শিক্ষায় রাজনীতি বিপজ্জনক।

৭. প্রস্তুতির আগে বাংলা চালাইবার চেষ্টা শিক্ষার মানের অবনতি ঘটাইবে।

লক্ষণীয়, সব আপত্তি শিক্ষার মাধ্যম বিবেচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ! একটা মূল কথাই এতে বাদ পড়িয়াছে। আপত্তিগুলির জবাব দিবার আগে কাজেই সেই মূল কথাটার দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। কথাটা এই : মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করার সাথে-সাথে এক সংগে তিনটা কাজ হইয়া যায়। এক, শিক্ষা দান ও জ্ঞান লাভ সহজ হয়। দুই, সংগে-সংগে মাতৃভাষার উৎকর্ষ সাধনের প্রসেস শুরু হয়। তিন, বিদ্যা আভিজাত্যের আইভরি টাওয়ার হইতে জনগণের মধ্যে নামিয়া আসে। এর একটাও আর একটা ছাড়া হয় না। কাজেই বিচ্ছিন্নভাবে এসব প্রশ্নের বিচার করিলে চিন্তায় গলদ থাকিয়া যাইবে। এই মূল কথাটি মনে রাখিয়া আপত্তিগুলির বিচার করুন।

পুস্তকের অভাব

পাঠ্য পুস্তকের অভাবের কথাটাই ধরুন। এ অভাবে কেন? আমরা বই লিখি নাই। কেন লিখি নাই? দরকার নাই। দরকার নাই কেন? বাংলায় পড়াই না বলিয়া। ইংরাজীতে পড়াই। সে ভাষায় বই-পুস্তক ত আছেই। আগে দরকার পরে সৃষ্টি।

এতকাল আমরা ইংরেজীতে শিক্ষা দিতেছি। তবু ইংরেজীতে আমরা বই লিখি নাই কেন? কারণ দরকার ছিল না। আমাদের চেয়ে বড়-বড় পণ্ডিতরা ঐ ঐ বিষয়ে আগেই বই লিখিয়া রাখিয়াছেন। প্রয়োজনমতো লিখিতেছেন। লিখিবেনও। আমরা যদি আগে বই

www.pathagar.com

লেখা হওয়ার আশায় আরও ত্রিশ বা তিনশ' বছর ইংরেজীতেই শিক্ষা দিতে থাকি, তবে কি মনে করেন, ইতিমধ্যে বাংলায় পাঠ্য-বই লেখা হইয়া যাইবে? কে লিখিবেন? কার জন্য লিখিবেন? কে কিনবেন? কেন পড়িবেন?

বাংলা-বিরোধীরাও এটা বুঝেন। তাই এক তরুণ অধ্যাপক প্রস্তাব করিয়াছেন, সরকারী আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠানেরা আগামী দশ বছরে প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহের উপর বই-পুস্তক লেখাইবেন। সে উদ্দেশ্যে বিশেষজ্ঞ কমিটি নিয়োগ করিবেন। আশাটা বোধ হয় এই যে, দশ বছরে প্রয়োজনীয় সব পাঠ্য-বই লেখা ছাপা ও বাঁধাই হইয়া কোনও এক নিরাপদ স্থানে জমা থাকিবে। দশ বছর পরে বাংলা মাধ্যম হইলে সব বই হুড়-হুড় করিয়া বিক্রি হইয়া যাইবে।

এই ধরনের প্রস্তাব যাঁরা করিতে পারেন, তাঁরা আর যে কাজেরই যোগ্য হউন না কেন, শিক্ষকতার যোগ্য তাঁরা নন। আসলে এটা আগে সাঁতার শিখিয়া পরে পানিতে আমার অথবা আগে বড় হইয়া পরে হাঁটিতে শিখিবার উপদেশের শামিল। বাংলা কলেজ বই-পুস্তক ছাড়াই ডিগ্রী ক্লাস পর্যন্ত পড়াইয়া,উচ্চহারে পাশ করাইয়া যুক্তি অসার প্রমাণ করিয়াছে।

শিক্ষাদান কি?

আসলে শিক্ষাদানটা হইল শিক্ষক যা বুঝেন ছাত্রকে তাই বুঝাইয়া দেওয়া। যত বড় বিজ্ঞানীই আপনি হউন, আর ইংরাজী, ফরাসী, জার্মানী, রুশীয়, আরবী ফারসী যে ভাষাতেই আপনি সে বিজ্ঞান পড়িয়া থাকুন, আপনি তা বুঝিয়াছেন আপনার মাতৃ-ভাষাতেই। চিন্তাও করেন আপনি সেই ভাষাতেই। কাজেই অপরকে বুঝাইতেও পারিবেন সেই ভাষাতেই। যিনি তা পারিবন না, তিনি নিজেই সেটা বুঝেন নাই; মুখস্থ করিয়াছেন মাত্র।

যে-সব অধ্যাপক বলেন, যে, তাঁরা তাঁদের সাবজেক্ট ইংরাজীর বদলে বাংলায় পড়াইতে পারিবেন না, তাঁদের সম্বন্ধে একটা শক্ত কথা বলিব, আশা করি মাফ করিবেন। তাঁরা বাড়ীতে বসিয়া ইংরাজী বই-এর নকলে নোট লিখিয়া ক্লাসে গিয়া তাই উগলাইয়া থাকেন। ইকই সাবজেক্টে বহুকাল ধরিয়া পুনঃ-পুনঃ একই কাজ করিতে-করিতে লেকচার-নোটগুলি তাঁদের মুখস্থ হইয়া গিয়াছে। ফলে শিক্ষকতা হইয়া গিয়াছে তাঁদের জন্য মিকানিক্যাল।

এটা হওয়া স্বাভাবিক। নিজেদের অর্জিত বিদ্যা বাসা বাঁধিয়াছে এঁদের ঠোঁটে, বড়জোর মগজে। অন্তরে প্রবেশ করে নাই। বিদ্যার ফল কাজেই এঁরা নিজেরাই পান নাই। ছাত্রদেরে দিবেন কোথা হইতে? পক্ষান্তরে যাঁরা জ্ঞানকে তাঁদের অন্তরে গ্রহণ করিয়াছেন তাঁরা বুঝেন, মাতৃভাষার মাধ্যমে ছাত্রদের মধ্যে সে জ্ঞান অধিকতর ফলদায়কভাবে বিতরণ করিতে পারিবেন। সেই জন্যই তাঁরা বাংলাকে মাধ্যম করার দাবি করিতেছেন। এঁরা চিন্তা করিয়া পড়ান, মুখস্থ নোট আওড়ান না। ইংরাজী মাধ্যম থাকার ফলে এঁরা ক্লাসে লেকচার দিবার সময় আগে বাংলায় চিন্তা করেন। সে চিন্তাকে ইংরাজীতে অনুবাদ করেন। তারপর তা উচ্চারিত হয় মুখে। ছাত্ররা সে লেকচার শুনে ইংরাজীতে। মনে মনে অনুবাদ করে তা বাংলায়। তারপর বুঝে।

www.pathagar.com

বিদেশী ভাষার মাধ্যমে যতদিন শিক্ষাদান চলিতেছে, ততদিন ধরিয়া এই প্রসেস চলিতেছে। শিক্ষক ও ছাত্রের মাঝখানে এই অনুবাদের পর্দা খাড়া আছে ততদিন। দুইটা বাংলা মন ও মুখ ভাব বিনিময় করিতেছে দোভাষীর মাধ্যমে। শিক্ষক-ছাত্রে তাই অন্তরের যোগাযোগ হইতেছে না। এই কারণেই আমাদের শিক্ষা অপূর্ণ।

খাঁটি শিক্ষকদের জন্য এই কৃত্রিম পরিবেশ অসহনীয়। কাজেই অবিলম্বে এঁরা বাংলা মাধ্যম চান। তবু যাঁরা একটু দ্বিধা করেন তাঁরা দুইটা অসুবিধার ভয় করেন। এক, তাঁরা ভাবেন বাংলা ভাষায় ক্লাসে যে লেকচার দিবেন সেটা সাহিত্যিক ও শুদ্ধ বাংলা হইবে না। দুই, তাঁদের বাংলা লেকচারে অনেক ইংরাজী ওয়ার্ড ইউয করিতে হইবে। অনেক দিনের হ্যাবিটের দরুনই হোক অথবা প্রায় সব সাবজেক্টেই দরকারী পরিভাষার অভাবেই হোক, ঐ সব শব্দ অটমেটিক্যালি এবং মিকানিক্যালি তাঁদের মুখে আসিয়া পড়িবে। তাতে তাঁদের লেকচার শুদ্ধ সাহিত্যিক বাংলা হইবে না। এটা হইবে লজ্জার কথা।

এই দুইটি আশংকা হইতেই যে অনেক শিক্ষক বাংলা প্রচলনের বিরোধিতা করিতেছেন, তাতে আমার সন্দেহ নাই।

অমূলক আশংকা

বর্তমান পরিবেশে এই আশংকা অন্যায় ও অস্বাভাবিক না হইলেও একটু চিন্তা করিলেই তাঁরা বুঝিবেন সে আশংকা অমূলক। আমাদের লেখক-সাহিত্যিকদের অনেকের ভাবগতিক দেখিয়া বহু পণ্ডিত ব্যক্তির মনেও এই কমপ্লেক্স বাসা বাঁধিয়াছে যে, লেখার শক্তিটা স্বভাবের দান। ইচ্ছা করিলেই লেখক হওয়া যায় না। সুতরাং লেখাটা সাহিত্যিকদেরই প্রিভিলেজ।

কথাটি পুরাপুরি সত্য নয়। সাহিত্যকদের মধ্যে যাঁরা আর্টিস্ট অর্থাৎ যাঁরা কবি-ঔপন্যাসিক শুধু তাঁরাই স্বভাব-দত্ত গুণের দাবি করিতে পারেন। বাকী সব বিষয়েই যে কোনও শিক্ষিত লোক নিজের জানা সাবজেক্টে প্রবন্ধ-নিবন্ধ লিখিতে পারেন। শিক্ষক-অধ্যাপকরা ত নিশ্চয়ই পারেন।

লেখাটা পায়ে হাঁটার চেয়ে কঠিন নয়। কিন্তু অভ্যাস করিতে হয়। হাঁটার অভ্যাস না থাকিলে খুব সুস্থ-সবল লোকও লম্বা পথ হাঁটিতে পারে না। অভ্যাস না থাকিলে সাইকেল চালান আরও কঠিন।

লেখার ব্যাপারটাও তেমনি। কলম হাতে নিন।। কলমের মুখে যা আসে, তাই লিখুন। পছন্দ হইবে না। কাটুন। আবার লিখুন। আবার পড়ুন। আবার কাটুন। আবার-আবার। বাল্যশিক্ষায় পড়েন নাই? খোকা হাঁটিতে চাহিল। মাটিতে পড়িল। আবার উঠিল। আবার পড়িল। আবার উঠিল। তারপর হাঁটিতে শিখিল। লেখার ব্যাপারটাও ঠিক তাই। আপনার ভাষা সাহিত্যিকের ভাষা হইবে না? এটাও আপনার অহেতুক ভূতের ভয়। আপনি শিক্ষিত মানুষ। আপনি যে ভাষায় চিন্তা করেন, যে ভাষায় কথা বলেন, সেইটাই ভদ্র ও শালীন ভাষা। সুতরাং সাহিত্যেরও ভাষা।

তবে সব সভ্য ভাষার মতোই বাংলা ভাষারও একটা লেখ্য একটা কথ্য এবং একটা ক্লাসিক্যাল রূপ আছে। এ তিনের সমন্বয়েই স্ট্যাণ্ডার্ড সাহিত্যিক ভাষা হইবে

www.pathagar.com

না ঠিক। কিন্তু তা হওয়ার দরকারও নাই। এই ভাষাতেই আপনি আপনার সাবজেক্ট আপনার ছাত্রদের বুঝাইতে পারিবেন। আপনার ছাত্ররা বুঝিতেও পারিবে।

তারপর আপনার লেকচারগুলি যদি প্রবন্ধ আকারে ছাপিতে চান তবে, এবং ছাত্ররা যখন পরীক্ষায় লিখিত উত্তর দিবে তখন, প্রয়োজনমতো শুদ্ধ করিলেই চলিবে। পরীক্ষার্থীদের সকলের বেলা তারও দরকার নাই। ভাষা-সাহিত্য পরীক্ষার বিষয় না হইলে ভাষার ভুলের দোষে নম্বর কাটা চলিবে না। প্রশ্নের উত্তর হইল কি-না শুধু তারই বিচার হইবে।

শিক্ষক মনের কমপ্লেক্স

আমাদের শিক্ষকদের মনে আর একটা কমপ্লেক্স দেখা দিতে পারে। আমাদের অনেকেই পশ্চিম-বাংলার ডায়লেক্টকে পূর্ব-বাংলার ডায়লেক্টের চেয়ে ত বটেই, স্ট্যাণ্ডার্ড বাংলার চেয়েও শালীন ও সভ্য মনে করেন। সাধারণভাবে ক্রিয়া পদে ও কিছু-কিছু বিশেষ্য পদে এই মনোভাব প্রকট। এঁরা দর্শন-বিজ্ঞান ও ধর্ম পুস্তকের মতো গুরু-গম্ভীর লেখাতেও স্ট্যাণ্ডার্ড ক্রিয়াপদের জায়গায় পশ্চিম-বাংলার কলোকোয়াল ক্রিয়াপদ ব্যবহার করেন। নাটকে-নভেলে-সিনেমায়, বোধ করি লোক্যাল কালার দিবার তাকিদেই, পূর্ব-বাংলার কলোকোয়াল ক্রিয়াপদও ব্যবহার করেন চাকর-বাকর কুলি-মজুর ও মাঝি-মাল্লা ইত্যাদি 'ছোটলোকের' মুখ দিয়া। গল্পের ভদ্রলোক নায়ক-নায়িকারা সবাই কিন্তু চমৎকার পশ্চিম-বাংলার কথ্য ক্রিয়াপদ ব্যবহার করেন। চাকর-মনিবের এই ভাষাডুয়েট পূর্ব ও পশ্চিম-বাংলার 'মাতৃ-ভাষার' ষ্টেটাসের নিখুত পরিমাপ এবং এ পরিমাপ করিতেছেন পূর্ব-বাংলার শিল্পী-সাহিত্যিকরাই। কারণ আমাদের সাহিত্যিকরা 'মুসলমান হইলেও ভদ্রলোক'।

এই হীনমন্যতা এঁদের এমন আর্ট-কানা করিয়া রাখিয়াছে যে, এঁদের হাতে শুদ্ধিকৃতি ও রেকর্ড করা 'রূপবানে' নায়িকা গান করে পূর্ব-বাংলার ভাষায় কিন্তু গানের ফাঁকে-ফাঁকে কথা বলে চমৎকার পশ্চিম-বাংলার ভাষায়। আর্টের ফাণ্ডামেন্টাল-বিরোধী এই অস্বাভাবিকতা এঁদের চোখেও পড়ে না, কানেও বাজে না!

যাঁদের চোখে নিজের সব কিছু কুৎসিৎ, পরের সব-কিছু সুন্দর ও অনুকরণযোগ্য,এঁরা সেই শ্রেণীর লোক। তবু তাঁরা সাহিত্যিক। কাজেই শিক্ষকরা ভাবিতে পারেন, ওটাই সাহিত্যের ভাষা। ঐ ভাষায় ক্লাসে লেকচার দিতে না পারিলে ছাত্ররা হাসিবে।

কাজেই লেকচার দিবার সময় শিক্ষকরা থাকিবেন সেল্ফ্‌কন্‌শাস। ফলে লেকচারও ইজি হইবে না। ছাত্রদের পক্ষে তা শুনাও সোজা হইবে না, বুঝাও সহজ হইবেনা।

কারণ, ভাষার দুই জোড়া রূপ। লেখা ও পড়া, রাইটিং ও রিডিং এবং বলা ও শুনা, স্পিকিং ও হিয়ারিং। এ জোড়া অবিভাজ্য। লেখার যেমন ভাষা আছে, বলারও তেমনি ইন্টোনেশন আছে। আবার ভাষার জিভও আছে কানও আছে। ভাটিয়ালি গানের 'নাও বাইয়া' ও 'ঘাটে লাগাইয়া'র বদলে 'নৌকা বেয়ে' ও 'ঘাটে লাগিয়ে' বলিলে কেমন হয়, আপনারা তা জানেন। তবু সে চেষ্টা হইয়াছে। পূর্ব-বাংলার সব শব্দ ও উচ্চারণ আমাদের সাহিতিকদের বদৌলতে আজো তাই।

www.pathagar.com

সেই কারণেই পশ্চিম-বাংলার এই ব্যর্থ অনুকরণ। ব্যর্থ এই জন্য যে, জিভের মোচড় দুই-চার জেনারেশনে ফিরে না। দুইশ' বছর ইংরেজের অনুকরণ করিয়া তা দেখিয়াছি। এটা অস্বাভাবিক অবস্থা। এ অবস্থা চলিতে দিলে আমরা অনুবাদের রাজ্যেই থাকিয়া যাইব! এখন নিজের বাংলা চিন্তাকে ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়া তারপর মুখে প্রকাশ করি। ইংরাজীর বদলে পশ্চিম-বাংলায় অনুবাদ করিব, এই যা পার্থক্য। এতে শিক্ষার মাধ্যম বদলাইবার আসল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইবে।

এ বিষয়ে আমার উপদেশ এই যে, শিক্ষকরা ক্লাসে লেকচার দেওয়ার সময় প্রনানসিয়েশন ও ইন্টোনেশনে সকল প্রকার কৃত্রিমতা বর্জন করিবেন। নিজেরা নিত্য-ব্যবহৃত সহজ কথ্য শব্দ ও ক্রিয়াপদ নিজস্ব স্বর-ভংগিতেই উচ্চারণ করিবেন। ছাত্রদের বিপুল মেজরিটি পূর্ব-বাংলার ছেলে। আপনার ক্লাসে তারা নিজ পরিবারের ভাষিক পরিবেশ দেখিয়া খুশীই হইবে। শিক্ষক-ছাত্রের মধ্যে বাপ-বেটার অন্তরের যোগ স্থাপিত হইবে। মাতৃভাষাকে মাধ্যম করার উদ্দেশ্য সফল হইবে।

পরিভাষার অজুহাত

দ্বিতীয় অসুবিধা পরিভাষার অভাব। বাংলা-বিরোধীদের এটা বড় যুক্তি। বিজ্ঞান-বিষয়ক সাবজেক্টসমূহ ত বটেই, সাধারণ সাবজেক্টগুলিতেও প্রয়োজনীয় টার্মিনোলজির অভাব। কথায় কথায় ইংরেজী ওয়ার্ড ইউয করিতে হয়। এইসব ওয়ার্ডের বাংলা টার্মিনোলজি ডিসকভার বা কয়েন না করা পর্যন্ত ইংরেজীকেই আমাদের এডুকেশনের মিডিয়াম চালু রাখা আবশ্যক।

এই যুক্তিতে কিন্তু বই লেখার ব্যাপারটাও পিছাইয়া যাইতেছে। এক ঢিলে দুই পাখী মারা আর কি! পরিভাষা সৃষ্টির আগে ত আর বই লেখায় হাত দেওয়া যায় না। অনির্দিষ্ট কালের জন্য বাংলা ঠেকাইয়া রাখিবার একটা অদ্বিতীয় অমোঘ অস্ত্র এটা।

আসলে কিন্তু পরিভাষার যুক্তিটা একটা অজুহাত মাত্র। অথচ এই প্রশ্নটাই বহুকাল ধরিয়া কিছু লোকের মাথার বিষ হইয়া আছে। অনেক বিদ্বান পণ্ডিত এ কাজে তাঁদের মূল্যবান সময় নষ্ট করিয়াছেন ও করিতেছেন। অভিধান ঘাঁটিয়া মস্তক আলোড়ন করিয়া কিছু 'ইংরাজী' শব্দের 'বাংলা' প্রতিশব্দ বাহির করিয়াছেন।

'ইংরাজী' ও 'বাংলা' দুইটা শব্দেই কোটেশন মার্ক দিলাম! কারণ যে শব্দের প্রতিশব্দ এঁরা বাহির করিয়াছেন সেটাও ইংরাজী নয়, যেটা বাহির করিয়াছেন তাও বাংলা শব্দ নয়। আসলে তাঁরা একটা ল্যাটিন শব্দের একটা সংস্কৃত প্রতিশব্দ তৈয়ার করিয়াছেন মাত্র।

ঐ ল্যাটিন শব্দটি এবং অমন হাজারো গ্রীক জার্মান ফরাসী ও ইটালিয়ান শব্দ ইংরাজী ভাষায় গৃহিত হইয়াছে। ইংরাজী হরফে লেখাতেই ও সব শব্দ বেমালুম ইংরাজী শব্দ হইয়া গিয়াছে। বাংলা হরফে লিখিলেই ওসব তেমনি বাংলা শব্দ হইয়া যাইবে। মস্তক ও অভিধান তছনছ করিয়া ও ওসবের সংস্কৃত বা অন্য কোনও ভাষার প্রতিশব্দ আবিষ্কার বা তৈয়ার করিবার প্রয়োজন নাই। না-হক সে চেষ্টা যাঁরা করিবেন, তাঁরা উনিশ শতকের ভাটপাড়ার পণ্ডিতদের মতোই ভুল করিবেন।

তাঁরা কাগয কলম দোয়াত কলমদান ইত্যাদি আরবী ফার্সি শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ বাহির করিবার কত চেষ্টাই না করিয়াছিলেন। এ ধরনের চেষ্টা শুধু পণ্ডশ্রম নয়। ভাষায় বিকাশ ও সমৃদ্ধির বিরুদ্ধে দুশমনিও।

www.pathagar.com

ভাষার উদ্দেশ্যই হইল নিজের মনের ভাব অপরকে বুঝানো। যে শব্দ আমরা বলি ও বুঝি, আমাদের কথাবর্তায় যে সব শব্দ চালু হইয়াছে, মূল যে ভাষারই হউক সে সবই–বাংলা শব্দ। সে সবের পরিভাষা সৃষ্টির কথা এক চোটে ডিস্‌মিস্ করা উচিত।

পরিভাষার জন্ম

তবে হ্যাঁ, এক দিক দিয়া আমাদের পরিভাষা সৃষ্টি করিতে হইবে। সেটা বড় ও দুরুচ্চার বিদেশী শব্দকে ছোট সুউচ্চার করা। খোদ ইংরাজী ভাষীরাও তা করিয়াছে বিদেশী শব্দ নিবার বেলা। এমনকি ইংরাজী বড় বড় শব্দকেও তারা ছোট করিতেছে। ইউনিভার্সিটিকে 'ভার্সিটি', লেবরেটরিকে 'ল্যাব', পাবলিক রেস্টুরেন্টকে 'পাব', 'ফ্রিজিডেয়ারকে 'ফ্রিয', একজামিনেশনকে 'একজাম' এত্যাদি হাজারো বড় শব্দকে তারা সংক্ষেপ করিয়াছে।

আমাদের জনগণও পণ্ডিতদের সাহায্য ছাড়াই অর্ডারলিকে আর্দালি, বেঞ্চকে বেঞ্চি, টেব্‌লকে টেবিল, বটল্‌কে বোতল, ডক্টরকে ডাক্তার, হস্‌পিটালকে হাসপাতাল, ম্যাজিস্ট্রেটকে মাজিষ্টর, কন্ট্রাক্টরকে কন্টাকদার, গভর্ণমেন্টকে গবরমেন্ট, ট্রেজারিকে তেরজুরি, স্টাম্পকে ইষ্টাম্বর, স্কুলকে ইশ্‌কুল, স্টেশনকে ইশটিশন, টিকিটকে টিকট, ডাবলকে ডবল, গ্রেটিংকে গেরাটিন, সিমেন্টকে বিলাতী মাটি, ক্যাপ্টেনকে কাপ্‌তান, টার্পেন্টাইনকে তার্পিন, অফিসকে অফিস, কর্নিসকে কারনিশ, টর্চলাইটকে টিপ বাতি, টিউবওয়েলকে টিপকল, ব্রাশকে বুরুশ, কেটলকে কেৎলি ইত্যাদি হাজারো বিদেশী শব্দকে সহজ ও মিষ্টি দেশী শব্দে পরিণত করিয়াছে। এই সরল রূপে সে শব্দ বেমালুম বাংলা শব্দ হইয়া গিয়াছে।

গত মহাযুদ্ধের সময় নোয়াখালির জনসাধারণের মুখে টর্পোডার শুনিয়াছিলাম তলপেডা। গর্বিত বিস্ময়ে পুলকিত হইয়াছিলাম। শ্রদ্ধাভরে ঐ পরিভাষা মানিয়া লইয়াছিলাম।

এই প্রসেস অবিরাম আজও চলিতেছে। চলিবে। দালান–ইমারতের রাজ–মিস্ত্রী যোগালিয়া, জাহাজের খালাসি–সুকানি, কেবিনেট–ফার্মের কাঠ মিস্ত্রী, কলকারখানার মিকানিক, মিলের শ্রমিক, ছাপখানার কম্পোজিটর মেশিনম্যান ইত্যাদি হাজার হাজার ভাষাকার আমাদেরা জন্য পরিভাষা রচনার কাজ করিয়া যাইতেছেন। এদের মুখে উচ্চারিত বিদেশী শব্দসমূহের যে রূপকে পণ্ডিতেরা বলেন অপভ্রংশ, আসলে সে গুলিই ঐসব শব্দের বাংলা রূপ, সুতরাং আমাদের পরিভাষা। আপনারা পরিভাষার তালাশে অভিধান লুগাত ডিকশনারি না ঘাঁটিয়া এদের কাছে যান।

আমার ব্যক্তিগত জীবনের একটি অভিজ্ঞতার কথা বলিতেছি। ইংরাজী নভেল 'বেণ্ড অব দি রিভার' এলবো অব দি রিভার' ও 'বাল্‌জ অব দি রিভারের' পুনঃ পুনঃ উল্লেখ দেখিয়া ওদের বাংলা প্রতিশব্দ খুঁজিতে লাগিয়া গেলাম।

অনেক অভিধান ঘাঁটিলাম। অনেক বন্ধুকে ত্যক্ত করিলাম। মস্তিষ্ক আলোড়ন করিলাম। ফল হইল না। 'বেণ্ড' এ 'এলবো' দুইটাই নদীর বাঁক, বলে অভিধানেরা। বন্ধুরাও বলেন তাই। কিন্তু শব্দ দুইটির প্রয়োগ তা বলে না। আর 'বালজের' অর্থ অভিধানের মতে কোন জিনিসের প্রশস্ত, স্ফীত বা উদগত অংশ। এর একটাও নদীর ব্যাপারে বোধগম্য নয়। কাজেই আমার মাথার বিষ নামিল না।

www.pathagar.com

এমন সময় গ্রামের বাড়িতে গেলাম। ক্ষেত-খামার দেখিতে কামলাদের কাছেও যাইতে হইল। তারা নদীর ধারে কাজ করিতেছিল। ছোট নদী। আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়াছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি নদীর বালুজ দেখিলাম। বেও এবং এলবোর পার্থক্যও বুঝিলাম। কামলাদের সাথে আলাপে বুঝিলাম গাংগের বাঁক ঠেশ ও কুনিভাংগা ওদের জন্য মামুলি শব্দ।

বাড়ি যাওয়ার এমন আনন্দ এর আগে আর পাই নাই। কারণ গ্রামে গিয়াছিলাম জ্ঞান বিতরণের অহংকার লইয়া। ফিরিয়া আসিলাম জ্ঞান লাভ করিয়া শ্রদ্ধাবনত মস্তকে। এইভাবে ল্যাংগুয়েজ ফর্মেশনের ও ভকেবোলারি সৃষ্টির যে কাজটি আমাদের অলক্ষ্যে জনগণের মধ্যে চলিতেছে, বাংলাকে শিক্ষার মাধ্যম করার সাথে-সাথে এ কাজ শিক্ষিত সমাজেও শুরু হইবে। তাতে এর প্রসেস দ্রুত হইবে এবং এলাকা কুশাদা হইবে।

চাকুরির বিপদ

সরকারী আধা-সরকারী দফতরে, বেসরকারী অফিসে, ব্যবসা-বাণিজ্যের ফার্মে বাংলা প্রচলিত হওয়ার আগে বাংলার মাধ্যমে ডিগ্রি হাসিলের বিপদ আছে বলিয়া যে আশংকা করা হয় সেটা অহেতুক নয়। কিন্তু ওটা গাছ ও বীজের মতোই লজিকের পিটিশিও প্রিন্সিপিআই, বেগিং দি কোশচেন বা তর্কশাস্ত্রের আন্ধা চক্কর। শিক্ষা আগে না চাকুরি আগে? ভার্সিটির বলিতে পারেন : 'ডিমাণ্ড না হইলে সাপ্লাই দিব কোথায়? বাংলায় চাকুরির সংস্থান না হওয়া পর্যন্ত বাংলায় শিক্ষা দিতে পারি না'।

সরকার ও অন্যান্য মনিবরা বলিতে পারেন : 'আগে বাংলায় আমাদের কাজের যোগ্য লোক তৈয়ার কর, তারপর আমরা বাংলা চালাইব'।

আসলে দুইটাই এক সংগে হইবে। ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের মর্মকথা তাই। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবির মধ্যে সবই নিহিত আছে। ছাত্র-তরুণদের কাজ তারা করিয়াছে। সরকার সুধী সমাজ ও ভার্সিটিরা তাঁদের কাজ করেন নাই। তাই-আজও 'বাংলা প্রচলনের' 'সপ্তাহ' পালন দরকার হইতেছে। শিক্ষাদাতা ও চাকুরিদাতা উভয়েই কর্তব্যে অবহেলা করিতেছেন সমানভাবে। কাজেই আজিকার আন্দোলন আংশিক আন্দোলন নয়, সামগ্রিক। শিক্ষার মাধ্যম করার দাবি স্বীকৃত হইলে চাকুরির মাধ্যম করার দাবিও অটমেটিক্যালি স্বীকৃত হইবে।

শিক্ষকের অভাব

উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব যদি সত্যই থাকিয়া থাকে তবে বই-এর অভাবের মতোই সেটা মিটিবে বাংলা চালাইবার পরে, আগে নয়। পশ্চিম-পাকিস্তানে উর্দু চালানোর ফলে বাংগালী শিক্ষকদের যদি চাকুরি না গিয়া থাকে, তবে পূর্ব-পাকিস্তানে বাংলা চালাইবার ফলেও উর্দু-ওয়ালাদের চাকুরি যাইবে না। যদি যায়ও তবু কোটি-কোটি লোকের কল্যাণের জন্য তাঁদের স্যাক্রিফাইস করা উচিত। পাক-ভারতের স্বাধীনতা লাভে অনেক ইংরাজের চাকরি গিয়াছে। তবু ঐ যুক্তিতে কেউ আমাদের স্বাধীনতার বিরোধিতা করে নাই।

বাংলা প্রচলনের দাবিকে কেউ কেউ রাজনৈতিক দাবি বলিতেছেন। এঁদের মতে শিক্ষায় রাজনীতি আনা সাংঘাতিক বিপজ্জনক। এঁরা বলেন, শিক্ষা ব্যাপারটা

www.pathagar.com

শিক্ষাবিদদের উপরই ছাড়িয়া দেওয়া উচিত। পলিটিক্স ঢুকিলে শিক্ষার মান পড়িয়া যাইবে। শিক্ষা গোল্লায় যাইবে।

এঁদের কথা শুনিয়া ১৯৪১-৪২ সালের কলিকাতার কথা মনে পড়িয়া গেল।

হক মন্ত্রিসভা যখন সেকেণ্ডারি এডুকেশনকে কলিকাতা ইউনিভার্সিটির হাত হইতে নিয়া একটি বোর্ডের হাতে দিতে চাহিলেন, তখন হিন্দু শিক্ষাবিদদের মুখে এই ধরনের আশংকার কথাই শুনিয়াছিলাম। এঁরা আসলে শিক্ষা অর্থে বুঝেন মুষ্টিমেয় লোকের পাণ্ডিত্য, জনগণের শিক্ষা বুঝেন না।

শিক্ষার মান না জাতির মান

শিক্ষার মানের জন্য এঁরা জাতির মান কোরবানি করিতে পারেন। এঁরা শরৎচন্দ্রের টগর বৈষ্টবী। জাত দিতে রাজী কিন্তু হেঁসেলের পবিত্রতা নষ্ট করিতে রাজী নন। দেশের শতকরা নব্বই জন মূর্খ থাকিলেও ক্ষতি নাই। দশ জন শুদ্ধ ইংরাজী বলিতে পারিলেই এবং দু-একজন অক্সফোর্ড হার্বার্ড পাস করিলেই হইল। এঁরাই শিক্ষার মানের নামে কঠিন প্রশ্ন করিয়া শতকরা পঞ্চাশ-ষাইট জন পরীক্ষার্থীকে ফেল করাইতে গর্ব বোধ করেন। এঁদের অহংকার : আমাদের সেকেণ্ড ক্লাস পশ্চিম-পাকিস্তানের ফার্স্ট ক্লাসের চেয়েও উচ্চ মানের। এই মানের অভিমানেই এঁরা আমাদের ছেলেদের ফার্স্ট ক্লাস দেন না। সরকারী চাকরির বেলা কিন্তু পশ্চিমের ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট ক্লাসই এবং আমাদের সেকেণ্ড ক্লাস সেকেণ্ডই। সুতরাং সেকেণ্ড ক্লাসের এপ্লিকেশন রিজেকটেড। এইভাবে দরিদ্র দেশবাসীর সামনে বিদ্যালয়ের দরজা সশব্দে বন্ধ করিয়া দিতে এঁদের বুক কাঁপিয়া উঠেনা।

আমার ব্যক্তিগত জীবনের একটা অভিজ্ঞতার কথা কই। ১৯৫৬ সালে আমি ছয় দিনের জন্য পূর্ব-পাকিস্তানের শিক্ষা মন্ত্রী হইয়াছিলাম। মন্ত্রী হইয়াই প্রথম কাজটা করিলাম এই : ভাইস-চ্যান্সেলরসহ বড় বড় শিক্ষাবিদকে লইয়া পরামর্শ সভায় বসিলাম। আমার প্রস্তাবিত শিক্ষানীতির কথা বলিলাম। আমার ইচ্ছা : এ বছর শতকরা আশি, তার পর বছর নব্বই এবং তৃতীয় বছরে শতকরা একশ' জন পরীক্ষার্থীকে পাস করাইতে হইবে।

অনেকেই স্তম্ভিত হইলেন। বোধ হয় ভাবিলেন : এ কোন্ গজমূর্খ শিক্ষামন্ত্রীর পাল্লায় পড়া গেল? কেউ- কেউ বলিলেন : কেমন করিয়া তা হয়? প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারিলেও পাশ করাইতে হইবে?

আমি জোরের সাথেই বলিলাম : জি হ্যাঁ। উত্তর না দিলেও পাস করাইতে হইবে।

তাঁরা বলিলেন : শিক্ষার মান যে নামিয়া পড়িবে স্যার।

আমি বলিলাম : নামুক না এক-আধটু শিক্ষার মান। আমাদের দেশে সব জিনিসের মানই ত নামিয়াছে। মন্ত্রিত্বের মান না নামিলে আমি কি শিক্ষামন্ত্রী হইতে পারিতাম? আপনারাই কি সকলে হেড অব-দি ডিপার্টমেন্ট হইতে পারিতেন? কেরানী প্রধানমন্ত্রী হইয়াছেন, দারোগা এস. পি. হইয়াছেন, পাকিস্তান হওয়ার ফলেই। এই পাকিস্তান আনিয়াছে ছাত্ররা। তারাও এর এক আধটু ফলভোগ করুক না।

www.pathagar.com

পরীক্ষা নয় শিক্ষা কনট্রোল

এটা রাজনীতি? শিক্ষায় পলিটিকস? শিক্ষাবিদরা তাই মনে করেন। তাঁরা প্রমাদ গণিলেন। কিন্তু আশা ছাড়িলেন না।

বলিলেন : কি করিয়া হইবে স্যার, পড়াশোনা ঠিকমতো হয় না। বই-পুস্তক সময়মতো পাওয়া যায় না। দরকারমতো শিক্ষকও নাই।

'আপনাদের সব কথাই ঠিক।' আমি বলিলাম, 'কিন্তু সেজন্য শাস্তি পাইবে কি ছাত্ররা? শাস্তি যদি কারও পাইতে হয়, তবে পাইবেন তা শিক্ষা-বিভাগ শিক্ষা-দফতর আর মন্ত্রীরা। ছাত্ররা পাইবে কেন? জানেন, ছেলেদের ফেল করাইয়া আপনারা কাকে শাস্তি দিতেছেন? এটা জানেন আপনারা, যে-সব সাবজেক্টের জন্য একটা ছেলেকে ফেল করাইয়া তার জীবনের মোড় ফিরাইয়া দিলেন, বাস্তব জীবনে সে সাবজেক্টের দাম কি? কখনও খোঁজ লইয়া দেখিয়াছেন কি, যে-ছেলেটা ফেল করিল তার বাবা জমি বন্ধক দিয়া পরীক্ষার ফিস দিয়াছিল? ছেলেটা ম্যাট্রিক পাস করিয়া চাকুরি করিত, বাপের দেনা শোধ করিত, ছোট ভাইদের লেখাপড়ার খরচ বহন করিত। ইংরেজী আরবী ইতিহাস ভূগোলের জন্য ছেলেটাকে ফেল করাইয়া আপনারা একটা ছেলের মধ্য দিয়া একটা গোটা পরিবারের ভবিষ্যতের কপালে আগুন ধরাইয়া দিয়াছেন, সে খবর রাখেন আপনেরা কেউ?

এ সবই হয় ইমোশন্যাল আউটবার্স্ট অথবা পলিটিক্যাল স্টান্ট! এসব দিয়া শিক্ষার মতো পবিত্র কাজ নিয়ন্ত্রণ চলে না।

কাজেই শিক্ষাবিদদের বেশির ভাগই শিক্ষার উপর কালাপাহাড়ী হামলার আশংকায় চিন্তিত মনে বাড়ি ফিরিলেন। বোধ হয় প্রার্থনা টার্থনাও করিলেন। তাঁদের সে প্রার্থনা কবুল হইল। কয়েকদিনের মধ্যেই আমি কেন্দ্রের মন্ত্রী হইয়া করাচী চলিয়া গেলাম। ঢাকার শিক্ষার মানের একটা আসন্ন ফাঁড়া কাটিয়া গেল।

ফাঁড়া কাটিল। ফাঁড়ি জোরদার হইল। পুলিশের ফাঁড়ির চেয়েও প্রতাপশালী। শিক্ষার পথে আগ বাড়িতে গেলেই হুংকার দিয়া উঠে ঃ হু গোয দেয়ার? কৌন ওধার জাতা হ্যায়?

ভীতু শিক্ষার্থী পালাইয়া প্রাণ বাঁচায়। সাকসেসফুল কনট্রোল। সব দেশে শিক্ষিতের সংখ্যা বাড়ে। পশ্চিম-পাকিস্তানেও। কিন্তু আমাদের দেশে কমে। সেনসাস রিপোর্ট খুলিয়া দেখুন ঃ '৫১ সালে পূর্ব-পাকিস্তানে গ্র্যাজুয়েটের সংখ্যা ৪১,৪৮৪। '৬১ সালে ২৮,০৬৯। '৫১ সালে পোষ্ট-গ্র্যাজুয়েটের সংখ্যা ৮,১১৭। '৬১ সালে তাদের সংখ্যা ৭,১৬৪। এ সবই ফাঁড়ির প্রতাপে। অপর দিকে পশ্চিম-পাকিস্তানে গ্র্যাজুয়েটের সংখ্যা ছিল '৫১ সাল ৪৪,৫০৪। '৬১ সালে ৮৪,০০০। সেখানে পোষ্ট-গ্র্যাজুয়েট ছিল '৫১ সালে ১৪,৪২৯। '৬১ সালে হইয়াছে ২৪,৩৫৪। ম্যাট্রিকের কথা শুনিবেন? '৫১ সালে পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যা ছিল ২,৮২,১৫৮। পশ্চিম-পাকিস্তানের ছিল ২,৩৯,৬৯৮। '৬১ সালে পূর্বে হইয়াছে। ২,৮৯,৯৫৭ আর পশ্চিমে হইয়াছে ৫,৮৪,১৮১।

এইভাবে আমরা শিক্ষিতের সংখ্যা কমাইয়া শিক্ষার মান বজায় রাখিয়াছি। পশ্চিমা ভাইরা রাখেন নাই। তাই তাঁরা উর্দুকে মিডিয়াম করিতেও পারিয়াছেন। আমরা পারিনাই।

www.pathagar.com

আমরা আরও ত্রিশ বছর ইংরেজী রাখিতে চাই। ত্রিশ বছর সময় গণিয়া-গাঁথিয়াই চাওয়া হইয়াছে। '৫১ সালে হইতে '৬১ সাল। দশ বছরে আমরা গ্র্যাজুয়েটের সংখ্যা ৪১ হাজার হইতে ২৮ হাজারে নামাইতে পারিয়াছি। দশ বছরে ১৩ হাজার! ২৮ হাজারকে 'জিরোতে'তে নামাইতে বিশ বছরের বেশি লাগিবার কথা নয়। তবু ত্রিশ বছর চাহিলাম সাবধানের মার নাই।

শিক্ষায় রাজনীতি

এ অবস্থায় শিক্ষাকে রাজনীতি হইতে অর্থাৎ সরকারী প্রভাব হইতে দূরে রাখিবেন? শুধু শিক্ষাবিদের হাতে ছাড়িয়া দিবেন?

এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছে কয়েক মাস আগের "টাইম-ম্যাগাজিন"। আপনাদের অনেকেই নিশ্চয়ই তা পড়িয়াছেন। ঐ সংখ্যার কভার ফিচার : 'এডুকেশন ইজ টু বি লেফট সোল্‌লি উইথ দি এডুকেটর' অর্থাৎ শিক্ষা জাতীয় জীবনের এত বড় জরুরী ব্যাপার যে, এর দায়িত্ব শুধু শিক্ষাবিদের হাতে ফেলিয়া রাখা যায় না।

কথাটা অতীব সত্য। যেমন : জনস্বাস্থ্যকে শুধু ডাক্তারদের হাতে ফেলিয়া রাখা যায় না। ঐ প্রবন্ধে আপনারা দেখিয়াছেন, বর্তমানে সাড়ে উনিশ কোটি মার্কিনীর মধ্যে সাড়ে পাঁচ কোটি ছাত্র-ছাত্রী স্কুল-কলেজে পড়িতেছে। এই বিপুলায়তনের শিক্ষা-তরীর যিনি হাল ধরিয়া আছেন, যাঁর ইশারায় বিশ লক্ষ শিক্ষক সে তরীর বৈঠা বাহিতেছেন, তাঁর নাম ফ্রান্সিস কেপেল। তিনি আণ্ডারগ্র্যাজুয়েট। বয়স তাঁর ৪৯। বিশ লক্ষ শিক্ষকের সবাই ডিগ্রিতে তাঁর উপরে। বয়সেও অনেকেই তাঁর বড়।

কিন্তু কারও মনে সে অভিমান নাই। কারণ, কেবল সরকারের পক্ষে জাতির গার্জিয়ান। শিক্ষাটা দিবে নিশ্চয়ই শিক্ষকরাই। কিন্তু কি শিক্ষা দিবেন, সেটা ঠিক করিবেন ছাত্রের বাপ। জাতির বাপ সরকার। গণতন্ত্রের সরকার মানেই রাজনীতি।

এটাই স্বাভাবিক। বিদ্যালাভ এখন আর কতিপয় বড় লোকের বিশেষ অধিকার নয়। শিক্ষার মানেই এখন জনগণের শিক্ষা। শিক্ষার স্ট্যাণ্ডার্ড মানে জ্ঞানের স্ট্যাণ্ডার্ড, মিডিয়ামের স্ট্যাণ্ডার্ড নয়। ইংরাজীতে শিক্ষা দিলেই শিক্ষার মান উন্নত হয় না। যাঁরা কিণ্ডার গার্টেন স্কুল ইংরাজী মিডিয়ামে ছেলেমেয়েদের বাল্য শিক্ষা শুরু করিয়া ভাবিতেছেন সন্তানদের শিক্ষার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করিতেছেন, তাঁরা আসলে ওদের জীবনের ভবিষ্যৎ অন্ধকার করিতেছেন। যাঁরা ছেলেদের সি. এস. পি. ও মিলিটারী সার্ভিসের উপযোগী স্মার্ট করিবার আশায় তাদেরে তথাকথিত ক্যাডেট কলেজে ইংরাজীর মাধ্যমে ম্যাট্রিক আই. এ. পড়াইতেছেন, তাঁরাও তাই করিতেছেন। অধিকন্তু মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করার সার্বজনীন দাবির প্রতিবাদ করিতেছেন তাঁরা নিজেদের কাজের দ্বারা।

এঁরা ভুলিয়া যান, চল্লিশ বছরের যে শিক্ষা-লব্ধ জ্ঞানের বলে রুশ জাতি চাঁদের বুকে রুশ নিশান গাড়িয়াছে, সে শিক্ষা তারা পাইয়াছে রুশ ভাষার মাধ্যমে, ইংরাজীর মাধ্যমে নয়। আর মিলিটারী শক্তির কথা? হিটলার জার্মান জাতির যে অজেয় ও দুর্বার মিলিটারী শক্তি নির্মাণ করিয়াছিলেন, সেটা তিনি করিয়াছিলেন, জার্মানদের মাতৃভাষাতেই। সেই অজেয় শক্তিকে চুরমার করিয়া স্ট্যালিনগ্রাড রক্ষা করিয়াছিলেন

www.pathagar.com

যে রুশ বীরেরা তাঁরাও মিলিটারী স্মার্টনেস অর্জন করিয়াছিলেন নিজেদের মাতৃভাষাতেই। আসলে জ্ঞানের মধ্যেই ভাষা নিহিত, ভাষার মধ্যে জ্ঞান নিহিত নাই।

বিদেশী শিক্ষার আমি বিরোধিতা করিতেছি না। বিদেশী ভাষা শিক্ষা নিশ্চয় দরকার। সব সভ্য জাতিই তা করিতেছে। জ্ঞান বিজ্ঞান ও যোগযোগ ব্যবস্থায় উন্নতিতে দুনিয়া-জাহান আর আগের মতো বিচ্ছিন্ন নাই। আকারেও অনেক ছোট হইয়া গিয়াছে। আন্তর্জাতিক মিলামিশা অনেক ঘনিষ্ঠ হইয়াছে। আরও হইবে। রাজনৈতিক বাণিজ্যিক ও কৃষ্টিক কারণে সবাইকে সবার ভাষা শিখিতে হইবে। আমরাও শিখিব। কিন্তু সেটা হইবে অন্যান্য সভ্যজাতির মতোই। বিদেশী ভাষা শিখিব আমরা মাতৃভাষায় শিক্ষিত হইবার পর, আগে নয়। একজন শিক্ষিত লোক মাত্র তিন বছরে যে কোনও বিদেশী ভাষায় ব্যুৎপন্ন হইতে পারে। আর সবচেয়ে বড় কথা, কোনও অবস্থাতেই গোটা জাতিকে বিদেশী ভাষা শিখিতে হইবে না।

অতএব, কোনও যুক্তিতেই বাংলাকে শিক্ষার মাধ্যম করার মতো জাতীয় জীবনের জরুরী কাজে একদিনের জন্যও বিলম্ব করা যায় না।

২১শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৬।

www.pathagar.com

আনন্দের জোয়ার ঈদুল-ফিতর

রোজা ও ঈদ

ঈদ অর্থ আনন্দ-উৎসব। ঈদুল-ফিতর অর্থ উপাস ভাংগার আনন্দ-উৎসব। এ উৎসবের আনন্দ যা-তা মামুলি আনন্দ নয়। এটা উল্লাস। যাকে বলে পুলকানন্দে ফাটিয়া পড়া। এ ঈদ আসে অনেক দিনের সাধনার পর। কি কঠোর কৃচ্ছ্র ও সংযম সাধনা তা। একটানা ত্রিশ দিনের নিরম্বু উপবাস। দিনে রোযা ও রাতে এবাদত। ইন্দ্রিয়েরা সবাই শৃঙ্খলিত বন্দী। এক মাস পরে পায় তারা মুক্তি। কি পুলক সে মুক্তিতে। সেই মুক্তির আনন্দেই এই উল্লাস। যেন বাঁধ-ভাংগা স্রোত। সেই বেগ সেই তেজ। আনন্দ-উৎসবকে গলা-ফাটানো উল্লাসের উন্মত্ততায় উদযাপন করা যদি কখনো প্রয়োজন ও সংগত হয়, তবে তা এই দিনে। এই কারণেই এই উৎসবের এই নাম। এ নাম তাৎপর্যপূর্ণ।

কিন্তু আমরা তা ভুলিয়া গিয়াছি। প্রতি বছর আমরা সে ভুলের পুনরাবৃত্তি করিতেছি; সে ভুল দোহরাইতেছি। প্রতি বছরে আমরা এই উপলক্ষে অনেক কিছু বলিতেছি বক্তৃতায়, লিখিতেছি বিশেষ সংখ্যার সাময়িকীতে। সবই ভক্তি গদগদ কণ্ঠের কথা। ভক্তিরসাপ্লুত লেখা। সে সব কথার যতটুকু আন্তরিক, যতটুকু অর্থপূর্ণ, তার সবটুকু রোযার কথা, ঈদের কথা নয়। রোযার আধ্যাত্মিক দিক নিশ্চয় আছে। রমজানের রোযার আরও বেশি আছে। রোযা সংযম। রমজানের রোযা সমবেত সামাজিক সংযম। এর শিক্ষা ও কল্যাণের একাধিক দিক আছে। তা বুঝিবার ও বলিবার দরকারও আছে খুবই।

রোযা কিন্তু ঈদ নয়। ঈদও রোযা নয়। ঈদুল-ফিতর রমজানের রোযা নয়। কিন্তু ঈদ-সংখ্যা কাগজে আমরা ঈদের মহিমা কীর্তনে যে বিদ্যাবুদ্ধি খরচ ও পাণ্ডিত্য জাহির করি, তার সব কথা সত্য হইলেও এগুলি ঈদের কথা নয়, রমযানের রোযারই কথা। রোযা ও ঈদ ত্যাগ ও ভোগের মতোই দুইটা অ্যান্টিথেসিস, বিপরীত গুণাত্মক কাজ। রমজানের বেলা একটা শর্ত আর একটা পুরস্কার; একটা ক্রিয়া আর একটা ফল। শ্রমের পুরস্কার যেমন বিশ্রাম, অধ্যয়নের পুরস্কার যেমন প্রমোশন, ত্যাগের পুরস্কার যেমন ভোগ, রমজানে রোজার পুরস্কার তেমনি ঈদুল-ফিতর।

কিন্তু আমরা দুইটাকে এক করিয়া ফেলিয়াছি। আমাদের আনন্দোৎসব হইয়া উঠিয়াছে এবাদতের উৎসব। এবাদত ও উৎসব একত্রে চলিতে পারে না। ফলে আমাদের ঈদের আনন্দের স্থান দখল করিয়াছে এককভাবে এবাদত। ঈদের দিন হইয়াছে এবাদতের দিন। ঈদের সমাবেশ হইয়াছে প্রার্থনা সভা। আমাদের সাংস্কৃতিক

www.pathagar.com

জীবনে এই দুর্ঘটনা ঘটে শুধুই পাক-ভারত উপমহাদেশে, বিশেষত পাক-বাংলায়। এমন হইবার ঐতিহাসিক কারণ আছে।

নিরানন্দের জন্ম

ছয়শ' বছরের শাসক জাতি মুসলমানরা ইংরাজের জুলুমে এক রাতে পথের ফকির হইয়া যায়। লুপ্ত রাজ্য ও স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করে তারা প্রায় একশ' বছর ধরিয়া। এই সময়ে প্রাণ ধারণই মুসলমানদের জন্য কঠিন হইয়া পড়িয়াছিল। আনন্দ উৎসব করিবার সামর্থ্য-সুযোগ তাদের ছিল না।

ইংরাজ শাসকদের সর্বাত্মক জুলুমবাযি চলে বাংলার মুসলমানদের উপরই বেশি। ওহাবী আন্দোলন ও সিপাহি বিদ্রোহ গণ-বিপ্লবের আকার ধারণ করে বাংলাতেই। ওদের যুলুম নিপীড়ন যত বাড়ে, মুসলিম নেতৃবৃন্দের সংকল্প হয় তত দৃঢ়। তাঁরা নিজেরা সকল প্রকার ভোগ-বিলাস ও আমোদ-উল্লাস বর্জন করেন এবং মুসলিম জনসাধারণকে করিতে বলেন। সাময়িক বিপদেই মানুষ উৎসব-আনন্দ বাতিল করে। বিপদ দীর্ঘস্থায়ী হইলে ত কথাই নাই।

কাজেই মুসলমানরা জাতীয় সংকটের দিনে অস্টারিটির নীতি হিসাবেই ঈদের দিনের উৎসবও যথা-সম্ভব সংক্ষিপ্ত করিয়াছিল। আমোদ-প্রমোদ বাতিল করিয়াছিল। ধর্মীয় অনুষ্ঠানটুকু না করিলেই নয় বলিয়া অনাড়ম্বর গুরু-গম্ভীর পরিবেশে তা সম্পন্ন করিত।

বিপদের দিনে সকল দিক হইতে বঞ্চিত ও নিরুপায় হইলে মানুষ বেশি ধার্মিক হয়। বিপদ-তারণ আল্লার দরগায় মোনাজাত করে। কাজেই আনন্দ-উৎসবের স্থান এবাদত-মোনাজাতে দখল করে জাতির জীবনে এমনি দুঃসময়ে। এই কৃচ্ছ্র সাধনা শতাব্দী কাল স্থায়ী হওয়ায় মুসলমানদের সামাজিক জীবন হইতে সকল প্রকার আনন্দ-উৎসব এবাদতের উৎসবে পরিণত হয় এই যুগে।

প্রতিষেধকের আবশ্যকতা

আসলে ঈদ ঈদই, এবাদত নয়। ঈদের জমাতে দুই রাকাত নামাজের বিধান আছে বলিয়াই ঈদের সমাবেশ প্রার্থনা-সভা হইয়া যায় নাই। নামাজের বিধান করা হইয়াছে বিশেষ এক উদ্দেশ্যে, অভিনব এক ধরনে। এই নামাজের ধরন ও শরিয়তী বিধান একটু তলাইয়া বিচার করিলেই সে বিশেষ উদ্দেশ্য স্পষ্ট বোঝা যাইবে। সে উদ্দেশ্যে সাবধানতা; প্রতিষেধকের ব্যবস্থা। দীর্ঘ সংযমের শেষে যখন মানুষকে ভোগের অধিকার দেওয়া হয়, তখন এই সাবধানতাটুকুর দরকার হয়। মানুষের মনের অবস্থা হয় তখন সদ্যমুক্ত দীর্ঘ দিনের কয়েদীর মতো। তার ভোগ স্পৃহা হয় খাঁচাছাড়া পাখীর মত উদ্দাম। লালসায় আসে তার প্রবল বন্যা, বিপুলা জোয়ার। মানুষ ভাসিয়া যাইতে পারে সে বন্যায়।

সে ইন্দ্রিয় সেবায় উন্মত্ত হইতে পারে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, অতীতে অমন অনেক হইয়াছে। ধর্মীয় আনন্দোৎসব বীভৎস অনাচারের ভৈরবী চক্রে রূপান্তরিত হইয়াছে, তীর্থস্থান ব্যভিচারের আড্ডায় পরিণত হইয়াছে, এমন নজিরে ইতিহাসের

www.pathagar.com

পৃষ্ঠা ভর্তি। প্রতিষেধকের সাবধানতা অবলম্বন করা হয় নাই বলিয়াই এসব ঘটিয়াছে।

তাই ইসলামে এই প্রতিষেধকের ব্যবস্থা করা হইয়াছে দুই রাকাত নমাজের বিধান করিয়া। ঈদের উৎসবের সাথে দুই রাকাত নামাজ জুড়িয়া দিয়া শরিয়ত মুসলমানদেরে শুধু এই কথাটাই স্মরণ করাইয়া দিয়াছে যে, উল্লাসের আতিশয্যে তারা যেন খোদাকে ভুলিয়া না যায়। তাই বলিয়া ঐ দুই রাকাত নামাজে আনন্দোৎসবকে এবাদতের পরব করিয়া ফেলে নাই।

দুই রাকাত নামাজের বিধান করিতে গিয়াও শরিয়ত যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছে। নামাজ ধর্মীয় অনুষ্ঠান। ধর্মীয় অনুষ্ঠান গুরু-গম্ভীর ব্যাপার। সে অনুষ্ঠানে আমোদ-প্রমোদ করিলে ধর্মকে লঘু করা হয়। তাকে অসম্মান করা হয়। এই বিশ্বাসে মুসলমানরা ঈদের দিনে আমোদ-উল্লাস হইতে বিরত না থাকে সেই উদ্দেশ্যেই ঈদের নামাজে জুমা ও ওয়াকতিয়া নমাজের আহকাম-আরকান পুরাপুরি প্রয়োগ করা হয় নাই। এটা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

ঈদের নমায বনাম সালাত

এক, ঈদের জমাতের মতো বড় জনসমাবেশের জন্য মাত্র দুই রাকাত নামাজের বিধান করা হইয়াছে। মুসলমান মাত্রেই জানেন যে, দুই রাকাতের কমে নমায হয় না। কাজেই ঈদের নমায স্পষ্টতই সংক্ষেপতম করা হইয়াছে। ঈদ অনুষ্ঠানকে এবাদতের অনুষ্ঠান করিবার ইচ্ছা থাকিলে অন্তত জুমার নমাযের মতো বার রাকাত নমাযের ব্যবস্থা করা হইত।

জুমার নমায হয় সপ্তাহে একবার। ঈদুল-ফিতরের নমায হয় বছরে একবার। বহু জামে-মসজিদের মুসল্লীদের এবং আরও অনেকের সমাবেশ হয় ঈদের ময়দানে। বড় জমাতে এবাদত করিবার এমন সুযোগেও শরিয়তে ফরয নমাযের ব্যবস্থা করা হইল না ঈদের জমাতে। এই বিধান হইতে এটা পরিষ্কার বোঝা যায় ঈদ পর্বকে এবাদতের অনুষ্ঠান করা শরিয়তের অভিপ্রায় নয়। তাড়াতাড়ি ধর্মীয় অনুষ্ঠানটি সারিয়া মুসলমানরা যাতে আনন্দ-উল্লাসে শরিক হইতে পারে সেই উদ্দেশ্যেই সংক্ষিপ্ততম মিনিমাম নমাযের বিধান করা হইয়াছে।

দুই, এই মুখ্তসর নমাযটুকুকেও ফরয করা হয় নাই। বড়জোর সুন্নাতে-মোয়াক্কেদা করা হইয়াছে। এটা লক্ষ করার বিষয় যে, ধর্মানুষ্ঠান হিসাবে দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত ও সাপ্তাহিক এক ওয়াক্ত জুমার নমাযের যে বিধান করা হইয়াছে তার একটিও ফরয-ছাড়া নয়। শুধু ঈদের নমাযই ফরয-ছাড়া।

তিন, ঈদের দুই রাকাত নমাযকেও সালাতের পূর্ণ মর্যাদা দেওয়া হয় নাই। সালাতের অনেক বাধ্যতামূলক আরকান ঈদের নমাযে নাই। যথা :

ক. জমাতের নমাযের শুরুতে আযান ও একামত অবশ্যই দিতে হইবে। ঈদের নমাযে আান ও একামত নিষিদ্ধ।

খ. ফরয নমায ছাড়া আর কোনো নমায জমাতে অর্থাৎ সমবেতভাবে ইমামের পিছে পড়ার বিধান নাই। কিন্তু ঈদের নমাযটুকু জমাতে ইমামের পিছে পড়িতে হয়।

গ. সুন্নত নমাযে জোরে কেরাআত পড়া নিষিদ্ধ। কিন্তু ঈদের নমাযে জোরে কেরাআত পড়তে হয়।

www.pathagar.com

ঘ. ঈদের নির্দিষ্ট দুই রাকাত সুন্নতের অতিরিক্ত কোনও নফল নমায পড়া নিষিদ্ধ।

ঙ. হায়েজওয়ালী স্ত্রীলোকের জন্য নমায নিষিদ্ধ। অথচ তাদেরের ঈদের জমাতে শামিল হইবার জন্য তাগিদ করা হইয়াছে।

চ. জুমার নমাযের খোৎবা খোৎবায়ে-আউয়াল ও খোৎবায়েসানি দুই ভাগে ভাগ করিয়া পড়িতে হয় এবং খোৎবার মাঝখানে বসিতে হয়। কিন্তু ঈদের খোৎবা একটানে পড়িয়া ফেলা যায়।

চার, ঈদের দিনে রোজা রাখা হারাম করা হইয়াছে। অর্থাৎ এই আনন্দের দিনে কোনও মুসলমান আনন্দ-উল্লাস হইতে বিরত থাকিতে পারিবে না; ধর্মের নামেও না। তার মানে এই দিনে আনন্দ-উল্লাস করা বাধ্যতামূলক।

আনন্দের আবশ্যকতা

অতএব দেখা গেল, ঈদের দিনকে শরিয়ত ঈদের দিন হিসাবেই নির্ধারিত করিয়াছে, এবাদতের দিন নির্ধারিত করে নাই। তবু যে আমরা এ দেশে আনন্দের উৎসবকে এবাদতের অনুষ্ঠানে পরিণত করিয়াছি, তার কারণ ঐতিহাসিক। ইতিহাসের গতির অমোঘ আইন অনুসারেই তা ঘটিয়াছে।

ফলে তার অবশ্যম্ভাবী পরিণামও আমাদের ভুগিতে হইয়াছে। আনন্দোৎসবকে এবাদতের অনুষ্ঠানে পরিণত করায় আমাদের জাতির ঘোরতর লোকসান হইয়াছে। ব্যক্তিগত জীবনে যেমন, জাতীয় জীবনেও তেমন, অতিরিক্ত ধার্মিক হওয়া অধর্ম। সব ব্যাপারের মতোই ধর্ম কার্যেও আতিশয্য খারাপ। খেলার সময় খেলা পড়ার সময় পড়ার মতোই এবাদতের সময় এবাদত আমোদের সময় আমোদ, এটা খাঁটি সত্য কথা এবং জীবনের অলঙ্ঘনীয় কানুন। এ কানুন অমান্য করিলে শাস্তি পাইতে হইবে। মানুষের সকল ইন্দ্রিয়-বৃত্তিই আল্লার দেওয়া। ও-গুলির অসদ্ব্যবহার করা যেমন পাপ, ব্যবহার না করাও তেমনি পাপ। সে পাপ শুধু পরকালের পাপ নয়, ইহকালের জন্যও।

মানুষের চেতনার কল তিনটি : মন অন্তর ও আত্মা। এর একটিকেও বিকল করা চলে না। তিনটিরই উন্মেষ ও বিকাশ দরকার। তা না হইলে মানব পূর্ণাংগ মানুষ হয় না। আনন্দ এই তিনটি কলের উন্মেষ ও বিকাশের জন্য সমান প্রয়োজন। মানুষের আনন্দের ক্ষুধা তার পেটের ক্ষুধা ও যৌন-ক্ষুধার মতোই বাস্তব ও তীব্র। এ ক্ষুধা মানুষের জৈবগুণ। সুতরাং প্রকৃতি! এই ক্ষুধা মানুষের চেতনার তিনটি যন্ত্রেই পরিব্যাপ্ত।

খোদার সৃষ্টি-কৌশলই এমন যে, মানুষের মনে অন্তরে ও আত্মায় এমন কোনও ঘটনা ঘটে না যা তার দেহে স্পন্দিত হয় না। এ অবস্থায় মানুষের আনন্দের ক্ষুধাকে দমাইয়া রাখা পেটের ক্ষুধা ও যৌন ক্ষুধা দমাইয়া রাখার মতোই প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। অধিক খাওয়াও যেমন স্বাস্থ্য-হানিকর, উপাস থাকাও তেমনি স্বাস্থ্য-নাশক। আনন্দ-ক্ষুধা সম্বন্ধেও এই কথাই সত্য।

এই কারণেই কোনও ধর্মই আনন্দ-উল্লাস নিষিদ্ধ করে নাই। ইসলাম ত করে নাই-ই। আল্লাহর-দেওয়া সমস্ত নিয়ামত উপভোগ করা তাঁরই নির্দেশ। জীবনের আনন্দ হইতে নিজেকে বঞ্চিত রাখার নামই বৈরাগ্য। ইসলামে বৈরাগ্য হারাম।

www.pathagar.com

সীমা লংঘন

কিন্তু আমাদের সমাজ-সংস্কারকরা এক হদ ঠেকাইতে গিয়া আর এক হদে চলিয়া গিয়াছেন। এক সীমা রাখিতে গিয়া আরেক সীমা ভাংগিয়াছেন। এক সীমা রাখিতে গিয়া আরেক সীমা ভাংগিয়াছেন। আমোদ-প্রমোদের মধ্য দিয়া পাপচার আসে বলিয়া তাঁরা আমোদ-প্রমোদই নিষিদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এ যেন আংগুরে মদ তৈয়ার বলিয়া আংগুর খাওয়া ও আংগুরের আবাদ বন্ধ করিয়া দেওয়া। আমাদের সমাজপতিরা কিন্তু তাই করিয়াছেন।

এইভাবেই আমাদের উপাস-ভাংগা উল্লাসের উৎসবটা হইয়া পড়িয়াছে প্রার্থনা-সভা। রোজা শেষে ঈদের আনন্দে যেখানে প্রাণ-প্রাচুর্যে আমাদের জীবনের দুকূল ছাপাইয়া পড়া উচিত ছিল সেখানে সেদিনেও আমরা ধর্মভারে নুইয়া গুরু-গাম্ভীর্যের মধ্যে দিন কাটাইবার চেষ্টা করিতেছি।

ধর্মোৎসবের ধর্মটুকু উৎসবের উল্লাস-ধ্বনির নিচে চাপা পড়ার নজির দুনিয়াতে মাত্র একটি। সেটি আমাদের ঈদ। ঈদের দিনে আমরা মাঠে গিয়া দুই রাকাত নামাজ পড়ি। রোদে পুড়িয়া খোৎবা শুনি। কিছু বুঝি, বেশির ভাগই বুঝি না। যা বুঝি তার সবই বহুবার শোনা কথা। মন বসে না।

খোৎবা শেষ হইলে দাঁড়াইয়া আশে-পাশের চিনা-জানা দু'চার-জনকে কোলাকুলি করি। ঘামে ভিজিয়া বাড়ি ফিরিয়া আসি। ভিজা কাপড় ছাড়ি। ব্যস্! ঈদ শেষ।

অখণ্ড মনোযোগে আমরা খোৎবা শুনিয়াছিলাম বলা চলে না। নমাযে আনন্দ পাইবার মত সূফী-দরবেশে আমাদের দেশ ভর্তি, একথাও বলা চলে না। কাজেই নিরস ধর্ম-কাজ করিয়াই বাড়ি ফিরিলাম।

এবার খাওয়ার পালা। ধনী-দরিদ্র-নির্বিশেষে সকল মুসলমানই ঈদের দিনে যার-তার সাধ্যমতো ভাল-ভাল খায়, ভাল-ভাল পরে। এটা অবশ্য ছোট-বড় সব জাতিই করে তাদের উৎসবে। আমরাও করি।

কিন্তু মন ও মস্তিষ্কের আনন্দ দিবার মতো কোনও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আমাদের ঈদে নাই। আমাদের আনন্দ খাওয়া-পরার মধ্যে সীমাবদ্ধ। অন্যান্য জাতি হইতে আমাদের পার্থক্য শুধু এইখানে।

এই পার্থক্য কল্যাণকর নয়। আগম-নির্গমে আসা-যাওয়ায় জাতির মনে যে আলোড়ন সৃষ্টি করে বার্ষিক ধর্মীয় উৎসবের আত্মিক গুরুত্ব ও তাৎপর্য শুধু সেইটুকু। সারা বছর ধরিয়া গণ-মন অধীর আগ্রহে এই উৎসবের অপেক্ষা করে। উৎসব-দিবসের নৈকট্যে মাশুকের আগমন সম্ভাবনায় আশেকের বুকের মতোই জাতির বুকে পুলক-স্পন্দন হয়। উৎসব আরম্ভে জাতির দেহের আনন্দ-শিহরণ ও মনের উল্লাস উন্মত্ততায় ফাটিয়া পড়ে। উৎসবের অবসান গণ-মনে জাতীয় চেতনার ছাপ, সংকল্পের রেখা ও কল্পনার রেশ রাখিয়া যায়। আসলে বার্ষিক ধর্মীয় উৎসবের মূল স্পিরিচুয়াল উদ্দেশ্য ইহাই।

www.pathagar.com

আনন্দোৎসবের তাৎপর্য

যে ধর্মীয় উৎসব জাতির মনে যতবেশী স্পন্দন সৃষ্টি ও যত গভীর রেখাপাত করিতে পারে, জাতীয় উৎসব হিসাবে তা তত বেশি সার্থক। ধর্মোৎসবই সকল জাতির কৃষ্টি-জীবনের বৃহত্তম উর্বর ক্ষেত্র। ধর্মীয় অনুষ্ঠানের স্কেলিটনের চার পাশ ঘিরিয়া সামাজিক আচার-আচরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের যে লহু-গোশত ও রগ-রেশা গড়িয়া উঠে তারই নাম ধর্মোৎসব। এই ধর্মোৎসবের বিকাশ-বিস্তৃতিই সব জাতির কালচারের ইনফ্রাস্ট্রাকচার। বস্তুত স্থপতি ভাস্কর্য শিল্প-সংগীত কাব্য-সাহিত্য জন্মলাভ করে এই ধর্মোৎসবকে ভিত্তি করিয়াই।

ধর্মোৎসবের বিশেষ গুণ এই যে, এ উৎসবের আয়োজন করে মুষ্টিমেয় ধনীলোকে, কিন্তু তার আনন্দ উপভোগ করে ধনী-নির্ধন সকলে। অন্য ধর্মের লোকও আকৃষ্ট হয়ে সে উৎসবে এবং শরিক হয় সে আনন্দে। এইভাবে উৎসব জাতীয় উৎসবে পরিণত হয়। এই কারণেই যে ধর্মীয় উৎসব গির্জা-মসজিদ-মন্দিরের বাহিরে যত বেশি বিস্তৃত ও প্রসারিত হয় জাতীয় রূপ পাইবার সম্ভাবনা হয় তার তত বেশি।

এই মাপকাঠিতে বিচার করিলে আমাদের আজিকার ঈদ সাংস্কৃতিক আনন্দোৎসব হিসাবে প্রাণহীন এবং জাতীয় উৎসব হিসাবে সম্ভাবনাহীন। আমাদের ঈদে আনন্দ নাই, আছে বেদনা। সংস্কৃতি নাই, আছে বিকৃতি। উল্লাস নাই, আছে আর্তনাদ। সুস্থ স্বাভাবিকরূপে নির্মল আনন্দ উপভোগ করিতে না পারিয়া আনন্দ-পাগল জনসাধরণ তাই পাপের পথে আনন্দ কুড়াইতেছে।

সাংস্কৃতিক আনন্দোৎসবের অভাবে তারা কুস্থানে গিয়া ও ক্লাবে পার্টিতে 'ঈদ বল' ড্যান্স করিয়া মুসলিম কৃষ্টিকে বুড়া আংগুল দেখাইতেছে। বিকলাংগ কুষ্ঠরোগী ও বেকার ভিক্ষাজীবী ছেলে-বুড়া নারী-পুরুষ ঈদের মাঠে ও রাস্তাঘাটে ভিড় ও আর্তনাদ করিয়া আমাদের আর্থিক সমাজ-ব্যবস্থাকে ও কৃষ্টিক দারিদ্র্যকে ধিক্কার দিতেছে। যে সমাজে আনন্দের ব্যবস্থা নাই, সেখানেই পাপ ও অপরাধ বেশি। জেলখানার কয়েদীর সংখ্যাই তার প্রমাণ।

আমাদের সুধী সমাজ ও তরুণরা এটা তীব্রভাবে অনুভব করিতেছেন। তাই তাঁরা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের অভাব দূর করার উদ্দেশ্যে ইদানিং ঈদ-রিইউনিয়নের আয়োজন করিয়া থাকেন। খুবই শুভ সূচনা। কিন্তু এই অনুষ্ঠান আজও খানা-পিনাতেই সীমাবদ্ধ। একে সাংস্কৃতিক অলংকার পরাইয়া তরুণদের প্রমাণ করিতে হইবে যে, আমাদের আনন্দ-উৎসবের চৌহদ্দি পেট নয়।

সাংস্কৃতিক আনন্দোৎসব

অতএব ঈদ উৎসবকে আমাদের সাংস্কৃতিক আনন্দোৎসব ও পাকিস্তানের জাতীয় উৎসবে পরিণত করা নিতান্ত প্রয়োজন। মুসলমানদের সামাজিক ও আত্মিক কল্যাণের জন্যই এটা দরকার। কাজটা তেমন কঠিন নয়। রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে সুধীজনের উদ্যমে আর্ট-সাহিত্যের মাধ্যমে ধর্মীয় ঐতিহ্যের সাংস্কৃতিক রূপায়ণ সম্ভব। অতীতে তা হইয়াছে। আমাদের বেলায়ও তা হইতে পারে।

www.pathagar.com

ধর্মের বিধান রদ-বদল করার মতো এখতেলাফী কাজে হাত দিবার কোনও দরকার হইবে না। মিলাদ অনুষ্ঠানের মতো কিছু কিছু বেদআতুল-হাসানার প্রবর্তন করিলেই চলিবে। প্রগতিবাদী ওলামাসহ সুধী-সমাজ সহজেই এটা করিতে পারেন। হযরত ইব্‌রাহিমের কোরবানির স্বপ্ন, হযরত মোহাম্মদের নবুওত হিজরত মেয়ারাজ জংগে-বদর মক্কা বিজয় বিদায়ী হজ ইত্যাদি স্মরণীয় ঐতিহাসিক ঘটনাকে আর্টের অলংকারে ভূষিত করিয়া দুই ঈদের উপযোগী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানরূপে প্রবর্তন করা যাইতে পারে। ঈদ-উৎসব দুইটিকে একদিন সমাপ্ত না করিয়া আমাদের মোহর্‌রম, হিন্দুদের দুর্গোৎসব, খৃষ্টানদের বড় দিন ও বৌদ্ধদের মাঘী পূর্ণিমার মতো একাধিক দিনে ব্যাপ্ত করা যায়।

শুধু এইভাবেই আমরা ধর্মীয় ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানকে নির্মল আনন্দের অফুরন্ত প্রস্রবণে পরিণত করিতে পারি এবং সে আনন্দ-রসের আবেহায়াতে গণমনকে সঞ্জীবিত এবং সমাজকে অপরাধমুক্ত রাখিতে পারি। ঈদ-রিইউনিয়ন, ঈদ-মেলা, ঈদ-জশন, ঈদ-যিয়াফত, ঈদ-মিছিল এই ধরনের যে কোনও নামে আমরা দুইটি ঈদকে প্রাণ-প্রাচুর্যের সাংস্কৃতিক আনান্দোৎসবে রূপায়িত করিয়া পাক-বাংলার আসমান-জমিন উল্লাস-মুখর ও জনগণের জীবন পুল্যকোজ্জ্বল করিতে পারি। আমাদের তরুণ চিন্তাবিদরা, লেখক-সাহিত্যিকরা এদিকে মনোযোগ দিবেন কি?

১লা শওয়াল, ১৩৮৪ হিজরি।

www.pathagar.com

আমার স্বপ্নের শহীদ মিনার

প্রতীকের মিনার

আজ একুইশা ফেব্রুয়ারি। শহীদ দিবস। আমাদের জাতীয় জীবনের স্মরণীয় দিন। ইতিহাসের পাতায় এই দিন অমলিন থাকিবে চিরকাল। কারণ এটা শুধু স্মৃতির দিন নয়। প্রতীকেরও দিন।

শহীদ মিনার তার স্থপতি রূপ। শহীদদের মুখে ধ্বনিত যে জীবনের বাণী প্রতিফলিত হইবার কথা আমাদের জাতীয় জীবনে, স্থপতি রূপে তাই প্রতিকৃত হইবার কথা শহীদ মিনারে। আমার দুঃখ, তা হয় নাই। জাতীয় জীবনে সে বাণী অংশত রূপায়িত হইয়াছে। শাসনতন্ত্রে আমাদের মাতৃভাষা রাষ্ট্রভাষারূপে স্বীকৃত হইয়াছে। জীবনের সকল ক্ষেত্রে আজও বাংলা চালু হয় নাই সত্য। কিন্তু আজ বাদে কাল তা হইবেই।

কিন্তু শহীদ মিনারে যে স্থপতি-বিচ্যুতি ঘটিয়াছে, তার সংশোধনের কোনও উপায় আছে কি? সে দিন খবরের কাগযে পড়িলাম, জনৈক লেখক দুঃখ-বেদনার ভাষায় শহীদ মিনারকে 'এপলজি ফর এ মেমোরিয়াল' বা দায়সারা স্মৃতি-স্তম্ভ বলিয়াছেন। লেখক আফসোস করিয়া বলিয়াছেন, শহীদ-মিনার প্ল্যান-মোতাবেক নির্মিত হয় নাই। যাও হইয়াছে, মেরামত ও হেফাযতের অভাবে তাও নষ্ট হইয়া যাইতেছে। দেওয়াল-চিত্রগুলি ছাতাইয়া যাইতেছে। পলস্তরা খসিয়া পড়িতেছে। গোটা স্মৃতি-স্তম্ভটাই ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইতেছে ইত্যাদি।

কিন্তু এটাই কি সব কথা? অভিযোগ কি শুধু ঐটুকু? আমার মতে তা নয়। আমার দুঃখও ওখানে নয়। আমার অভিযোগ আরও গভীর, আরও মৌলিক। সে কথাটাই আজ বলিব।

ছাত্র-তরুণদের দাবির মধ্যে শহীদ মিনারের কোনও স্থাপত্য রূপ বা আর্কিটেকচারেল কাঠামো ছিল না, একথা সত্য। একথাও ঠিক যে, যুক্তফ্রন্টের একুইশ দফা দাবির মধ্যে যে শহীদ মিনারের ওয়াদা ছিল, তাতেও মিনারের কোনও নির্দিষ্ট রূপ ও আকার ছিল না।

কিন্তু একুইশ দফা ম্যানিফেস্টো রচনার সময় আমার মনের আয়নায় শহীদ মিনারের একটা সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি ছিল, সেটা না বলিয়া পারিতেছি না। কারণ ওটা আমার মন হইতে কিছুতেই মুছিয়া যাইতেছে না। বরঞ্চ প্রায়ই, বিশেষত শহীদ দিবসে, ওটা আরও স্পষ্ট হইয়া ভাসিয়া উঠে। সেটা প্রতীকের ছবি, স্মৃতি-স্তম্ভের ছবি নয়।

www.pathagar.com

শহীদ মিনারের বৈশিষ্ট্য

আমার কল্পনায় প্রস্তাবিত শহীদ মিনার অতীতের স্মৃতি–বাহক ছিল না, ছিল জাতির ভবিষ্যতের পথ–প্রদর্শক আসমান–ছোওয়া অংগুলি নির্দেশ। এর নাম দেওয়া হইয়াছে মিনার, স্তম্ভ মেমোরিয়াল বা মনুমেন্ট দেওয়া হয় নাই, সে কথা আমি এক মুহূর্তের তরেও ভুলি নাই। মিনার উচ্চতা–জ্ঞাপক। আসমানের দিকেই হাতছানি মিনারের। মুসলিম স্থপতির বিজয়–কেতন সারা দুনিয়ার আসমানে উড়াইতেছে এই মিনার। কুতুব মিনার তাদের মধ্যে সর্বোচ্চ।

কাজেই উচ্চতায় শহীদ মিনারের নযর থাকিবে কুতুবের দিকে। কিন্তু ঐ পর্যন্ত। শহীদ মিনারের প্রটোটাইপ হিসাবে কুতুবের স্থান ওর বেশি না। কারণ এ মিনারের ফাংশান হইবে কুতুব হইতে ভিন্ন। কুতুব মিনারের মতো পথের ধারে দাঁড়াইয়া অতীত গৌরবের স্মৃতি বহন করিবে না শহীদ মিনার। পথের উপর দাঁড়াইয়া ভবিষ্যৎ গৌরবের পথ নির্দেশ করিবে সে।

এই দিক দিয়া প্যারিসের আইফেল টাওয়ার হইবে শহীদ মিনারের মডেল। এই শহীদ মিনার হইবে ঢাকা শহরের ল্যাণ্ড মার্ক। তার পূর্ণ ছবি এই :

প্রশস্ত চৌরাস্তার উপর সগৌরবে দাঁড়াইয়া আকাশচুম্বী মিনার। এই মিনারের নিচে দিয়া সুদূরপ্রসারিত চারটা কুশাদা রাস্তা। সে সব রাস্তায় অবিরাম চলিয়াছে জনস্রোত ও যানবাহনের মিছিল।

উপরের দিকে মিনার–চূড়ার চারদিক মুখ করিয়া চারটা বিশালকায় টাওয়ার ক্লক। লণ্ডন শহরের বিগবেনের চারটার একত্র সমাবেশ। চূড়ার অভ্যন্তরে এলারাম বেল। ঘন্টায়–ঘন্টায় ঘণ্টাধ্বনি। সারা শহরে প্রতিধ্বনি। নিওলাইট–মোড়া বিজলী–আলোকিত ঘড়ি। বিজলীতে চলে। রাতেও আলোকে ঝলমল।

দেখা যায় সারা শহর হইতে, দূর–দূরান্ত হইতে। করাচী–কলিকাতা হইতে ব্যাংকক–হংকং টোকিওর পথে হাওয়াই জাহাজের যাত্রীরা শূন্য হইতে দেখে সে মিনার। বিস্ময়ে তাকাইয়া থাকে সে ল্যাণ্ড মার্কের দিকে। শাহাদত আংগুলে দিক নির্দেশ করিয়া একজন আরেকজনকে জিজ্ঞাসা করে : 'বলিতে পারেন ওটা কি এবং কোথায়।' 'ওটাই পূর্ব–পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকা শহরের বিখ্যাত মিনার।' আবার প্রশ্ন হয় : ওটার নাম শহীদ মিনার কেন? উত্তর হয় : 'মাত্রভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে ও–দেশের ছাত্র–তরুণরা জান দিয়াছিল। ওটা তাদেরই স্মৃতি–স্তম্ভ।'

হাওয়াই যাত্রীদের মধ্যে রোজ এই ধরনের আলাপ হয়। একদিন নয়, দুইদিন নয়, চিরদিন।

মিনার নয় চাতাল

আমার এ স্বপ্ন ফলে নাই, এটা সবাই জানেন। সেজন্য আমার নৈরাশ্য সীমাহীন। সে নৈরাশ্য আফসোসে পরিণত হয়, যখন দেখি মিনার অবনমিত হইয়াছে একটি অনুচ্চ চত্বরে। না বলিয়া দিলে কে বুঝিবে ওটা একটা মিনার?

মিনারের এই চাতালী রূপ কার কল্পনায় ধরা দিয়াছিল, আমি আজও তা বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। মিনার আরবী শব্দ। মূল 'নার' হইতে উহার উৎপত্তি। নার মানে

www.pathagar.com

আগুন। সমুদ্র উপকূলবর্তী লাইট হাউসকেই আগে মিনার বলা হইত। পরবর্তীকালে মসজিদ-দালান-ইমারতে মিনারের প্রবর্তন হয় নির্দেশক হিসাবে। সেই জন্যই সর্ব অবস্থায় আকাশচুম্বিতাই মিনারের বৈশিষ্ট্য। শহীদ মিনারেই সর্বপ্রথম মিনারের এই বৈশিষ্ট্য বর্জিত হইয়াছে।

ফলে অবস্থা এই দাঁড়াইয়াছে যে, নির্মাণ করা হইয়াছে যাকে স্মৃতিস্তম্ভরূপে সে নিজেই বিস্মৃতির আড়ালে চাপা পড়িতেছে। চারুশিল্প-জ্ঞানহীন পথিকের স্বতঃই যা মনে হয় তা এইরূপ :

ওখানে বোধ হয় কোনও ফ্যাক্টরি নির্মাণের কাজ শুরু হইয়াছিল। টিনশেড করিবার জন্য থাম-খিলাও কিছু গাড়া হইয়াছিল। এমন সময় মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের তরফ হইতে ইনজাংশন জারি করাইয়া ফ্যাক্টরি নির্মাণের কাজ বন্ধ করা হইয়াছে। পার্মানেন্ট ইনজাংশন নিশ্চয়ই। নইলে এতকাল পড়িয়া থাকিবে কেন? থাম-খিলাগুলি যে আজও উঠাইয়া নিতেছে না, তার কারণ বোধ হয় ফ্যাক্টরির মালিক দেউলিয়া হইয়াছেন।

গোড়ায় গলদ

কিন্তু ঐ চত্বরটিকে শহীদ মিনার জানিয়া যারা দেখিতে এবং শহীদদের প্রতি প্রীতি-শ্রদ্ধা জানাইতে যায়, তারা কি দেখে? সরকার শহীদ মিনারের জন্য যে তিন লাখ টাকা খরচ করিয়াছেন তা অপব্যয়িত হইয়াছে শুধু ডিযাইনার আর্কিটেক্টের দোষে।

এইসব শিল্পী কার পরামর্শে জানি না, একটা ফাণ্ডামেন্টাল ভুল করিয়াছেন। তাঁরা চারুশিল্পের কাছে বিরাটত্ব, বিউটির কাছে ম্যাজেস্টি, ফাইননেসের কাছে গ্র্যাণ্ডার স্যাক্রিফাইস করিয়াছেন। যে কাজে প্রয়োজন ছিল গ্র্যাণ্ড আর্টের, সে কাজে প্রয়োগ করিয়াছেন এঁরা ফাইন আর্ট। স্থপতির হাতুড়ি-বাটালির কাজে লাগাইয়াছেন এঁরা চিত্র শিল্পীর তুলি।

এটা আর্টের অপপ্রয়োগ। বেজায়গায় আর্ট প্রয়োগ করিলে তা আর আর্ট থাকে না, হইয়া পড়ে তা ডার্ট-আবর্জনা। অপপ্রয়োগে বিউটি পরিণত হয় আগলিনেসে। তাতে রূপ শুধু অরূপ হয় না, হয় কুরূপ। দুর্ভাগ্যবশত শহীদ মিনারে ঠিক তাই ঘটিয়াছে।

আর্টের বেলায় যা, বিদ্যার বেলায়ও তাই। ঠিক একই বিভ্রান্তি ঘটিয়াছে। স্থান-কাল-ভেদ না বুঝিয়া বিদ্যা-প্রীতি দেখাইতে গেলে তাতে বিদ্যার মর্যাদা হয় না, হয় অমর্যাদা। মিনারের পাদদেশে লাইব্রেরি-রিডিং রুম করার প্রস্তাবও এমনি বিদ্যা প্রীতির অপপ্রয়োগ।

ঢাকা শহরে এত-এত জায়গা থাকিতে মিনারের তলে লইব্রেরি-রিডিং রুম করার পরিকল্পনা যিনি করিয়াছিলেন তিনি না দেখাইয়াছেন শহীদদেরে সম্মান, না দিয়াছেন বিদ্যার মর্যাদা, না বুঝিয়াছেন লাইব্রেরী-রিডিং রুমের স্থান-কাল-ভেদ। ঐ পরিকল্পনা ছিল সত্যই উদ্ভট। ওটা যে কার্যে পরিণত হয় নাই, এটা সুসংবাদ। ১৯৬২ সালের পূর্ব-পাক সরকার-নিয়োজিত বোর্ড ঐ অকাজ হইতে বিরত থাকিয়া অন্তত একটা ভাল কাজ করিয়াছেন।

www.pathagar.com

অথচ সরকারের-দেওয়া তিন-লাখ টাকায় আমার স্বপ্নের শহীদ মিনারের কাজ প্রায় হইয়া যাইত। ঘাটতি পড়িলে জনসাধারণ সোৎসাহে সরকারী তহবিলে চাঁদা দিত। ব্যয়-বহুল ফাইন আর্টের চিকন কাজে হাত না দিয়া সস্তা মোটা গ্র্যাণ্ড আর্টে টাকা খরচ করিলে ঐ টাকাতেই অন্তত অক্টার্লনি মনুমেন্টের মতো উচ্চ শহীদ মিনার নির্মিত হইয়া যাইত। মুরাল মোযাইকের অপপ্রয়োগ না করিয়া শহীদ মিনারের স্থানে-স্থানে ঢাকাইয়া স্থপতির বিশেষত্ব পোর্সেলিন নকশা করিলে 'মড়ার্ণ' আর্ট হইত না বটে, কিন্তু তাতে আমাদের কৃষ্টি ঐতিহ্যও প্রতিবিম্বিত হইত; আর্ট মজবুতও হইত।

এটা কি এখন অসম্ভব?

২১শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৬।

www.pathagar.com

আমাদের ভাষা

আমাদের বাংলা

আমাদের নিজস্ব কালচার বিকাশের ও নিজস্ব সাহিত্য সৃষ্টির জন্য চাই আমাদের নিজস্ব ভাষা। আমাদের নিজস্ব ভাষা বাংলা, এ কথা আজ যথেষ্ট নয়। যথেষ্ট নয় দুই কারণে। এক কারণ ঐতিহাসিক। অপর কারণ রাজনৈতিক।

ঐতিহাসিক কারণ বাংলা ভাষার ইতিহাসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। বাংলা ভাষার স্রষ্টা ও বাংলা সাহিত্যের পিতা আসলে বাংলার নবাব-বাদশারাই। সে হিসাবে বাংলা বাংগালী মুসলমানদের নিজস্ব ভাষা। কিন্তু প্রায় দুইশ' বছরের ইংরাজ শাসনে বাংলা ভাষার ও সাহিত্যের বিপুল পরিবর্তন ঘটিয়াছে। সে পরিবর্তন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে যেমন উন্নত করিয়াছে, তেমনি মুসলমানদের নিকট হইতে অনেক- অনেক দূরে নিয়াও গিয়াছে। ইতিমধ্যে বাংলা ভাষা একটি আধুনিক উন্নতিশীল ভাষা হইয়াছে।

অন্যান্য আধুনিক ভাষার মতো বাংলাও জীবন্ত ও প্রাণবন্ত ভাষা। কাজেই অনবরত তার প্রসার বৃদ্ধি ও পরিবর্তন ঘটিতেছে এবং ঘটিতে থাকিবে।

উনিশ শতকের গোড়া হইতে বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত বাংলা ভাষা ছিল পণ্ডিতী ভাষা। উনিশ শতকের শেষদিক হইতে টেকচাঁদ ঠাকুর দ্বিজেনঠাকুর ও রবিঠাকুরের শক্তিশালী কলমের জোরে ভদ্রলোকের পণ্ডিতী বাংলা জনগণের ভাষায় রূপান্তরিত হয়। হইবার চেষ্টা করে। এমন কি স্বয়ং বংকিমচন্দ্রের লেখাতেও এ চেষ্টা প্রতিফলিত হয়। বংকিমচন্দ্রের প্রথম জীবনের 'দুর্গেশনন্দিনী'র ভাষা এবং শেষ দিককার 'দেবী চৌধুরানী'র ভাষার পার্থক্যই এর প্রমাণ।

পশ্চিম বাংলার বাংলা

যা হউক দ্বিজেনঠাকুর রবিঠাকুর ও শরৎচন্দ্রের চেষ্টায় বাংলা ভাষা বড় জোর পশ্চিম-বাংলার মধ্যবিত্তশ্রেণীর ভাষা হইতে পারিয়াছিল। প্রকৃত জনগণের ভাষা হইতে পারে নাই। কারণ বাংলার আসল জনগণ যে মুসলমানরাও এবং তাদের ভাষাও যে জনগণের ভাষা, এ সত্য হয়তো ঐ মনীষীদের নিকট ধরাই পড়ে নাই।

তারপর নযরুল ইসলাম তাঁর অসাধারণ প্রতিভা নিয়া ধূমকেতুর মতো বাংলা সাহিত্য ও ভাষার আকাশে উদিত হন এবং মুসলিম-বাংলার ভাষাকে বাংলা সাহিত্যের ভাষা করিবার সফল চেষ্টা করেন। নযরুলের এই চেষ্টার যে বিরুদ্ধতা আসে সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা হইতে, তাতে শুধু সাম্প্রদায়িক তিক্ততাই বাড়ে না, হিন্দু-বাংলা ও মুসলিম-বাংলার কালচারের পার্থক্যও তাতে সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। বাংলা ভাগ হইয়া দুই দেশ না হইলে অতঃপর বাংলা কি রূপ নিত, আজ সে আলোচনা করিয়া লাভ নাই।

কিন্তু তার ইশারা হইতে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত।

www.pathagar.com

বিপ্লবী পরিবর্তন

রাজনৈতিক কারণ একেবারে আধুনিক। আজ বাংলা ভাগ হইয়াছে। এক বাংলা দুইটা স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের রূপ নিয়াছে। এতে বাংলা সাহিত্য ও ভাষার কি পরিবর্তন হইয়াছে, এইটাই আমাদের ভাল করিয়া বিচার করিতে হইবে। এ বিচার সুষ্ঠু ও নির্ভুলভাবে করিতে গেলে আমাদের আগে বিবেচনা করিতে হইবে দুইটা কথা :

এক, বাংলা ভাগ হওয়ার আগেও সাহিত্যের ক্ষেত্রে মুসলিম-বাংলার ভাষা ও হিন্দু-বাংলার ভাষায় একটা পার্থক্য ছিল। মুসলমান লেখকরা সামাজিক ও সাহিত্যিক প্রয়োজনের খাতিরে প্রচলিত বহুসংখ্যক মুসলমানী শব্দ সাহিত্যে চালু করিয়াছিলেন। হিন্দু লেখকরা তা মানিয়া লন নাই।

দুই, বাটোয়ারার আগে বাংলার রাজধানী সুতরাং সাহিত্যিক কেন্দ্র ছিল কলিকাতা। এখন সে জায়গা দখল করিয়াছে ঢাকা।

পরিবর্তনের তাৎপর্য

এই দুইটা কথার তাৎপর্য আমাদের বুঝিতে হইবে। অবিভক্ত বাংলায় বাংলা সাহিত্যের সকল ক্ষেত্রে প্রাধান্য ছিল হিন্দুদের। তার মানে বাংলা সাহিত্য ছিল মূলত এবং প্রধানত হিন্দু কালচারের বাহক। সে সাহিত্য বাংলার মুসলিম কালচারের বাহক ত ছিলই না বরঞ্চ তার প্রতি বিরূপ ছিল। সুতরাং সে সাহিত্যে গোটা-কতক মুসলমানী শব্দ ঢুকাইয়া দিলেই তা মুসলিম কালচারের বাহক সাহিত্য হইয়া যাইত না। রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের ভাল-ভাল বই-এর হিন্দু চরিত্রগুলির জায়গায় মুসলমান নাম বসাইয়া দিলেই ওগুলি মুসলিম চরিত্র হইয়া যাইবে না। তাতে মুসলিম-সাহিত্যও হইবে না। বরং রবীন্দ্র-শরৎচন্দ্রের সৃষ্টি-প্রতিভার তাতে অপমানই করা হইবে।

পক্ষান্তরে 'বাংগাল' বা মুসলমান' বলিয়া নিজেদের বাপ-দাদার আমলের মুখের লফ্যগুলি বাদ দিলেই আমরা 'আধুনিক' ও 'প্রগতিশীল' হইয়া যাইব না। গোশতের বদলে 'মাংস', আণ্ডার বদলে 'ডিম', জনাবের বদলে 'সুধী', আরযের বদলে 'নিবেদন', তসলিমবাদ এর বদলে 'সবিনয়', দাওয়াত-নামার বদলে 'নিমন্ত্রণ-পত্র', শাদি-মোবারকের বদলে 'শুভ বিবাহ' ব্যবহার করিলেই আমরা 'সভ্য' 'কৃষ্টিবান' ও 'সুধী বিদগ্ধ' হইলাম, নইলে হইলাম না, এমন ধারণা হীনমন্যতার পরিচায়ক। কৃষ্টিক চেতনা ও রেনেসাঁর জন্য এটা অশুভ ইংগিত। আমাদের তরুণ 'প্রগতি'-বাদীদের মধ্যে ইদানিং এই বাতিক খুব জোরসে দেখা দিয়াছে। এটা আশংকার কথা।

আমি বলি না যে, গোশতের বদলে 'মাংস' আণ্ডার বদলে 'ডিম' এমন কি পানির বদলে 'জল' বলা চলিবে না। বরঞ্চ আমার মত এই যে, এইগুলি সমার্থ-বোধক বাংলা প্রতিশব্দ। সাহিত্যে উভয় শব্দই ব্যবহার করা হইবে প্রয়োজনমতো। কিন্তু এরা একটা 'ছাড়িয়া' আরেকটা 'ধরিতে' যাওয়াতেই আমার যত আপত্তি। পাক-বাংলার বাংলা ভাষার ভবিষ্যৎ রূপ সম্বন্ধে চিন্তা করিবার সময় ভাষা-বিজ্ঞানের যে কয়টি কথা মনে রাখিতে হইবে, সে-সব কথা আমি একটু পরে বলিতেছি। এখানে শুধু সেই গঠন-রূপায়ণের কৃষ্টিক বুনিয়াদ সম্বন্ধে দুই-একটি কথা বলিব।

৯—

www.pathagar.com

প্রথমত 'ছাড়া' 'ধরার' মধ্যে একটা হীনমন্যতা ও পরাজিতের মনোভাব লুকাইয়া আছে। উপরের শব্দ-জোড়াগুলির মধ্যে একটা আরেকটার চেয়ে শ্রেষ্ঠ একথাও যেমন বলা যায় না, একটা মুসলমানের অপরটা হিন্দুর একথাও বলা যায় না। আসলে কোনও শব্দেরই ধর্মীয় কোনও রূপ নাই। উপরের শব্দগুলির ত নাই-ই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ 'গোশ্‌ত' 'আণ্ডা' ও 'পানি' এই তিনটা শব্দের কথাই ধরা যাক। এর একটাও আরবী নয়, ইসলামীও নয়। জোড়ার প্রতিশব্দগুলিও তেমনি ইসলাম-বিরোধী বা হিন্দুয়ানীও নয়।

শব্দের কৃষ্টিক ইমেজ

তথাপি বাংলাদেশে এইসব শব্দের কৃষ্টিক রূপ বা ইমেজ আছে। সব ভাষাতেই অনেক শব্দের, এমন কি বেশির ভাগ শব্দেরই, এক-একটা ইমেজ থাকে। সে-সব শব্দের সাথে কালচারের অন্তর্নিহিত গভীর ও ঘনিষ্ঠ যোগ থাকে। তেমনি আমাদের বিচার্য তিনটি শব্দের জোড়ার মধ্যেও কালচারের ইমেজ আছে। তার ফলে গোশত আণ্ডা ও পানির মধ্যে 'ইসলামত্ব' নাই বটে, কিন্তু 'মুসলমানত্ব' আছে। অর্থাৎ জোড়ার এক কাতারের শব্দগুলি এক কালচারের লোকেরা অর্থাৎ হিন্দুরা বহু যুগ ধরিয়া ব্যবহার করিয়া আসিতেছে। জোড়ার অপর কাতারের শব্দগুলি অপর কালচারের লোকেরা অর্থাৎ মুসলমানেরা বহু যুগ ধরিয়া ব্যবহার করিয়া আসিতেছে। বহু যুগের ব্যবহারে শব্দগুলি তাই এক-একটা কালচারেল আইডেনটিটি বা কৃষ্টিক শেনাখ্‌তি পাইয়া গিয়াছে। সোজা কথায় একটা হিন্দুর মুখের কথা অপরটা মুসলমানের মুখের কথা, এই তাদের পরিচয়। সুতরাং আমরা যদি 'পানি' 'ছাড়িয়া' 'জল' 'ধরি' তবে আমরা ধর্মচ্যুত হইব না সত্য কিন্তু ঐতিহ্যচ্যুত হইব নিশ্চয়ই। এর পরিণাম ও প্রতিক্রিয়া সুদূর-প্রসারী হইবে। সমাজ-বিজ্ঞানের ছাত্ররা তা সহজেই বুঝিতে পারিবেন।

দ্বিতীয়ত এ-সব 'মুসলমানী' শব্দ এবং ঐ ধরনের আরও অনেক শব্দ এক দিক হইতে হিন্দুদের মুখের ভাষার চেয়ে সত্য-সত্যই শ্রেষ্ঠ বাংলা। এই শ্রেষ্ঠত্ব বোধগম্যতার ভাষিক প্রয়োজন ও প্রসারতার জাতীয় প্রয়োজন উভয় ক্ষেত্রেই সমভাবে প্রযোজ্য। সে প্রয়োজনীয়তা পাকিস্তান হওয়ার আগেও ছিল। এখন আরও বাড়িয়াছে।

আমাদের ভাষার শ্রেষ্ঠত্ব

'গোশত' 'আণ্ডা' ও 'পানি' ইত্যাদি 'মুসলমানী' বাংলা শব্দগুলি বাংলার বাইরের গোটা পাক-ভারতের হিন্দু ও মুসলমান সকলেই বুঝে, ব্যবহারও করে। ঐ তিনটি শব্দ এবং চাচা-চাচী ফুফা-ফুফু খালু-খালা ইত্যাদি সম্বন্ধবাচক, লহু রগ রেশা নাশতা বদনা ইত্যাদি হাজারো বস্তু-বাচক শব্দ সম্বন্ধেও এই কথা সত্য। এই বিচারে পাক-বাংলার মুসলমানের মুখের বাংলাকে একরূপ নিখিল পাক-ভারতের ভাষা বলা যাইতে পারে। উনিশশ' তেতাল্লিশ সালে কলিকাতার এক সাহিত্য-সভার ভাষণে আমি হিন্দু সাহিত্যিক বন্ধুদের মুসলমানদের মুখের বাংলাকে সাহিত্যে বর্জন না করিয়া বরঞ্চ উহাকে স্ট্যাণ্ডার্ড বাংলা ভাষা রূপে গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। আমি বলিয়াছিলাম, মুসলমানের মুখের বাংলা হিন্দুর মুখের বাংলার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। আমি দুইটি

www.pathagar.com

দৃষ্টান্ত দিয়াছিলাম। মুসলমান বাংগালীর মুখের বাংলার দৃষ্টান্ত ছিল এইরূপ : 'ফযরের আউয়াল ওয়াকতে উঠিয়া ফুফু-আম্মা চাচীজীকে কহিলেন : আমাকে জলদি এক বদনা পানি দাও। আমি পায়খানা ফিরিয়া গোসল করিয়া নমাজ পড়িয়া নাশতা খাইব।' হিন্দু বাংগালীর মুখের বাংলার দৃষ্টান্ত ছিল এইরূপ : 'অতি ভোর বেলা উঠিয়া পিসিমা খুড়া মশায়কে বলিলেন : আমাকে শীগ্‌গির এক গাড়ু জল দাও। আমি প্রাতঃক্রিয়া সারিয়া চ্যান করার পর সন্ধ্যা করিয়া মাধান্নি খাইব।'

আমি বলিয়াছিলাম, মুসলমানের মুখের ঐ বাংলা ভাষা বিহার হইতে পেশওয়ার এবং অযোধ্যা হইতে কুমারিকা পর্যন্ত জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকল ভারতবাসী বুঝিবে। পক্ষান্তরে হিন্দুর মুখের ঐ বাংলা বাংলাদেশের বাইরের হিন্দুরাও বুঝিবে না, অন্যরা পরের কথা।

আমি জোরের সাথেই বলিতে পারি আমার পঁচিশ বছরের আগের ঐ কথা আজও তেমনি সত্য রহিয়াছে। পাক-বাংলার তরুণরা আত্মসম্মানী হইলে চিরকাল তা সত্য থাকিবে।

ভাষা সমস্যার অপর দিক

তৃতীয়ত এর আরেকটা দিক আছে। পাকিস্তান হওয়ার পর আমাদের জাতীয় কর্তব্য দাঁড়াইয়াছে দুইটি। এক, পাক-বাংলায় পাকিস্তানী নেশন গড়া। দুই, পাকিস্তানের উভয় অংশের মধ্যে যথা সম্ভব সাদৃশ্য আনয়ন করা। প্রায় পঞ্চাশ লাখ ভারতীয় মুসলমান মোহাজের পাক-বাংলার-স্থায়ী বাশিন্দা হইয়াছে। কালক্রমে ভাষিক ও কৃষ্টিক সমাজ জীবনে এরা আমাদের মধ্যে মিশিয়া যাইবে। আমাদের ভাষিক ঐতিহ্য এ কাজ সহজ করিবে। কিন্তু আমরা যদি আমাদের ঐতিহ্য 'ছাড়িয়া' শান্তিনিকেতনী ঐতিহ্য 'ধরিতে' যাই তবে আমরা পাক-বাংলার জাতীয়তা গঠনের কাজেই বাধা জন্মাইব।

চতুর্থত পাক-জাতীয়তার সংহতির কথা। আমরা বাংলাকে আমাদের রাষ্টভাষা করিয়া পূর্ব-পাকিস্তানের ভাষিক ও কৃষ্টিক স্বকীয়তা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিয়াছি। কিন্তু বাংলা ভাষাকে মুসলিম-ঐতিহ্যহীন শান্তিনিকেতনী উৎকলী বাংলায় রূপান্তরিত করিয়া পাকিস্থানের দুই অংশের মধ্যে ভাষিক ব্যবধান আরও না বাড়াই, সেদিকে আমাদিগকে সচেতন থাকিতে হইবে। আমাদের আধুনিক প্রগতিবাদীরা আমাদের ভাষাকে 'স্নাতকোত্তর, করাইয়া যে গতিকে প্রগতির দিকে নিতেছেন, তাতে আমরা পশ্চিম বাংলার হিন্দুদের নৈকট্য লাভ করিতেছি সত্য, কিন্তু অবাংগালী পূর্ব-পাকিস্তানীদের নিকট হইতে আমরা বহুদূরে সরিয়া যাইতেছি।

রাজধানীর পরিবর্তন

তারপর ধরুন রাজধানী পরিবর্তনের কথা। অবিভক্ত বাংলার সাহিত্যকেন্দ্র ছিল যেমন কলিকাতা, পূর্ব-পাকিস্তানের সাহিত্য-কেন্দ্র হইবে তেমনি ঢাকা। অবিভক্ত বাংলার সাহিত্যকে গণ-সাহিত্য করিবার প্রয়োজনের তাগিদে যে কারণে কলিকাতার কথ্য ভাষাকে সাহিত্যের ভাষার সম্মান দিতে হইয়াছিল, ঠিক সেই প্রয়োজনের

www.pathagar.com

তাগিদে আমাদের রাজধানী ঢাকার কথ্য ভাষাকেও আমাদের সাহিত্যের ভাষার মর্যাদা দিতে হইবে। সাহিত্যে ব্যবহারোপযোগী কোন নিজস্ব ভাষা ঢাকার নাই। তাতে ভয় পাইবার কিছু নাই। গোড়াতে কলিকাতারও ছিল না। জনগণের ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টির তাগিদে কলিকাতার পার্শ্ববর্তী পশ্চিম-বাংলার জিলাসমূহের কথ্য ভাষার মিশ্রণে ও সমন্বয়ে যেমন একটি 'কোলকেতেয়ে' কথ্য ভাষা গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং সেই কলিকাতার কথ্য ভাষা পশ্চিম-বাংলার তথা গোটা বাংলার সাহিত্যের ভাষা হইয়া উঠিয়াছিল, পূর্ব-বাংলার সাহিত্যিকদের সমবেত চেষ্টায় তেমনি পূর্ব-বাংলার বিভিন্ন জিলার ভাষার সংমিশ্রণ ও সমন্বয়ে একটি 'ঢাকাইয়া' কথ্য বাংলা গড়িয়া উঠিবে এবং সেই ভাষাই পূর্ব-পাকিস্তানের সাহিত্যের ভাষা হইবে। পশ্চিম-বাংলার বিভিন্ন জিলার আঞ্চলিক ডায়লেক্টের মধ্যে বিপুল পার্থক্য থাকায় শান্তিপুরী ডায়লেক্ট যেমন তাদের ভাষিক একতার নিউক্লিয়াস হইয়াছিল, আমাদের বিক্রমপুরী ডায়লেক্টও তেমনি ঢাকাইয়া বাংলার নিউক্লিয়াস হইতে পারিবে।

আমাদের দুইটি কাজ

আজ স্বাধীন করিতে হইবে দুইটি কাজ। প্রথমত পূর্ব-বাংলার প্রাচীন সভ্য মানুষের নয়া রাষ্ট্র ও নয়া জাতি গঠনে সাহায্য করার জন্য তাদের নয়া যিন্দিগির ও নয়া কালচারের ধারক ও বাহক নয়া সাহিত্য সৃষ্টি করিতে হইবে। দ্বিতীয়ত সেই সাহিত্যের মিডিয়াম রূপে পূর্ব-পাকিস্তানের সমস্ত অঞ্চলের বোধগম্য ও ব্যবহারোপযোগী একটি ঢাকাইয়া কথ্য বাংলা গড়িয়া তুলিতে হইবে। এ উভয় কাজ চলিবে স্বভাবতই এক সাথে।

এ কাজটি খুবই সোজা, আবার খুবই কঠিন। সোজা এই জন্য যে, এ কাজের নযির আছে। পশ্চিম-বাংলার সাহিত্যকরা যেমন পশ্চিম-বাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সাধারণ কথ্য ভাষাকেই সাহিত্যের ভাষা করিয়াছেন, আমরাও যদি তেমনি পূর্ব-পাকিস্তানী মধ্যবিত্তের সাধারণ কথ্য ভাষাকেই আমাদের সাহিত্যের ভাষা করিতে পারি, তবেই আমাদের কাজ সারা হইল। মধ্যবিত্তের ভাষা মানে শিক্ষিত সমাজের সফিসটিকেটেড উচ্চারণ-ভংগি। কথ্য ভাষাকে দেশের সর্বত্র জনগণের বোধগম্য করার জন্যই এটা দরকার।

পক্ষান্তরে এই কাজটিই কঠিন এই জন্য যে, সাহিত্যিকরাও সাধারণ মানুষের মতোই অভ্যাসের দাস। এঁরাও অনুকরণে গৌরব বোধ করেন। এঁরাও হীনমন্যতার ব্যারামে ভুগিতেছেন। কথাটা একটু খোলাখুলিই বলা যাক। বাংলাদেশ অখণ্ড থাকিতে কলিকাতা রাজধানী থাকাকালে আমরা কথায় ও লেখায় পশ্চিম-বাংলার ভালমন্দ সবই অনুকরণ করিতাম। এটা ছিল স্বাভাবিক। এই কারণে ততদিন আমরা 'খাইছি'র বদলে 'খেয়েছি' খাইতেছি'র বদলে 'খাচ্ছি' 'করি নাই'র বদলে 'করি নি' লিখতাম এবং বলিবার চেষ্টা করিতাম। তার উপর ক্রিয়াপদ ছাড়াও বিশেষ্যের বেলাতে তা করিতে গিয়া 'ইচ্ছা'র বদলে 'ইচ্ছে' 'হিসাবে'র বদলে 'হিসেব', 'নিকাশে'র স্থলে 'নিকেশ' 'মিঠা'র জায়গায় 'মিঠে', 'তুলা'র জায়গায় 'তুলো', 'সুতা'র জায়গায় 'সুতো' লিখিতাম ও বলিবার চেষ্টা করিতাম।

www.pathagar.com

এটা তখন দোষের ছিল না। কিন্তু এখন দোষের। লজ্জা ও পরিতাপের বিষয় এই যে, আজো আমরা তাই করি। আমরা ভুলিয়া যাই যে, যে–স্বাভাবিকতা সাহিত্যের প্রাণ, আমাদের এই বিবেক–বুদ্ধিহীন অন্ধ অনুকরণ–প্রিয়তা সেই স্বাভাবিকতাকেই বিদ্রূপ করিয়া থাকে। রাষ্ট্রীয় কারণে আমাদের তখনকার ভাষা ছিল কলিকাতার বাংলা। সেই কারণেই এখানকার ভাষা আমাদের ঢাকাইয়া বাংলা।

ঢাকাইয়া বাংলা

পশ্চিম ও পূর্ব–বাংলার কথ্য ভাষার পার্থক্যের অনেকখানিই ক্রিয়াপদে সীমাবদ্ধ। তবে ক্রিয়াপদ ছাড়াও অনেক বিশেষ্য প্রভৃতি পদেও আঞ্চলিক পার্থক্য আছে। আবার মুসলমানী শব্দ ছাড়াও নিছক দেশী শব্দেও বেশ কিছু পার্থক্য বিদ্যমান। উচ্চারণেই সে পার্থক্য বেশি প্রকট। 'তুলো' 'ইচ্ছে' প্রভৃতি শব্দের কথা আগেই কহিয়াছি। এগুলি একান্তই উচ্চারণ–বিকৃতি এবং স্থানিক। এগুলির অনুকরণ শুধু অনাবশ্যক নয়, অবৈজ্ঞানিকও। পশ্চিম–বাংলার যে–সব ভাই হিজরত করিয়া পূর্ব–পাকিস্তানে আসিয়াছেন, তাঁরা এক পুরুষ বা আরও কিছুকাল এই বিকৃত উচ্চারণ করিয়া যাইবেন। কিন্তু তাই বলিয়া আমরা বাংগালরাও তাঁদের অনুকরণ করিয়া শব্দ বিকৃত করিব, এর কোন মানে নাই। সুতরাং আমাদের সাহিত্যকে স্বাভাবিক ও আমাদের জনগণের সাহিত্য করিতে হইলে জনগণের স্বাভাবিক ভাষায় লিখিতে হইবে। স্বাভাবিক ভাষা কি, কিভাবে তা গঠিত হইবে, কি তার রূপ হইবে, এসব কথার নির্ভুল বিচার করিতে গেলে আমাদের এই কয়টা কথা মনে রাখিতে হইবে :

১. ভাষা ও সাহিত্যের উপর প্রভাব কলিকাতার বদলে এখন ঢাকা হইতে হইবে।

২. পদ্মার পশ্চিম পারের আমাদের যে–সব জিলা এতদিন রাষ্ট্রীয় কারণে নিজেদেরে 'বাংগাল' হইতে স্বতন্ত্র ভাবিত, 'অধিকতর ভদ্র' পশ্চিম–বাংলার অন্তর্ভুক্ত মনে করিয়া গৌরব বোধ করিত এবং প্রেরণার জন্য স্বভাবতই কলিকাতার দিকে চাহিয়া থাকিত, তারা এখন ঢাকার দিকে নযর দিতে শুরু করিয়াছে স্বাভাবিক কারণেই।

৩. প্রায় চল্লিশ লাখের মতো পশ্চিম–বাংগালী মুসলমান পূর্ব–পাকিস্তানের স্থায়ী বাশেন্দা হইয়াছেন। সমাজ সাহিত্য ও রাষ্ট্রীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এঁদের অনেকেই প্রভাব–প্রতিপত্তির স্থান দখল করিয়া আছেন। পূর্ব–পাকিস্তানের কথ্য ভাষায়, সুতরাং সাহিত্যে, এঁদের প্রভাবের ছাপ থাকিবেই।

৪. কথ্য ভাষার দিক হইতে পূর্ব–পাকিস্তানের বিভিন্ন জিলার আঞ্চলিক বাংলার মধ্যে যে প্রকট পার্থক্য দেখা যায়, তার বেশির ভাগই উচ্চারণে সীমাবদ্ধ।

৫. প্রায় দশ লাখের মত উর্দু–ভাষী অবাংগালী পূর্ব–পাকিস্তানের স্থায়ী বাশেন্দা বনিয়া গিয়াছেন। তাঁদেরও প্রভাব আমাদের কথ্য ভাষায় পড়িবে।

৬. রাজধানী ঢাকায় বাটোয়ারার আগের মুদ্দতে কলিকাতার ঠাকুর পরিবারের মতো বাংলা–ভাষী কোন প্রভাবশালী উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণী ছিল না।

৭. ঢাকা শহরে বাটোয়ারার প্রাক্কালের যুগের বাংলা–সাহিত্যে পূর্ব–বাংলাবাসী প্রভাবশালী কোন সাহিত্যিক গোষ্ঠী ছিল না।

www.pathagar.com

সুতরাং পূর্ব-পাকিস্তানের সাহিত্যের বাহন যেমন হইবে স্বাভাবিক কথ্য ভাষা তেমনি সেটা হইবে উপরোক্ত সমস্ত পরিস্থিতি-পরিবেশের সৃষ্ট ও হরেক ভাষার সংমিশ্রণের ফল এক নয়া ভাষা। সে ভাষার সৃষ্টিকার্য ইতিমধ্যেই শুরু হইয়াছে। দুর্ভাগ্যবশত শুধু আমাদের সাহিত্যিকদের নযরেই সে বিপুল নির্মাণ-কার্য আজো ধরা পড়ে নাই।

ফর্মেটিভ স্তর

অথচ সাহিত্যিকদেরই কাজ এই সৃষ্টি-কার্যে এই গ্রোথে সকল শক্তি ও মনীষা দিয়া সাহায্য করা। আমাদের পাড়াগাঁয়ে প্রচলিত হাজার-হাজার শব্দ অবহেলিত এবং অজ্ঞাত অবস্থায় পড়িয়া আছে। এই সব শব্দ আমাদের সাহিত্যের সম্পদ হইতে পারে। এই সমস্ত শব্দের সংযোগে আমাদের ভাষা হইবে সম্পদশালী। তার গতি হইবে চঞ্চল ও বেগবান। তার প্রাণ-শক্তি হইবে প্রচুর। জীবন্ত ভাষার গ্রোথ ও প্রসারের শেষ নাই। শুনা যায়, গত পঞ্চাশ বছরে ইংরাজী ভাষায় প্রায় পঁচিশ হাজার নতুন শব্দ প্রবেশ করিয়াছে। ইংরেজ লেখক ও সাহিত্যিকরা দুই বাহু মেলাইয়া ঐসব শব্দ নিজস্ব ভাষায় গ্রহণ করিয়াছেন। ইংরাজি ভাষার এই ইলাস্টিসিটি এই প্রসারণ ক্ষমতা আছে বলিয়াই ইংরাজের রাষ্ট্রীয় সাম্রাজ্যের অবসান হওয়ার পরেও দুনিয়ায় ইংরেজি ভাষার সাম্রাজ্য একটুকুও সংকীর্ণ হয় নাই।

আমাদের নয়া ভাষা গঠনে অমনি উদার বাস্তববাদী হইতে হইবে আমাদের। আমি আগেই বলিয়াছি আমাদের রাজধানী তথা অন্যান্য শহরের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বাংগালী ভদ্রলোকের কথ্য ভাষাই হইবে আমাদের সাহিত্যের ভাষা। তাঁর তাঁদের অফিসে-আদালতে, ক্লাবে-বৈঠকখানায় স্কুলে-কলেজে যে ভাষায় কথা কন, যে-সব শব্দ ও ক্রিয়াপদ যে স্বর-ভংগিতে যে বাক্-প্রণালীতে ব্যবহার করেন সেইটাই হইবে আমাদের সাহিত্যের ভাষা। এ ভাষা এখনও ফর্মেটিভ স্তরে। একটা মডেল বাক্য নেওয়া যাক।

কেতাবী বাংলা—তূলার বাজার এমন মহার্ঘ আর দেখি নাই। তূলার অভাবে সূতার কলগুলি বন্ধ গিয়াছে। সূতার অভাবে পাল বোনা হইতেছে না। পালের অভাবে নৌকার ক্ষেপ দেওয়া যাইতেছে না। ফলে হাঁড়ি-পাতিল বেচা-কিনা বন্ধ। কুমারদের তাতে বড়ই অসুবিধা হইয়াছে। দুই মুঠা ভাতের জন্য তারা পৈত্রিক জীবিকা হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছে। তবে ভিক্ষা করিয়া খাইবার ইচ্ছা তাদের নাই। স্ত্রী-পুত্রকে খাওয়াইয়া-পরাইয়া বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য তারা লাকড়ির ব্যবসা ধরিয়াছে। কাঠ কুড়াইবার উদ্দেশ্যে তারা কুড়াল-হাতে নদী পার হইয়া সুন্দরবনে যায় খুব সকাল বেলা। সারাদিন পরে বিকাল-সন্ধ্যায় কাঠ লইয়া ঘরে ফিরিয়া আসে।

পশ্চিম বাংলার বাংলা—তূলোর বাজার এমন মাগ্‌গি আর দেখি নি। তূলোর অভাবে সুতোর কলগুলো বন্ধ হয়ে গিয়েছে। সুতোর অভাবে পাল বোনা হচ্ছে না। পাল ছাড়া নৌকার ক্ষেপ দেয়া যাচ্ছে না। ফলে হাঁড়ি-পাতিল বেচা-কেনা বন্ধ। কুমোরদের তাতে বড্ড অসুবিধে হয়েছে। দুমুঠো ভাতের আশায় তারা পৈত্রিক ব্যবসা থেকে বেরিয়ে এসেছে। তবে ভিক্ষে করে খাবার ইচ্ছে তাদের নেই। মাগ-ছেলেকে খাইয়ে-পরিয়ে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে তারা লাকড়ির ব্যবসা ধরেছে। কাঠ কুড়োবার উদ্দেশ্যে

www.pathagar.com

তারা কুড়োল হাতে নদী পেরিয়ে সুন্দরবনে যায় খুব সকালে। সারাদিন পরে বিকেল-সন্ধ্যেয় কাঠ নিয়ে ঘরে ফিরে আসে।

পূর্ব বাংলার বাংলা—তুলার বাজার এমন মংগা আর দেখি নাই। তুলার অভাবে সূতার কলগুলি বন্ধ হৈয়া গেছে। সূতার অভাবে পাল বোনা হৈতেছে না। পাল ছাড়া নৌকার ক্ষেপ দেওয়া যা'তেছে না। ফলে হাড়ি-পাতিল বেচা-কিনা বন্ধ। কুমারদের তাতে খুবই অসুবিধা হৈছে। দুই মুঠা ভাতের আশায় তারা খান্দানী পেশা থনে বার হৈয়া আসছে। তবে ভিক্ষা কৈরা খাবার ইচ্ছা তাদের নাই। জরু-কবিলারে খাওয়া'য়া-পরা'য়া বাঁচা'য়া রাখবার লাগি তারা লাকড়ির ব্যবসা ধরছে। কাঠ কুড়াবার মতলবে তারা নদী পার হৈয়া সুন্দরবনে যায় খুব সকালে। সারাদিন পরে বিকাল-সন্ধ্যায় কাঠ লৈয়া ঘরে ফি'রা আসে।

ক্রিয়াপদে আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব

এই মডেল বাক্যটিতে আপনারা লক্ষ্য করিবেন 'তুলা' 'সূতা' 'নৌকা' 'মুঠা' 'দেওয়া' 'অসুবিধা' 'কুড়াইবার' 'বিকাল' 'সন্ধ্যা' 'ইচ্ছা' 'কুড়াল' 'গুলি' 'নাই' ইত্যাদি শব্দগুলির ব্যাপারে কেতাবী বাংলা ও পূর্ব-বাংলার বাংলার মধ্যে হুবহু মিল আছে। পশ্চিম-বাংলা এখানে অনর্থক শব্দগুলিকে বিকৃত করিয়াছে। সুতরাং এই শব্দগুলির বেলায় এবং অনুরূপ আরও অনেক শব্দের বেলায় পূর্ব-বাংলায় প্রচলিত ভাষা অধিকতর 'সাধু' সভ্য ও সাহিত্যে গ্রহণযোগ্য। এ-সব শব্দের ব্যবহারে পশ্চিম-বাংলার অনুকরণ করা অর্থহীন নকল-নবিসি মাত্র।

কিন্তু সমস্যা দেখা দিয়াছে ক্রিয়াপদ নিয়া। 'ছাইড়া' ও 'ছেড়ে', 'হৈয়া', ও 'হয়ে', 'খাইছি' ও 'খেয়েছি' ও 'খাইতেছি' 'খাচ্ছি' ইত্যাদি ক্রিয়াপদ ও অনুরূপ হাজারো ক্রিয়াপদের কোনটা লেখায় ইস্তেমাল করিব, সেটা ঠিক করা বাস্তবিকই কঠিন কাজ। কারণ শুধু 'হৈয়া' 'কৈরা'ই পূর্ব-পাকিস্তানের শব্দ, 'হয়ে' 'করে' পূর্ব-পাকিস্তানের শব্দ নয়, এ কথা কওয়া চলে না। পদ্মার পশ্চিম পারের, বিশেষত খুলনা যশোর ও কুষ্টিয়ার, লোকেরা ঐ-সব ক্রিয়াপদ ব্যবহার করিয়া থাকেন। পূর্ব-পাকিস্তানের কথ্য ভাষায় এঁদের প্রভাব ও প্রাক-পাকিস্তানী বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্য এই দুই-এর সমন্বয় আমাদের মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সমাজের কথ্য ভাষায় যে শক্ত মোচড় দিতেছে এবং আরও দিবে, তাতে সন্দেহ নাই। তাতে আমাদের কথ্য ভাষা, সুতরাং সাহিত্যের ভাষা, যে একটা খিচুড়ি হইবে, তাতেও সন্দেহ নাই। আপত্তি থাকিবার কারণও নাই। শুধু সেটা জগা-খিচুড়ি না হইলেই হইল। সে ভাষা নিশ্চয়ই জগা-খিচুড়ি না হইয়া বরঞ্চ ভূনি-খিচুড়ি হইবে যদি আমরা নিম্নলিখিত সাবধানতা অবলম্বন করি :

জগা বনাম ভুনি খিচুড়ি

১. ভাষায় নতুন জটিলতার আমদানি না করা, যথা :

'করিতেছি' অর্থে 'করতেছি' না বলিয়া 'করছি' বা 'কচ্ছি' বলা, 'দেখিতেছি' অর্থে 'দেখতেছি' না বলিয়া 'দেখছি' বলা, 'বলিতেছি' অর্থে 'বলতেছি' না বলিয়া 'বলছি' বলা

ইত্যাদি ইত্যাদি। এতে ভাষায় অনাবশ্যক জটিলতা বাড়িতেছে। কারণ 'করছি' 'দেখছি' পূর্ব-পাকিস্তানের অধিকাংশ জিলায় 'সম্পন্ন বর্তমান কালে'র ক্রিয়া বুঝায় অর্থাৎ কাজগুলি হইয়া গিয়াছে। যদিও ঐ প্রকার ব্যবহারে পশ্চিম বাংলায় শব্দের প্রথম হরফে এবং পূর্ব-বাংলায় শেষ হরফে জোর বা এক্সেন্ট্ দেওয়া হয়, তবু শুধু এ এক্সেন্টের পার্থক্য দিয়া পূর্ব-বাংলার জনগণকে অর্থের পার্থক্য বুঝান যাইবে না। সে চেষ্টাও অনাবশ্যক। কারণ পূর্ব-বাংলার প্রচলিত 'করতেছি' 'দেখতেছি' শব্দগুলি পশ্চিম-বাংলার লোকেরাও বলিতে ও বুঝিতে পারে।

২. বিভিন্ন আঞ্চলিক উচ্চারণকে হুবহু ভাষায় ফুটাইবার চেষ্টা না করা, যথা :

শুনাকে 'শোনা', 'ইচ্ছাকে 'ইচ্ছে', করবেনকে 'কোরবেনা' করবকে 'কোরবো', হলকে 'হলো', দেইকে 'দি', নাইকে 'নি', করতেকে 'কত্তে', পারতেকে 'পাত্তে', ইত্যাদি ইত্যাদি। যদিও বলিবার সময় আমরা অনেকেই ঐ রকমই উচ্চারণ করিয়া থাকি, তবু বানানের সময় ঐ উচ্চারণকে হরফে ফুটাইয়া তুলিবার দরকার নাই। ওটা উচ্চারকের উপরই ছাড়িয়া দেওয়া উচিত। যেমন ধরুন কোন কোন অঞ্চলের লোক লেখে 'প্রথম' 'প্রস্তাব', কিন্তু বলিবার সময় বলে 'পেরথম' 'পেরেস্তাব' ইত্যাদি। এইভাবে উচ্চারণের ব্যক্তিগত ও আঞ্চলিক স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া নিলে আমরা 'করব' লিখিয়াও 'করবো' বা 'কোরবো' 'করে' লিখিয়াও 'কোরে' বা 'কৈরা', 'হয়ে' লিখিয়াও 'হোয়ে' বা 'হৈয়া' উচ্চারণ করিতে পারিব এবং জটিলতা এড়াইয়াও আমরা পূর্ব-পাকিস্তানের সাধারণ কথ্য ভাষা সৃষ্টি করিতে পারিব।

৩. পশ্চিম-বাংলার অনুকরণে 'ইয়া' যুক্ত ক্রিয়াপদকে অতিরিক্ত মোচড়াইবার চেষ্টা না করা যথা :

সরাইয়া স্থলে 'সরায়ে'র বদলে 'সরিয়ে', পরাইয়া স্থলে 'পরায়ে'র বদলে 'পরিয়ে', পড়াইয়া স্থলে 'পড়ায়ে'র বদলে 'পড়িয়ে', বেড়াইয়া স্থলে 'বেড়ায়ে'র বদলে 'বেড়িয়ে', বাহির হইয়া স্থলে 'বার হয়ে'র বদলে 'বেরিয়ে', পার হইয়া স্থলে 'পার হয়ে'র বদলে 'পেরিয়ে, ইত্যাদি ইত্যাদি। এইসব বিকৃতিতে ক্রিয়াপদকে অনাবশ্যকভাবে মূল ধাতু হইতে এতদূরে সরাইয়া দেওয়া হয় যে, চিনিবার উপায় থাকে না।

পক্ষান্তরে উক্ত 'সরায়ে' 'পড়ায়ে' 'বেড়ায়ে' 'খাওয়ায়ে' 'পরায়ে' বলিলে পূর্ব-ও পশ্চিম-বাংলার কথ্য ভাষার মধ্যে একটি সুন্দর আপোসরক্ষা হয়। অবশ্য পূর্ব-বাংলায় 'সরায়ে' 'বাড়ায়ে' ইত্যাদি বলা হয় না। এখানে 'সরাইয়া' 'বাড়াইয়া' ইত্যাদি কেতাবী শব্দই উচ্চারণ করা হয়, শুধু হ্রস্ব 'ই' কে আরও একটু খাট করা হয় মাত্র। যেমন সরা'য়া বাড়া'য়া ইত্যাদি। শেষের 'য়া'কে এখানে 'য়ে' করা হয় না। তবু পূর্ব-ও পশ্চিম-বাংলা-ভাষাভাষীদের নয়া মিশ্রণে পূর্ব-পাকিস্তানে যে নয়া যবান গড়িয়া উঠিবে, তাতে পূর্ব-ও পশ্চিম-বাংলাভাষী পাকিস্তানীদের এই ভাষিক আপোষ আমাদের ভাষার উন্নতি বিধান করিবে বলিয়াই মনে হয়।

আপোস ফর্মূলা

এই আপোস-ফরমূলা গ্রহণ করিলে উপরের ঐ মডেল বাক্যটি এইরূপ ধারণ করিবে :

www.pathagar.com

তুলার বাজার এমন মংগা আর দেখি নাই। তুলার অভাবে সূতার কলগুলি বন্ধ হয়ে গেছে। সূতার অভাবে পাল বোনা হচ্ছে না। পাল ছাড়া নৌকায় ক্ষেপ দেওয়া যাচ্ছে না। ফলে হাঁড়ি-পাতিল বেচা-কেনা বন্ধ। কুমারদের তাতে খুবই অসুবিধা হয়েছে। দু'মুঠা ভাতের আশায় তারা খান্দানী পেশা থনে বার হয়ে এসেছে। তবে ভিক্ষা করে খাবার ইচ্ছা তাদের নাই। জরু-কবিলারে খাওয়ায়ে-পরায়ে বাঁচায়ে রাখবার জন্য তারা লাকড়ির পেশা ধরেছে। কাঠ কুড়াবার মতলবে তারা কুড়াল-হাতে নদী পার হয়ে সুন্দর বনে যায় খুব সকালে। সারাদিন বাদে বিকাল-সন্ধ্যায় কাঠ নিয়া ঘরে ফিরে আসে।

বলা বাহুল্য উপরের মডেল বাক্যটি আমার সাজেসশান মাত্র। এ সাজেসশানের আসল মতলব এই যে, সাধারণ শব্দই হউক আর ক্রিয়াপদই হউক কথা বলিবার সময় শিক্ষিত বক্তার মুখে সহজে বিনা চেষ্টায় বিনা-কৃত্রিমতায় আপনা-আপনি যা আসিয়া পড়ে তাই শুদ্ধ ভাষা। বিদেশী শব্দ সম্বন্ধে যা সত্য, পশ্চিম-বাংলার ক্রিয়াপদ সম্বন্ধেও অবিকল তাই সত্য। আমি অনেক শিক্ষিত লোক ও কবিসাহিত্যিকের মুখে একই বাক্যে একবার 'খেয়েছি' আবার 'খাইছি' ইত্যাদি দুমিশালী ক্রিয়াপদের ব্যবহার দেখিয়াছি। এটাকে আমি দোষের মনে করি না। আমাদের মুখের কথ্য বাংলা বোধ হয় এইভাবেই তার ফর্মেটিভ মুদ্দত পার হইবে এবং হয়তো এই রূপেই স্ট্যাণ্ডার্ডাইযড্ হইবে।

আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এই যে, রাজধানীর বাংগালী শিক্ষিত সম্প্রদায় তাঁদের বৈঠকখানায় স্কুলে-কলেজে ও অফিস-আদালতে মোটামুটি এই ধরনের দুমিশালী ভাষাতেই কথা বলেন এবং চট্টগ্রাম হইতে রাজশাহী ও সিলেট হইতে খুলনা পর্যন্ত সারা পূর্ব-পাকিস্তানের শিক্ষিত-অশিক্ষিত-নির্বিশেষে সকলে এই ভাষা বুঝেন।

পরিভাষা-সমস্যা

আমাদের ভাষা-সমস্যার আরেক দিক পরিভাষা সম্বন্ধে আমাদের সুধী সমাজের একাংশের ধারণা। আমরা জ্ঞানে-বিজ্ঞানে উন্নত হইবার চেষ্টা করিতেছি। মাতৃভাষার মারফতে ছাত্রদেরে আমরা সকল শাখার জ্ঞান-বিজ্ঞান শিখাইবার সংকল্প নিয়াছি। তা করিতে গেলে ক্লাসে বাংলায় ঐ ঐ বিষয়ে লেকচার দিতে হইবে এবং বই-পুস্তক লিখিতে হইবে। কাজেই প্রশ্ন উঠিয়াছে আমাদের পরিভাষা সৃষ্টি করিতে হইবে। ইহাই তাঁদের অভিমত। সেই উদ্দেশ্যে তাঁরা বিশেষজ্ঞ কমিটি নিয়োগ করিয়াছেন। কিছু-কিছু পরিভাষা তাঁরা সৃষ্টিও করিয়াছেন।

আমার ব্যক্তিগত মত এই যে, পরিভাষার প্রশ্ন আসলে একটা সমস্যাই নয়। আমাদের ভাষায় ইংরাজী বা বিদেশী যে-সব শব্দ চালু হইয়া গিয়াছে, ওগুলির বাংলা প্রতিশব্দ বাহির করিবার চেষ্টা নিছক পাগলামি। এমন শক্ত কথা বরার অপরাধ আমার মাফ করিবেন আপনারা। কিন্তু এ ছাড়া অন্য কোন শব্দও আমি খুঁজিয়া পাই না। 'কাগয' 'কলম' 'দোয়াত' ইত্যাদি শব্দ আরবী এ অজুহাতে এক সময়ে হিন্দু পণ্ডিতরা এ-সব শব্দ বাংলায় ব্যবহার করিবেন না বলিয়া যিদ করিয়াছিলেন এবং পরিভাষা সৃষ্টি করিবার চেষ্টায় 'ভূর্জ-পত্র' 'লেখনী' ও 'মস্যাধার' আবিষ্কার করিয়াছিলেন। আপনারা কি সেই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি করিতে চান? আপনারা কি ট্রেন স্টিমার টিকেট রেল

www.pathagar.com

ইউনিয়ন বোর্ড ইলেকশন ভোট প্রেসিডেন্ট মেম্বর জজ কোর্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ইত্যাদি শব্দের প্রতিশব্দ বাহির করিতে চান? নিশ্চয়ই চান না। তবে আবার পরিভাষা কি? যা আমাদের ভাষায় চলিয়া গিয়াছে, যে-সব শব্দ আমরা দিনরাত নিজেদের কথাবার্তায় ব্যবহার করি বুঝি এবং বুঝাই, সে সবই বাংলা শব্দ। একটি দৃষ্টান্ত দেই :

'আগামী মার্চ মাসে আমাদের ইউনিয়ন বোর্ডের জেনারেল ইলেকশন হইবে। আমার বাবা প্রেসিডেন্টির ক্যানডিডেট হইয়াছেন। কাজেই ভোটারদেরে ক্যানভাস করিতে আমাকে কয়েকটা মিটিং করিতে হইবে। সেজন্য আমি স্কুলে কয়েক দিনের ছুটি চাহিয়া হেডমাস্টারের নিকট এপ্লাই করিয়াছি।'

এটা কি বাংলা ভাষা না? পূর্ব-পাকিস্তানে এমন কোনো শিক্ষিত অশিক্ষিত লোক আছে কি যে এটা বলে না বুঝে, না?

চলতি শব্দই বাংলা শব্দ

স্কুল-কলেজের বাহিরে যেটা চলে ভিতরে তা চলিবে না কেন? কলেজের ভিতরের একটা দৃষ্টান্ত নেন।

'আমাদের কলেজের ইকনমিকসের প্রফেসার গতকাল ক্লাসে খুব স্টাডি করিয়াই দিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। ওটা এত ইন্টারেস্টিং হইয়াছিল যে, আমরা সবাই তার ডিটেলড নোট নিয়াছি। তাতে প্রিটেস্টে পাস করা আমাদের অনেকের পক্ষেই খুব ইযি হইবে।'

এটা কি বাংলা ভাষা নয়? এই ভাষায় যদি প্রফেসররা লেকচার, দেন, তবে কার কি অসুবিধা হইবে? যেমন করিয়া কলেজ ক্লাস হসপিটাল প্রেসক্রিপশন অপারেশন মেডিসিন ট্রিটমেন্ট ইস্ট্রুমেন্ট এক্সরে রেডিওলজি কার্ডিওগ্রাফ থার্মোমিটার ষ্টেথিসকোপ ইত্যাদি টার্ম আমাদের কথাবার্তায় ও লেখাপড়ায় ইস্তেমাল করি, তেমনি করিয়া আমরা যদি সমস্ত মেডিক্যাল লজিক্যাল বোটানিক্যাল ফিযিওলজিক্যাল ও সাইকলজিক্যাল টার্ম লেখায় ও কথায় ব্যবহার করি, তবে তাতে দোষ কি? অসুবিধা কোথায়?

দেশী ভাষায় প্রতিশব্দের তালাসে মানুষ গোড়ামির কোন স্তরে যাইতে পারে, তা দেখিয়াছিলাম আমি কলিকাতায়। আপনাদের হয়তো অনেকেই জানেন যে, 'ইত্তেহাদ' সম্পাদন উপলক্ষে পাকিস্তান হওয়ার পরেও প্রায় তিন বৎসর কাল আমার কলিকাতায় থাকিতে হইয়াছিল। সেই সময় পশ্চিম-বাংলা সরকার ডাক্তার সুনীতি চাটার্জীর নেতৃত্বে একটি পরিভাষা কমিটি নিয়োগ করেন। ঐ কমিটির রিপোর্ট বিবেচনার জন্য সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ্‌গণের এক সভা হইয়াছিল। তাতে আমারেও ডাকা হইয়াছিল। কমিটি রিপোর্ট শুনিয়া আমাদের চক্ষু একদম চড়ক গাছ। তাঁরা মিউনিসিপ্যালিটি কর্পোরেশন হাইকোর্ট এডভোকেট সেক্রেটারিয়েট মিনিস্টার সেক্রেটারি মিলিটারি ক্যাবিনেট এসেম্বলি হোস্টেল রেস্টুরেন্ট টুর্নামেন্ট ভ্যানিটি ব্যাগ ইত্যাদি সুপ্রচলিত শব্দগুলির সংস্কৃত প্রতিশব্দ বাহির করিয়াছিলেন। আমিই ঐ রিপোর্টের প্রতিবাদে বক্তৃতা করি প্রথম। সভায় সমবেত শিক্ষাবিদগণ ঐ রিপোর্টের বিরুদ্ধে এত চটিয়া গিয়াছিলেন যে, আমার মতো পাকিস্তানী বাংগালীর সমর্থনে অধিকাংশ বক্তা বক্তৃতা করিয়াছিলেন। ঐ রিপোর্ট সে সভায় গৃহীত হইতে পারে নাই।

www.pathagar.com

কিন্তু দেশ-প্রেমের উদ্দীপনা ও কৃত্রিম জাতীয়তাবোধের গোড়ামি সেখানে এতদূর অগ্রসর হইয়াছিল যে, জনমতের রাজনৈতিক চাপে পশ্চিম-বাংলায় এবং ভারতের অন্যান্য প্রদেশে ঐ রিপোর্ট বা অনুরূপ অন্যান্য রিপোর্ট গ্রহণ করিতে সরকার বাধ্য হইয়াছিলেন। ফলে আজ ভারতে কাগযে-কলমে চীফ মিনিস্টারকে মুখ্যমন্ত্রী, আইন পরিষদকে বিধান সভা, কর্পোরেশনকে পৌরসভা, ভ্যানিটি ব্যাগকে 'ফুটানি কি ডিবিয়া', অল-ইণ্ডিয়া রেডিওকে 'অখিল ভারত আকাশবাণী', অল-ইণ্ডিয়া টেনিস টুর্নামেন্টকে 'অখিল ভারত ঘেচুগেণ্ডু ঝাপট' বলবার চেষ্টা চলিতেছে। কিন্তু এসব অস্বাভাবিকতা কিছুতেই স্থায়ী হইতে পারে না। ভারতের জনগণ তাদের কথায় এবং লেখায় কিছুতেই এসব কষ্ট-কল্পিত কৃত্রিমতা মানিয়া নিতে পারে নাই।

আমাদের ভাষায়ও যদি আমরা অমন কোন কৃত্রিমতার আমদানি করি, তবে কালের স্রোতে তা ধুইয়া-মুছিয়া এবং জনমতের চাপে তা পিষিয়া যাইবেই। সুতরাং আমাদের কর্তব্য অতি সোজা। পরিভাষা সৃষ্টির চেষ্টায় সাহিত্যিকদের প্রতিভার অপচয় না করিয়া যে-সব বিদেশী শব্দ আমাদের কথাবার্তায় চলিয়া গিয়াছে, সেগুলি অকাতরে বই-পুস্তকে ও গোটা সাহিত্যে চালু করিয়া দেওয়া উচিত। আমাদের স্কুল-কলেজের শিক্ষকরা এবং অফিস-আদালতের অফিসাররা তাঁদের যাঁর-তাঁর এলাকায় কথা বলিবার সময় যে-সব বিদেশী শব্দ ব্যবহার করেন, লিখিবার সময়ও বাংলা হরফে সেইসব শব্দ ব্যবহার করিবেন। এতে গৌরব হানি হইবে না। ভাষার বিন্দুমাত্র অবনতি ঘটিবে না। বরঞ্চ তাতে আমাদের ভাষার শব্দ-সম্পদ বাড়িয়া যাইবে। এই ইলাস্টিসিটি ভাষাকে দ্রুত আধুনিক বৈজ্ঞানিক ভাষায় পরিণত করিবে।

আমার বক্তব্য শেষ হইয়াছে। আমি উপসংহারে এই আরয করিব যে, আপনারা বিশাল ঐতিহ্যের অধিকারী এক নয়া জাতির কালচারেল রিনেসাঁর আর্কিটেক্ট ও ইন্‌জিনিয়ার। আপনাদের দৃষ্টির স্বচ্ছতা, বুকের বল, প্রাণের সাহস, মনের উদারতা ও চিন্তার সবলতা আপনাদের দায়িত্বের উপযোগী হইতে হইবে। অতীতের ভুল শুধরাইবার সংকল্পে দৃঢ়তা, নয়া পথে পা বাড়াইবার বিপদকে বরণ করিয়া নিবার দুর্বার যিদ, ব্যক্তিগত সুখ-সম্পদ ও আরাম-আয়াসে উপেক্ষা, যদি আমরা আয়ত্ত করিতে না পারি, তবে নয়া জাতি গড়িবার অধিকারী আমরা নই, মাথা হেঁট করিয়া সে সত্য আমাদের মানিয়া নেওয়া উচিত। নয়া কালচার ও নয়া ভাষা উভয় ক্ষেত্রেই এটা সত্য।

আপনারা দৃষ্টির সেই স্বচ্ছতা, চিন্তার সেই সবলতা এবং প্রাণের সেই সাহস নিয়া আগুয়ান হন, আপনাদের হাতে নয়া কৃষ্টি ফলে-ফুলে মঞ্জরিত হইয়া উঠুক, আমাদের রাষ্ট্র দুনিয়ার সভ্য রাষ্ট্রপুঞ্জের দরবারে মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হউক, আমাদের মাতৃভাষা সম্পদশালী ইলাস্টিক ও বৈজ্ঞনিক ভাষায় রূপান্তরিত হইয়া একদিকে আমাদের জনগণের মুখের কথা ও মনের ভাবের বাহক হউক, অপরদিকে সে ভাষা আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রকাশ ও প্রসারের উপযোগী মিডিয়াম হউক, সে ভাষা আধুনিক ও উন্নত পাক-বাংলা সাহিত্যকে বিশ্ব-সাহিত্যের আসরে শ্রদ্ধা ও সম্মানের অধিকারী করুক, আল্লার দরগায় এই মুনাজাত করিয়া আমি বক্তৃতার উপসংহার করিলাম।*

---

*১৯৫৮ সালের ৩রা মে চাটগাঁয় অনুষ্ঠিত পূর্ব-পাক সাহিত্য সম্মিলনীর কালচার ও ভাষা শাখার সভাপতির ভাষণের (বর্ধিত ও সংশোধিত) অংশ।

www.pathagar.com

বাংলাদেশের কৃষ্টিক পটভূমি

১.

আগেকার দিনে জাতি অর্থে যাই বোঝা গিয়া থাকুক বর্তমান দুনিয়ায় জাতি অর্থ নেশন। নেশন রাজনৈতিক পরিচিতি। কোনও এক বিশেষ রাষ্ট্রের আনুগত্যে যে মানব-গোষ্ঠী সংঘবদ্ধ, তারাই এক নেশন। সে আনুগত্যের বুনিয়াদ রেস্ গোত্র ধর্ম-বিশ্বাস ও জন্মস্থান যাই হোক না কেন। আধুনিক জাতি গঠনে রেস্, এথ্নো, ধর্ম, কালচার ও ভাষা রাজনৈতিক আনুগত্যের নিচে চাপা পড়িয়া গিয়াছে। একই ধর্মের জনগণ ভিন্ন-ভিন্ন রাষ্ট্র-জাতিতে সংগঠিত হইয়া আসিতেছে তিন শ বছরের অধিক কাল হইতেই। ইউরোপ ও আরবভূমি তার প্রমাণ। ইদানীং এই রাষ্ট্রীয় জাতি গঠনে রেস্, গোত্র, ভাষা ও কৃষ্টিও উপেক্ষিত হইতেছে। অথচ রেস্ গোত্র ও ভাষাই ছিল এতদিন জাতীয়তার প্রধান, এমন কি একমাত্র, বুনিয়াদ। অবশ্য ভাষা আজও জাতীয়তার প্রধান বুনিয়াদ রহিয়া গিয়াছে। কিন্তু তার মধ্যেও একটা বিরাট পার্থক্য সূচিত হইয়া গিয়াছে। একদিকে ভাষার ঐক্য ছাড়াইয়া কানাডা ও সুইযারল্যাণ্ডের মতো রাষ্ট্র-জাতি হইয়াছে, অপর দিকে শুধু ভাষা মানব-গোষ্ঠীকে এক রাষ্ট্র-বাতি রাখিতে পারিতেছে না। একই ভাষা-ভাষীরা আজ ভিন্ন-ভিন্ন রাষ্ট্র-জাতিতে পরিণত হইতেছে। আরব রাষ্ট্রসমূহ এবং ইংলণ্ড ও আমেরিকা তার প্রতিষ্ঠিত প্রমাণ। বাংলাদেশ তার আধুনিক প্রমাণ।

প্রথম দৃষ্টিতে মনে হইবে ইতিহাসের বাংলা ভাগ হইয়া আজ পূর্বাংশ স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র বাংলাদেশ হইয়াছে, আর পশ্চিমাংশ স্বেচ্ছায় ভোট দিয়া বৃহত্তর গণতান্ত্রিক স্বাধীন সার্বভৌম ভারত রাষ্ট্রের অংগ-রাজ্য হইয়াছে। কিন্তু একটু তলাইয়া বিচার করিলেই বুঝা যাইবে ইংরাজ আমলের বাংলাই ভাগ হইয়াছে, ইতিহাসের বাংলা ভাগ হয় নাই। সীমা-সরহদ্দ রদ-বদল হইয়াছে মাত্র। ঠিক তেমনি বাংলা বিভাগে বাংলার কালচারও ভাগ হয় নাই। তা হয় নাই এই সহজ কারণে যে, ইংরাজ আমলের আধুনিক বাংলায় জাতীয় কৃষ্টি বলিয়া কিছু ছিল না। ইংরাজী শিক্ষিত কোট-টাই-হ্যাটওয়ালা বাংগালীদের একটা পোশাকী কালচার ছিল বটে এবং সে কালচারে তাঁদের মধ্যে একটা ঐক্য দেখা গেলেও সে পোশাকী কালচারের সাথে জনগণের কোনও যোগ ছিল না। জনগণের স্তরে বাংলায় দুইটি কৃষ্টি ছিল : একটা বাংগালী হিন্দু কালচার, অপরটা বাংগালী মুসলিম কালচার। বাংগালী হিন্দু কালচারটার সংগে যেমন ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের হিন্দুদের কালচারের কোনও মিল ছিল না, বাংলার মুসলিম কালচারের সাথে তেমনি বাংলার বাহিরের ভারতীয় বা অন্য দেশের মুসলমানদের

www.pathagar.com

কালচারের কোনও মিল বা সম্পর্ক ছিল না। বাংলার অভ্যন্তরে কালচারের ভেদাভেদটা ধর্ম-ভিত্তিক ছিল বটে, কিন্তু বাংলার বাহিরের সাথে এই দুই বাংগালী কালচারের ধর্ম-ভিত্তিক কোন মিল বা সম্পর্ক ছিল না। এখানেই কালচারের স্বকীয়তা ও নিজস্ব শক্তি। কালচার একই ভূ-খণ্ডে ধর্মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে, কিন্তু ভৌগোলিক এলাকার বাহিরে কালচারকে টানিয়া নিবার কোনও শক্তি ধর্মের নাই।

বাংলাদেশের কৃষ্টিক পটভূমির সন্ধান করিতে হইলে তাই আমাদের এই দেশের প্রাচীন ইতিহাসের পাতা উল্টাইতে হইবে। বাংলাদেশ একটা মুসলিম-মেজরিটি গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র। কিন্তু এটা রাজনীতির দিক। কালচারের দিক হইতেও আমরা এদেশের জনগণের মধ্যে ধর্মীয় গণতন্ত্র দেখিতে পাই। এটা কি বাংলাদেশের বাশিন্দাদের মেজরিটি মুসলমান বলিয়া? বাংলাদেশে মুসলিম মেজরিটি হইল কেমন করিয়া? স্পষ্টতই এই মেজরিটি আরব পারস্য হইতে আসে নাই। এই দেশেরই দীক্ষিত মুসলমান তারা। এই খানেই বাংলাদেশের কৃষ্টিক পটভূমির সন্ধান করিতে হইবে।

বাংলাদেশ রাষ্ট্রীয়নেশন হিসাবে নতুন হইলেও সভ্য মানব-গোষ্ঠী-অধ্যুষিত জনপদ হিসাবে পুরাতন। বস্তুত প্রাচীন সভ্য মানবগোষ্ঠী হিসাবে বাংগালী জাতির বয়স প্রায় চার হাজার বছর। প্রতিষ্ঠিত ঐতিহাসিক সত্য এই যে, খৃষ্টের জন্মের প্রায় চার হাজার বছর আগে আজকার পাকিস্তানে দ্রাবিড় নামক এক প্রাচীন সভ্য জাতির অধিবাস ছিল। ভারত উপমহাদেশে আর্য জাতির আগমনের প্রায় দুই হাজার বছর আগে হইতেই এঁরা তথাকার স্থায়ী বাশিন্দা ছিলেন। দ্রাবিড়রা সেমেটিক গোষ্ঠীর একটি সম্প্রদায়। আর্যদের বহু আগে এঁরা ভারতে আসেন। ভারতে আগমনের আগে এঁরা ব্যাবিলন অঞ্চলে বাস করিতেন। প্রথমে তাঁরা সিন্ধুদেশ ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় বসতি স্থাপন করেন। মহেঞ্জোদারো ও হরোপ্পা এঁদেরই দ্বারা স্থাপিত রাজধানী। এই দুই সুপ্রাচীন নগরীর স্থপতি ও কারুকার্য হইতেই দ্রাবিড় জাতির সভ্যতার পরিমাপ করা যায়। এঁরা শুধু স্থপতি-বিদ্যায়ই উন্নত ছিলেন না। উন্নত ভাষা ও বর্ণমালাও এদের ছিল। ভারতে বৌদ্ধ যুগেও যে এই দ্রাবিড়ী বর্ণমালার প্রাধান্য ছিল, তার বড় প্রমাণ এই যে অশোক স্তম্ভগুলির স্মারক লিপিগুলি এই দ্রাবিড়ী সেমিটিক বর্ণমালাতেই লেখা। এ বিষয়ে যাঁরা বিস্তারিত বিবরণ জানিতে চান, তাঁদেরে অধ্যাপক নাযিরুল ইসলাম মোহাম্মদ সুফিয়ানের গবেষণা-ভিত্তিক বিশাল গ্রন্থ 'বাংলা সাহিত্যের নতুন ইতিহাস' পড়িয়া দেখিতে অনুরোধ করা যাইতেছে।

খৃষ্ট-পূর্ব দুই হাজার সালে আর্যরা ভারতে প্রবেশ করেন। তাঁদের দ্বারা বিতাড়িত হইয়া দ্রাবিড়দের এক অংশ দক্ষিণ ভারতের পথে ছড়াইয়া পড়েন। সেখান হইতে একদল বাংলাদেশের মাটির উর্বরতায় আকৃষ্ট হইয়া এখানে আসেন এবং স্থায়ী বসতি স্থাপন করেন। তাঁরা মহেঞ্জোদারো-হরোপ্পার মতো সুন্দর নগরী বাংলাদেশেও নিশ্চয়ই নির্মাণ করিয়াছিলেন। অবশ্য স্থানীয় নির্মাণ-উপকরণের পার্থক্যহেতু সে-সব স্থপতিতেও নিশ্চয় পার্থক্য ছিল। কিন্তু আজ সে সবের কোনও চিহ্ন নাই। প্রাকৃতিক কারণে বাংলাদেশে চিরস্থায়ী প্রাসাদ-দুর্গ-অট্টালিকা নির্মাণের উপযোগী মাল-মশলাও যেমন দুষ্প্রাপ্য, নির্মিত দালান-কোঠা ইমারত রক্ষা করাও তেমনি কঠিন। প্রাকৃতিক দুর্যোগের এরা নিশ্চিত শিকার। ময়নামতী, মহাস্থানগড় ইত্যাদিই তার প্রমাণ। ময়নামতী ও মহাস্থানগড়ের ভগ্নাবশেষ দেখিয়া বাংলাদেশের সভ্যতার প্রাচীনত্ব ও

www.pathagar.com

স্থপতির চমৎকারিত্ব আন্দাষ করা যায় মাত্র, বিচার করা যায় না। এগুলি সে স্থপতির আসল ও সম্পূর্ণ রূপ নয়। ঐতিহাসিক ও স্থপতিবিশেষজ্ঞদের মতে বাংলাদেশের বহু প্রাচীন স্থপতি-নিদর্শন কীর্তিনাশা, পদ্মা, ধলেশ্বরী, মেঘনা, সুর্মা, ব্রহ্মপুত্র, করতোয়া, কপোতাক্ষ নদীর গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে। নদীমাতৃক বাংলাদেশের পলিমাটি শুধু হাজার-হাজার বছরের প্রাচীন কীর্তিই গ্রাস করে নাই, অপেক্ষাকৃত আধুনিক পাঠান মোগল যুগের কীর্তিগুলিও ধ্বংস করিয়া ফেলিয়াছে। ছয়শ বছরের পাঠান-মোগল আমলে এবং তারও আগে চার হাজার বছরের দ্রাবিড়ী ও বৌদ্ধ-হিন্দু শাসন আমলে বাংলাদেশে নিশ্চয়ই অসংখ্য নগর-বন্দর ও রাজধানী-শহর স্থাপিত হইয়াছিল এবং সেখানে অগণিত দুর্গ-প্রাসাদ ও হাবিলি-ইমারত নির্মিত হইয়াছিল। সেগুলি গেল কোথায়? কোনও চিহ্ন নাই তাদের কি কারণে?

এ প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন সার চার্লস ডইলি ও তাঁর মতো বহু বিশেষজ্ঞ। সার চার্লস তাঁর বিখ্যাত পুস্তক 'এন্টিকস্-অব-ঢাকা'য় লিখিয়াছেন : "যে জায়গায় চার শ মাইলের মধ্যে পাথর পাওয়া যায় না, যে দেশের মাটিতে শক্ত কাঠ জন্মে না, যে স্থানে এবং যে যুগে সিমেন্ট আবিষ্কৃত হয় নাই, সেই যুগে স্বভাবতই ইট-সুরকি-চুন দিয়াই দালান-ইমারত নির্মিত হইত। যে দেশের আবহাওয়ার বার্ষিক আর্দ্রতা ১২ ডিগ্রী, যে দেশে বন্যা লাগিয়াই আছে, যে দেশের প্রবল স্রোতস্বিনী নদী দু'কূল ছাপাইয়া ও ভাংগিয়া পথ চলে, সে দেশে দালান-ইমারতের হায়াত লম্বা হইতে পারে না।" কিভাবে পাখীর ঠোঁটে বা বাতাসের সাথে বটের বীজ দালান-ইমারতে ছড়াইয়া পড়ে, কিভাবে লোক-চক্ষুর অন্তরালে সে বটের বীজ চারায় পরিণত হয়, কিভাবে সে চারার শিকড় দালানের পরতে-পরতে প্রবেশ করিবার পর তাতে পাতা হয় এবং মানুষের নযরে ধরা পড়ে, কিভাবে ততদিনে সে বটের শিকড় তেমন মজবুত ও পাথরের মত শক্ত ইট-সুরকির গাঁথনি হইতে রস সংগ্রহ করিয়া দুরপনেয় গাছে পরিণত হয়, কিভাবে সেইসব শিকড় অক্টোপাসের মতো অসংখ্য হাত-পা ছড়াইয়া দালানের লাইনে-লাইনে বিরাট ও মারাত্মক চিড় ও ফাটল সৃষ্টি করিয়া অমন শক্ত দালান-ইমারতের হায়াত কমাইয়া দেয়, সূক্ষ্মদর্শী বিশেষজ্ঞের মতই সার চার্লস তার নিখুঁত বর্ণনা দিয়াছেন। তারপর বহু নযির-প্রমাণ দিয়া স্যার চার্লস এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, পাক-বাংলায় অগণিত নগর-বন্দর ও দুর্গ-শহর তাদের প্রাসাদ-ইমারতসহ হয় নদীগর্ভে বিলীন হইয়াছে, নয় ত নদী-তীরের বালুকণায় পর্যবসিত হইয়াছে। অন্যান্য নযিরের মধ্যে দুলাই নালার মোহনায় অবস্থিত ঢাকা বন্দরের অতীত গৌরবের বর্ণনাই তিনি বিশেষভাবে দিয়াছেন। তিনি তাঁর বিশাল পুস্তকের অন্যতম প্রধান সুচিন্তিত সুলিখিত অধ্যায় 'রিফ্লেকশন্স অন তাঁতিবাজার ব্রিজ'এ বলিয়াছেন :

"অসংখ্য নাবিক ও জাহাজ-মিস্ত্রীদের হৈ-হল্লা একদা এই বন্দরে দিবানিশি প্রতিধ্বনিত হইত। দুলাই নালার দুই পাড় ও তৎসংলগ্ন বিশাল এলাকা একদা বাণিজ্যিক কর্ম-ব্যস্ততায় সদা-চঞ্চল ও কর্ম তৎপরতায় সদামুখরিত থাকিত। মূল বন্দর রাজকীয় রণতরীর সাজ-সরঞ্জামে সদা-সমৃদ্ধ ও সম্ভারপূর্ণ থাকিত। অসংখ্য আলোকমালায় গোটা বন্দর এলাকা দিন-রাত আলোকে উদ্ভাসিত থাকিত। সেই বন্দরই আজ নিস্তব্ধ জন-শূন্যতায় খা-খা করিতেছে। আজও এখানে সেই বুড়িগংগা তার নীরব ম্যাজেস্‌টি লইয়া আগের মতই বহিয়া যাইতেছে। মানুষের তৈয়ারী যে-সব

www.pathagar.com

আর্ট ও ইণ্ডাস্ট্রি বুড়ীগংগার তীর ও পার্শ্ববর্তী এলাকা সমৃদ্ধ ও ঐশ্বর্যময় করিয়াছিল, সে সবের সকল নিদর্শন আজ তারই গর্ভে বিলীন হইয়াছে। অথবা তীরবর্তী বালুকারাশিতে পরিণত হইয়াছে। পদ্মার পাড়ের ইতিহাসও অবিকল তাই। এইদিক হইতে বিবেচনা করিলে পদ্মাকে কীর্তিনাশা নাম দেওয়া ঠিকই হইয়াছে।"

২.

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও নদী-নালা তার অতীত গৌরবের আর্ট-ইণ্ডাস্ট্রি ও স্থপতিকে এমনিভাবে বিধ্বস্ত ও তছনছ করিয়াছে। কিন্তু একটিমাত্র ব্যাপারে এসব নৈসর্গিক প্রতিকূলতা বাংলাদেশের জীবনে কোন ধ্বংস ও পরিবর্তন সাধিতে পারে নাই। সেটা বাংলাদেশের কৃষ্টি। পাক-বাংলার মজবুত শক্ত দুর্গ-প্রাসাদ ও দালান-ইমারত যে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও নদীর ভাংগনের সামনে টিকিতে পারে নাই, সেই কীর্তিনাশা সর্বনাশা ঝড়-ঝঞ্ঝা প্রলয়েই সামনে যে একটিমাত্র বস্তু অটল স্থায়িত্ব লইয়া নিজের গৌরবে উচ্চ শিরে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিয়াছে, তা বাংলাদেশের কালচার। তার কারণ এই যে, বাংলাদেশের কালচার তার মাটিতে সুদৃঢ়ভাবে প্রোথিত। সে কালচারের শিকড় দেশের মাটির গহিনে বিস্তৃত। বাংলাদেশের কৃষ্টি বাংলাদেশের দালান-ইমারতের মতো ইট-সুরকি দিয়া নির্মিত হয় নাই। তার বদলে এ কালচার নির্মিত হইয়াছে তার রগ-শিরায়, প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বাংলাদেশের আত্মায়। ফলে বৈদেশিক ভাবধারা ও পরকীয় কালচারের বন্যায় পলিমাটি ও ঝড়-তুফানের ধূলি-বালুতে মাঝে-মাঝে সে কালচার চাপা পড়িয়া থাকিলেও প্রতিকূল আবহাওয়ার অবসান হওয়া মাত্র স্বাভাবিকতার মলয় হাওয়ায় সে কালচার তার আপন ঔজ্জ্বল্যে ঝলমল করিয়া উঠিয়াছে।

অতি প্রাচীন বাংলাদেশের ঐ কালচারেরই নব-রূপ নব-পর্যায়ে আমাদের বর্তমান কালচার। নব-পর্যায়ের এই কালচার গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রী ধর্ম ইসলামেরই অবদান। ইসলাম ধর্ম বাংলাদেশ ও তার জনগণের সামনে দিগ্বিজয়ীর বেশে আসে নাই। এখানে সে ধর্ম আসিয়াছে জনগণের ধর্ম হিসাবেই। বাংলাদেশে, ভারতে ও পাকিস্তানে ইসলামের আবির্ভাবের ইহাই মৌলিক পার্থক্য। ইতিহাসের অসাবধান লেখক ও পাঠকরা এইখানেই মস্তবড় ভুল করিয়া থাকেন। তাঁরা দিগ্বিজয়ী বীর বখ্‌তিয়ার খিলজীর বাংলাদেশে আগমনকেই এদেশে ইসলামের আগমন মনে করিয়া থাকেন। এটা নিতান্তই ভুল ধারণা। বখ্‌তিয়ার খিলজী বাংলাদেশ জয় করেন ১১৯৯ খৃষ্টাব্দে। বার শতকের শেষ-বছরে। এই ঘটনার প্রায় তিন শ' বছর আগে হইতেই বাংলাদেশে শুধু ইসলামের আবির্ভাবই হয় নাই, ততদিনে ইসলাম বাংলাদেশের অনেক অঞ্চলে জনগণের ধর্মে পরিণত হইয়াছে। বাংলাদেশে ইসলামের প্রথম আবির্ভাব হয় পশ্চিম ভারতের স্থলপথ দিয়া নয়, দক্ষিণ দিক দিয়া জল-পথে। চাটগাঁ বন্দর হইয়াই ইসলাম বাংলায় প্রবেশ করে সর্বপ্রথম। প্রথমেই আসে সূফী সুলতান বায়যিদ বোস্তামীর কথা। ইনি ৭৭৭ খৃষ্টীয় সালে ইরানে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৮৭৪ খৃঃ ইন্তেকাল করেন। তিনি ইরান ইরাক ও ভারতের বিভিন্ন স্থানে ইসলাম প্রচার করিতে-করিতে সম্ভবত আরব বণিকদের সাথে চাটগাঁয়ে আসেন। এখানে তিনি বেশ কিছুদিন অবস্থান করিয়া ইসলাম প্রচার করেন। চাটগাঁর নাসিরাবাদে অবস্থিত তাঁর নামীয় আস্তানা ও চিল্লার প্রতি

www.pathagar.com

স্মরণাতীত কাল হইতে সকল সম্প্রদায়ের জনগণ, বিশেষত মুসলমানরা যে ভক্তি ও সম্ভ্রম দেখাইয়া এবং পবিত্র স্থানের মর্যাদা দিয়া আসিতেছে, তাতে বিনা-দ্বিধায় এটা ধরিয়া লওয়া যায় যে, সুফী সাহেব এই স্থানে ধর্ম সাধনা ও ইসলাম প্রচার করিয়া অগণিত ভক্ত ও শাগরেদ সৃষ্টি করিয়া গিয়াছিলেন। সুলতান বায়যিদের পরেই মীর সৈয়দ সুলতান মাহমুদ শাহ মাহিসোওয়ার (মৃত্যু ১০৪৭ খৃঃ), শাহ মোহাম্মদ সুলতান রুমী (মৃত্যু ১০৫৩ খৃঃ), বাবা আদম শহীদ (মৃত্যু ১১১৯ খৃঃ), শাহ নিয়ামতুল্লাহ বুৎশিকান প্রমুখ ইতিহাস-বিখ্যাত ওয়ালি-আল্লাগণ বাংলার বিভিন্নস্থানে দীর্ঘদিন ইসলাম প্রচার করিয়া হাজার হাজার মুরিদান রাখিয়া গিয়াছেন। এঁরা সকলেই বখতিয়ার খিলজীর বাংলা বিজয়ের এক হইতে তিন শ' বছর আগে বাংলাদেশে লক্ষ-লক্ষ লোককে ইসলাম ধর্মে দীক্ষা দিয়াছিলেন। বস্তুত বখতিয়ার খিলজীর আমল (১১৯৯) হইতে ইলিয়াস শাহী আমল (১৩৪২) পর্যন্ত এই প্রায় দেড় শ' বছর কালকেই বাংলায় মুসলিম শাসন কায়েম হওয়ার প্রাথমিক অধ্যায় বলা যাইতে পারে। এই মুদ্দতেই মুসলমান শাসকরা সর্বপ্রথম গোটা বাংলায় নিজেদের আধিপত্য স্থাপনে সফল হন। কিন্তু এই মুদ্দতকে বাংলায় ইসলাম ধর্মের প্রসার লাভ করার প্রথম যুগ বলা ভুল হইবে। উপরে উল্লিখিত ওয়ালি-আল্লাদের প্রচার ফল কি হইয়াছিল, তা অনুমান করিতে পারি আমরা কয়েকটি ঐতিহাসিক ঘটনা হইতে।

ইতিহাস-পাঠক মাত্রেই জানেন, ১৩০৩ সালে বিখ্যাত পীর দরবেশ বীরযোদ্ধা শাহ জালাল সাহেব সিলেটের রাজা গৌরগোবিন্দকে পরাজিত করিয়া সিলেট জয় করেন। পীর সাহেব নিশ্চয়ই বিনাকারণে পররাজ্য দখল করিতে আসেন নাই। মুসলমান প্রজাদের উপর রাজা গৌরগোবিন্দ অমানুষিক যুলুম করিতেছিলেন বলিয়াই শাহ জালাল সাহেব শুধু মুসলমানদের রক্ষার জন্যই সিলেট আক্রমণ করিয়াছিলেন। এটাও ঐতিহাসিক সত্য যে, রাজা গৌরগোবিন্দ তাঁর মুসলিম প্রজাদের ধর্ম-কাজে বাধা দিতেন। তাদের উপর সাম্প্রদায়িক পক্ষপাতমূলক বিধি-নিষেধ আরোপ করিতেন। মুসলিম প্রজারা আবেদন-নিবেদন করিলে রাজা তাতে কর্ণপাত করিতেন না। বিধি-নিষেধ অমান্য করিলে প্রজাদের উপর নানাবিধ অত্যাচার-উৎপীড়ন করিতেন। মসজিদে আযান দিতে না দেওয়া, জমাতে ঈদের নমায পড়িতে না দেওয়া, গরু কোরবানি নিষেধ করা, টুপি পরিতে না দেওয়া, মুসলমানদের দাড়ি কাটিয়া দেওয়া ইত্যাদি ছিল রাজা গৌরগোবিন্দের অসংখ্য যুলুমের কয়েকটি নমুনা মাত্র। রাজার অত্যাচার মুসলমানদের পক্ষে অসহ্য হইলেই তারা বাধ্য হইয়া দিল্লীর বাদশাহ সুলতান ফিরোয শাহের দরবারে একদল প্রতিনিধি পাঠান। এই প্রতিনিধি দলের মুখে রাজা গৌরগোবিন্দের মুসলিম-প্রজা-নির্যাতনের কাহিনী শুনিয়াই দিল্লীর বাদশাহ শাহ জালালকে মুসলিম নির্যাতন নিবারণ করিতে পাঠান। শাহ জালাল সিলেটে পৌঁছিবার আগেই ফিরোয শাহ গুপ্ত ঘাতকের হাতে নিহত হন এবং সুলতান আলাউদ্দিন তখতে আরোহণ করেন। আলাউদ্দিন খিলজিও শাহজালালকে সাহায্য করেন। রাজা গৌরগোবিন্দ কোন প্রতিকার না করাতেই শাহজালাল সিলেট আক্রমণ করিতে বাধ্য হন। যুদ্ধে রাজা গৌরগোবিন্দ পরাজিত হন। শাহ জালাল সিলেট দখল করেন।

www.pathagar.com

৩.

এই ঘটনা হইতে আমরা কি বুঝি? বুঝি এই যে, ঐ সময়ে সিলেটে এত বেশি মুসলমান ছিল যে, হিন্দু রাজার পক্ষে অত্যাচার করা দরকার হইয়াছিল। মুসলমানরা যথেষ্ট শক্তিশালী ও দলে ভারি না হইলে রাজার আদেশের প্রতিবাদে বিক্ষোভ প্রদর্শন করিতে পারিত না, আইন অমান্য করিতে পারিত না, টুপি পরিয়া দাড়ি রাখিয়া প্রকাশ্যে চলাফিরা করার, মসজিদ নির্মাণ করিয়া তাতে উচ্চস্বরে আযান দিবার ও জামাতে ঈদের নমায পড়িবার সাহস পাইত না। অবশেষে দিল্লীর দরবারে প্রতিনিধি পাঠাইবার সাহসও তাদের হইত না। অতএব ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে, ঐ সময়ে সিলেটে বহু সংখ্যক মুসলমান বিদ্যমান ছিল।

এই একটিমাত্র ঘটনা হইতেই প্রমাণিত হয় যে, বখতিয়ার খিলজী বাংলা দখল করিবার বহু আগে হইতেই বাংলার জনগণের এক বিপুল অংশ ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিল। অন্য কথায় বলা যায়, মুসলিম রাষ্ট্রশক্তি বাংলা জয় করিবার বহু আগেই ইসলামের কৃষ্টিক শক্তি বাংলা জয় করিয়াছিল।

প্রশ্ন এই যে, এটা কি করিয়া সম্ভব হইয়াছিল এবং কবে হইয়াছিল? প্রথম প্রশ্নটার ঐতিহাসিক জবাব এই যে, চাটগাঁ বন্দরের মধ্য দিয়া বাংলাদেশে ইসলামের শুভাগমন হয়। এই হিসাবে পাক-বাংলার কৃষ্টি পটভূমি রচনায় চাটগাঁ বন্দরের ভূমিকা ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ ও সর্বশ্রেষ্ঠ। এ সম্পর্কে দুইটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যের কথা আমাদের স্মরণ রাখা দরকার। বাংলায় মুসলিম রাষ্ট্র-শক্তি প্রবেশ করে পশ্চিম সীমান্ত-পথে, উত্তর ভারত হইতে। পক্ষান্তরে বাংলায় ইসলাম ধর্ম প্রবেশ করে দক্ষিণ দিক হইতে, সমুদ্রপথে চাটগাঁ বন্দর দিয়া। বাংলায় মুসলিম রাষ্ট্র-শক্তির রূপ তুর্কী, পাঠানী ও মোগলাই রূপ। পক্ষান্তরে বাংলার ইসলাম ধর্মীয় রূপ খাঁটি আরবী রূপ। পাক-ভারতে অপরাপর অঞ্চলের মুসলমানদের তুলনায় বাংগালী মুসলমানদের আড়ম্বরহীন, অপ্রদর্শনবাদী, সতেজ ধর্মীয় চেতনাই বাংগালী মুসলমানদের এই ধর্মীয় বৈশিষ্ট্যের স্বাক্ষর বহন করিতেছে। বাংগালী মুসলিম জনসাধারণের কথ্য ভাষায়, মুখের যবানে ফারসী-উর্দুর চেয়ে আরবী শব্দের প্রাচুর্য দেখা যায় বেশি। তার কারণও এইখানে নিহিত। কিন্তু সে কথা একটু পরে বলিতেছি।

চাটগাঁ বন্দরের মধ্যে দিয়া পাক-বাংলায় ইসলামের আগমনের এবং পাক-বাংলায় মুসলিম রাষ্ট্র-শক্তি কায়েমের বহু আগে হইতেই ধর্ম হিসাবে স্থানীয়ভাবে এখানে ইসলামের প্রতিষ্ঠার কথাটাই আগে বলিয়া নিতেছি। এতে দেখা যাইবে যে, যেদিন বখতিয়ার খিলজীর নেতৃত্বাধীনে বাংলায় মুসলিম রাষ্ট্র-শক্তির প্রথম পদার্পণ হয়, সেদিন তাঁকে অভ্যর্থনা করিবার মতো যথেষ্ট মুসলিম জন-শক্তি বাংলায় বিদ্যমান ছিল। কেমন করিয়া এটা ঘটিয়াছিল, সংক্ষেপে এখানে তার উল্লেখ করিতেছি।

প্রাচীন সভ্যতা ও কৃষ্টির ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, সবগুলি প্রাচীন সভ্যতার জন্ম নদী-উপত্যকায় এবং তাদের বিকাশ ঐ-সবনদীর মোহনাস্থ বন্দরসমূহে। ঐতিহাসিক গিবন, গারস্টিন ও টয়েনবি বহু তথ্য-প্রমাণাদির সাহায্যে দেখাইয়াছেন যে মিসরীয়, বাবিলনীয়; চীনা ও ভারতীয় ইত্যাদি সবগুলি প্রাচীনসভ্যতার আদি জন্ম যথাক্রমে আদি জন্ম যথাক্রমে নীল নদী, দজলা, ফোরাত,

www.pathagar.com

ইয়াং হো ও সিন্ধু নদীর উপত্যকা ও তাদের প্রকাশ ও বিস্তৃতি ঐ-সব নদীর মোহনা দিয়া সমুদ্র-পথে। অধ্যাপক টয়েনবি বলিয়াছেন, চীনের পীত নদীর সাথে তিব্বতে উৎপন্ন ব্রহ্মপুত্র নদীর যোগাযোগ ছিল। ব্রহ্মপুত্র নদীর মোহনা বংগোপসাগরে। কিন্তু সাগরে পড়িবার আগেই পশ্চিম ভারতের সিন্ধু নদীর এক শাখা (বর্তমানে গংগা-যমুনা) আসিয়া ব্রহ্মপুত্রে মিলিত হয়। এই সম্মিলিত নদীর বর্তমান নাম যদিও পদ্মা, আগের নাম গংগা। নদী-মোহনার নাম গংগা মোহনা।

অতি প্রাচীনকাল হইতেই আরব জাতি ব্যবসা-বাণিজ্যে আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করিয়াছিল। উত্তরে ভূমধ্য সাগর, দক্ষিণে আরব আরব সাগরসহ ভারত মহাসাগরের সর্বত্র এবং পূর্বে প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জে আরব বাণিজ্য-তরীর একাধিপত্য ছিল। খৃষ্টপূর্ব দুই শতকেও আরব বণিকরা উত্তর গ্রীস মেসিডোনিয়া, পূর্বে ভারতবর্ষ, মালয়, জাভা, সুমাত্রা ও চীন পর্যন্ত দেশ-বিদেশে বিশাল-বিশাল জাহাজে সওদাগরি করিতেন। এই উপলক্ষে আরববণিকরা ভারতীয় উপকূলের সুরাট, কোচিন, কালিকট, তাম্রলিপ্ত ও চাটগাঁ ইত্যাদি বন্দর ব্যবহার করিতেন। এইসব বন্দরের মধ্যে চাটগাঁ বন্দরই আরবদের প্রধান বাণিজ্য-কেন্দ্র ছিল। আরব বণিকরাই এই বন্দরের প্রভূত উন্নতি সাধন করেন। এই বন্দরকে ক্রমে নগরে পরিণত করেন তাঁরাই। এই বন্দরের নামও আরব বণিকরাই রাখিয়াছিলেন শাতিল-গংগা। শাতিল-গংগা নামই যে কালক্রমে পরিবর্তন হইতে-হইতেই চাটিগাং হইয়াছিল, এটা ধরিয়া নেয়া যাইতে পারে। খৃষ্টীয় দুই শতকে মিসরীয় ঐতিহাসিক টলেমি জাভা সুমাত্রা ইত্যাদি বন্দরের নামোল্লেখ করার সাথে-সাথে পাট-ডি-গংগা নামে গংগা নদীর মোহনাস্থ বন্দরের নাম করিয়াছেন। এ বন্দর বর্তমানের চিটাগাং ছাড়া আর কোনো স্থান নয়। চাটিগাং বা শাতিল-গংগা নাম আরব বণিকদের দেওয়ার সম্ভাবনাই বেশি এই কারণে যে, এইসব আরব বণিক তাঁদের দেশের দজলা-ফোরাত (বর্তমানের টাইগ্রিস ইউফ্রেটিস) নদীর মোহনাস্থ বন্দর শাতিল-আরবের সহিত বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন। তৎকালে সমগ্র আরব ভূমিতে শাতিল-আরব বন্দরই ছিল সাগর-পথের বাণিজ্যের শ্রেষ্ঠ বন্দর। নিজেদের দেশের শ্রেষ্ঠ বন্দরের প্রিয় নাম অনুসারে বিদেশের একটি বন্দরের নাম রাখা খুবই স্বাভাবিক। নব-আবিষ্কৃত মার্কিন মুল্লুকের ইংরাজ ঔপনিবেশিকরা আমেরিকার বহু শহরের নাম ইংল্যাণ্ডের স্থানের নাম অনুসারে রাখিয়াছেন।

তৎকালে গংগা নদীর মোহনা এত প্রশস্ত ছিল যে, সুন্দরবন হইতে চাটগাঁ পর্যন্ত সবটুকু স্থানেই গংগানদীর মোহনা বিস্তারিত ছিল। এই প্রশস্ত মোহনায় আর কোনও স্থান চাটগাঁর মতো বন্দর হইবার উপযোগী ছিল না। বংগোপসাগরের উপকূলে পাহাড়-পরিবেষ্টিত এমন সুন্দর ও নিরাপদ জায়গা আর ছিল না।

অতএব দেখা গেল, চাটগাঁ প্রাচীন বন্দর। কত প্রাচীন তা বলা অবশ্য কঠিন। তবে এ বন্দর যে বাংলাদেশের সমবয়সী, সে কথা নির্ভয়ে বলা চলে। বয়স ও সমৃদ্ধির দিক দিয়া চাটগাঁ দুনিয়ার অভিজাত বন্দরসমূহের অন্যতম, এটাও ইতিহাসেরই কথা। আগেই বলিয়াছি ঐতিহাসিকদের সর্বসম্মত রায় এই যে, খৃষ্টপূর্ব দুই শতক হইতেই এয়মন ও বাবিলনীয় অঞ্চলের আরবরা চীন ও ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের সহিত ব্যবসা-বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকারী ছিল। সিংহল, মালাবার, কালিকট, চাটগাঁ, জাভা, সুমাত্রা, মালয় ও ক্যান্টনে ইহাদের বাণিজ্যিক একাধিপত্য ছিল। সেই সময় হইতে

www.pathagar.com

পনর শতকে ওলন্দাযদের আগমন পর্যন্ত সে একাধিপত্য অটুট ছিল। চাটগাঁ এই ভাবে দুই হাজার বছরের অধিককাল পর্যন্ত দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বন্দররূপে পরিগণিত ছিল এবং পশ্চিমে আরব, আবেসিনিয়া, এয়মন, আসিরিয়া, গ্রীস ও রোম এবং পূর্বে চীনের মধ্যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পরিচালনা করিত। এই দুই হাজার বছরের সুদীর্ঘ মুদ্দতে চাটগাঁ অনেকবার হাত বদল হইয়াছে। হিন্দুদের হাত হইতে বৌদ্ধদের হাতে, বৌদ্ধদের হাত হইতে আবার হিন্দুদের হাতে, হিন্দুদের হাত হইতে মুসলমানদের হাতে, মুসলমানদের হাত হইতে আবার বৌদ্ধদের হাতে, বৌদ্ধদের হাত হইতে দ্বিতীয়বার মুসলমানদের হাতে আসিয়াছে। হিন্দুদের আমলে এর নাম ছিল চাটিগ্রাম। বৌদ্ধদের আমলে এর নাম হয় চিটসি-গং। মুসলমানদের হাতে এর নাম প্রথমে হয় সাতগাঁও, পরে ফতেহাবাদ এবং অবশেষে ইসলামাবাদ। তার পরে ১৭৬৬ সালে বাংলার শেষ নবাব মীর কাসিম আলী খাঁ ইংরাজদেরে এই বন্দর উপহার দেন। ইংরাজরা এর নাম রাখে চিটাগং। কিন্তু এইসব পরিবর্তন ও হাত বদলের মধ্যেও চাটগাঁ বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে তার পূর্ব গৌরব বরাবর অটুট-অক্ষুণ্ন রাখে। ষোল শতকের শেষ দিকে সম্রাট আকবরের সনদ লইয়া ওলন্দাযরা যেদিন চাটগাঁ বন্দরে প্রবেশ করে, সেদিন এই বহু বন্দর দর্শী ওলন্দাযরাও চাটগাঁকে 'পোর্টা গ্র্যাণ্ড', মহান বন্দর, বলিয়া উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন জানাইয়ছিল।

কিন্তু বাণিজ্য-কেন্দ্র বন্দর হিসাবে চাটগাঁর গৌরব আলোচনা আমার এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। আমার আলোচ্য আরও গভীর। পাক-বাংলার ধর্ম-কৃষ্টিক জাতীয় জীবনের উন্মেষ বিকাশ ও পরিণতির ক্ষেত্রে চাটগাঁর যে বিপুল অবদান, সে কথা বলাই এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। আমার প্রতিপাদ্য এই যে, পাক-বাংলার কৃষ্টিক পটভূমি হিসাবে চাটগাঁর ভূমিকা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি অবিস্মরণীয়।

৪.

দুনিয়ার যে-সব বন্দর শহর রাজধানী না হইয়াও, সোজা কথায় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী না হইয়াও, জাতির জীবনে রাজধানীর চেয়ে অধিক প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, চাটগাঁ তাদের মধ্যে অন্যতম প্রধান। বস্তুত চাটগাঁ বন্দর শুধু চাটগাঁ শহর ও যিলাকে নয়, তার নিকট ও দূরবর্তী সমস্ত হিন্টারল্যাণ্ড যথা : আরাকান, বাংলা ত্রিপুরা, কাছাড় ও আসামকে ধর্ম-কৃষ্টিতে প্রভাবিত করিয়াছে। কিভাবে, সে কথাই এখানে সংক্ষেপে বলিতেছি :

প্রধানত দুইদিক হইতে এই প্রভাব ব্যাপ্ত ও বিস্তৃত হইয়াছে। প্রথমত চাটগাঁ বন্দর-পথে ইসলাম বাংলায় প্রবেশ করিয়াছে। দ্বিতীয়ত বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চাটগাঁর দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছে।

ধর্ম বিস্তারের কথাটাই আগে বলি। উপরে বলা হইয়াছে চাটগাঁ বন্দর ইসলামের আবির্ভাবের বহু যুগ আগে হইতেই আরবদের বাণিজ্যিক কলোনী ছিল। চাটগাঁ হইতে সমুদ্র-পথে তারা উত্তর-পূর্ব-পশ্চিমে দেশ-বিদেশে ব্যবসা-বাণিজ্য ত করিতই, তার উপর নদী-পথে মেইনল্যাণ্ডের ভিতরেও বহুদূর পর্যন্ত উজাইয়া যাইত। কর্ণফুলী, মেঘনা, সূর্মা, গংগা ব্রহ্মপুত্র ইত্যাদি মূলনদী এবং ধলেশ্বরী, করতোয়া, তিস্তা, কংস, ইছামতী, শীতলক্ষ্যা ইত্যাদি শাখানদী-পথে যে-সব শহরনগরে যাওয়া সম্ভব ছিল,

www.pathagar.com

সে-সব জায়গাতেও আরবরা নৌকাযোগে ব্যবসা-বাণিজ্য করিত। চাটগাঁ বন্দর-শহর প্রায় সম্পূর্ণরূপে আরব সওদাগরদের বসতি স্থান ছিল। শহরের নাগরিক ও মিউনিসিপ্যাল কর্তৃত্ব তাদের হাতেই ছিল এবং তারা তা যোগ্যতার সহিত পালনও করিত। দেশের ভিতরে বড়-বড় নগর-শহরেও বহু আরব সওদাগর একরূপ স্থায়ীভাবেই বসবাস করিতেন। স্বাধীনতার আগে আমাদের দেশে রাজপুতনার মাড়োয়ারী ও কচ্ছ-সুরাটের ময়মনরা যেমন আমাদের যিলা শহর হইতে শুরু করিয়া সমস্ত বড়-বড় বাজার-বন্দরগুলিতে ছড়াইয়া ছিলেন, খৃষ্টীয় সাতই শতকে ইসলামের আবির্ভাবের সময় পর্যন্ত বাংলার শহর-নগরের আরব সওদাগরদের অবস্থাও তাই ছিল। সাতই শতকের গোড়ার দিকে আরবের মক্কা নগরীতে ইসলামের আবির্ভাব হয়। এই শতকের প্রথমার্ধেই ইসলাম আরব দেশে জনপ্রিয় ধর্মে পরিগণিত হয়। আরব জাতির মধ্যে ইসলাম জনপ্রিয় হওয়ার সাথে-সাথেই বিদেশে ব্যবসা-রত সমস্ত আরবরাই স্বভাবতই নিজের দেশের এই নয়া ধর্মে আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। এইভাবে সাত শতক শেষ হইবার আগেই বাংলায়, বিশেষত চাটগাঁ বন্দরে, ব্যবসায়-রত সমস্ত আরবরা ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইয়া যায়। এটা ত গেল আরব ব্যবসায়ীদের কথা। বাংলার জনগণের অবস্থা তখন কি?

আগেই বলিয়াছি, বাংলার জনসাধারণ প্রধানত দ্রাবিড় জাতীয়। দ্রাবিড়রা আদিতে সেমেটিক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। এরা বাবিলন অঞ্চল হইতে ইরান, মাকরান ও সিন্ধু হইয়া দক্ষিণ ভারতের মালাবার অঞ্চল দিয়া বাংলায় আসে, এ কথাও আগেই বলিয়াছি। এদের মধ্যে সেমেটিকদের রক্ত প্রবাহিত হইতেছিল। মনের দিক দিয়া কাজেই এরা স্বাধীনতা-প্রিয় সাম্যবাদী। এই কারণেই বাংলার হিন্দুরা ধর্ম-বিশ্বাসে ওয়ারিসী আইনে ও পূজা-পার্বনে উত্তর ভারতীয় আর্যহিন্দু হইতে অনেকখানি স্বতন্ত্র। এরা বর্ণাশ্রমী আর্য ধর্মের দ্বারা সম্পূর্ণ প্রভাবিত হয় নাই। এরা এই সময়ের বৌদ্ধ ধর্মের সাম্য ও গণতান্ত্রিক মতে প্রভাবিত ছিল। ইসলাম ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্মের মতই সাম্যবাদী, কিন্তু তার চেয়েও সহজ ও বাস্তববাদী। কাজেই সেমিটিক বংশজাত-বাংলার জনসাধারণ অতি সহজেই ইসলাম ধর্মে আকৃষ্ট হইয়া পড়িল। আরব জাতি যোদ্ধা বটে, কিন্তু তার চেয়ে বেশি দক্ষ প্রচারক। ফলে আরবদের নয়া ধর্ম-প্রচার-কৌশল ও স্থানীয় জনসাধারণের উর্বর মনোভাব ইসলাম প্রসারের অনুকূল হইল। সাত শতক শেষ হইবার আগেই বাংলার বহু অধিবাসী মুসলমান হইয়া গেল। আট শতকে ইসলাম যে উত্তরবংগে প্রসারিত ছিল তার আরেকটি প্রমাণ এই যে, রাজশাহী যিলার পাহাড়পুরে খলিফা হারুনর রশিদের আমলের (৭৮৪-৮০৯ সাল) একটি মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। সুতরাং এতে স্পষ্টই প্রমাণিত হইল, বার শতকের শেষ সালে (১১৯৯) বখতিয়ার খিলজীর আগমনের বহু আগেই ইসলাম বাংলায় সুপ্রতিষ্ঠিত ও তিন শ বছরের পুরাতন ধর্ম হইয়া গিয়াছিল। শুধু তাই নয়, মোহাম্মদ-বিন কাসিমের সিন্ধু বিজয়ের (৭০৮-৭১১) সময়েও ইসলাম বাংলায় কমসেকম পঞ্চাশ বছরের পুরান ধর্ম হইয়া গিয়াছে। তাছাড়া মোহাম্মদ-বিন-কাসিমের সময়েই সিন্ধুদেশে ইসলাম প্রচারিত হইয়াছিল, এটা ধরিয়া নেওয়া যাইতে পারে না। কারণ মোহাম্মদ-বিন-কাসিমের রাজত্ব মাত্র তিন বছর স্থায়ী হইয়াছিল। ৭১১ সালে খলিফা ওয়ালিদের মৃত্যুতে সোলেমান সিংহাসনে আরোহণ করেন। পূর্বশত্রুতাবশত তিনি মোহাম্মদ-বিন-কাসিমকে

www.pathagar.com

দামেশ্‌কে ফিরাইয়া নিয়া নানা প্রকার যুলুম করিয়া হত্যা করেন। মোহাম্মদ-বিন-কাসিমের সিন্ধু ত্যাগের পরে-পরেই রাজপুতেরা পুনরায় সিন্ধু জয় করিয়া নেয়। দুই শ বছর রাজপুত শাসন চলার পর ১০২৭ সালে সুলতান মাহমুদ সিন্ধু আক্রমণ করেন, কিন্তু যুদ্ধে জিতিয়াও তিনি স্থায়ীভাবে সিন্ধু দখল করেন নাই। তারপর সুলতান মইযুদ্দিন মাহমুদ ১১৮২ সালে সিন্ধু আক্রমণ করিয়া সিন্ধুর রাজধানী দাইবুল দখল করেন। এই সময় হইতে সুলতানা রাযিয়ার আমল (১২৩৬-৪০) পর্যন্ত এই পঞ্চাশ-ষাট বছরে সিন্ধুতে মুসলিম রাজ কায়েম হয়। কাজেই মোহাম্মদ-বিন-কাসিমের শাসন হইতেই সিন্ধু দেশে ইসলাম প্রচারিত হইয়াছিল, এ কথা ঠিক নয়। এ বিষয়ে এত কথা বলিবার মানে এই যে, পাক-ভারতের পশ্চিম-মধ্য উভয় অঞ্চলেই রাষ্ট্র-শক্তির প্রতিষ্ঠার সাথে যেরূপে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, পাক-বাংলায় ইসলাম প্রতিষ্ঠার গোড়ার কথা তা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। পাক-বাংলায় ইসলামের আগমন হইয়াছিল পশ্চিম পাকিস্তানে ইসলাম প্রচারের প্রায় তিন শ বছর আগে।

এটা ঘটিয়াছিল চাটগাঁ বন্দরের দওলতে এবং তার মধ্য দিয়া। চাটগাঁর এই অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ গৌড়ের সুলতান হোসেন শাহ ১৫২১ সালে চাটগাঁর নাম রাখেন ফতেহাবাদ অর্থাৎ ইসলামের দরজা। ঠিক দেড় শ বছর পরে ১৬৭০ সালে নবাব শায়েস্তা খাঁ চাটগাঁকে আরও বেশি সম্মান দেন এর নাম ইসলামাবাদ রাখেন।

৫.

এটা ত গেল ধর্মের দিক। কৃষ্টি-সাহিত্যের বেলাতেও এই কথাই সত্য। পাক-বাংলার ভাষা-কৃষ্টি-সাহিত্য রাঢ়-বাংলা ও পশ্চিম ভারতীয় অন্যান্য অঞ্চল হইতে স্বতন্ত্র দুই কারণে। এক, এখানকার ভাষা-সাহিত্যে দ্রাবিড়ী ছাপ। দুই, এখানকার ভাষা-সাহিত্যে আরব ও ইসলামের প্রভাব। প্রথমে দ্রাবিড়ী ছাপের কথাটাই বলা যাক। পাক-বাংলার বিশেষত চাটগাঁ, কুমিল্লা, নোয়াখালী ও পার্শ্ববর্তী এলাকার ভাষা, শব্দ-প্রকরণ উচ্চারণ-ভংগি ও নাচে-গানের গোটা সাংস্কৃতিক পরিবেশে দ্রাবিড়ী ছাপ ও নিদর্শন আজও উজ্জ্বল হইয়া আছে। এই-সব অঞ্চল হইতে সংগৃহীত যে-সব গীতিকা 'পূর্ব-বঙ্গ গীতিকা' নামক গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে, ঐ সব-গানের মধ্যে প্রেমের থনে দুঃসাহসিক যুদ্ধ-বিগ্রহ ও বীরত্বব্যঞ্জক কাহিনীরই প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায় বেশি। এ-সব গীতিকার ভাষায়ও প্রচুর দ্রাবিড়ী শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে। ঐ-সব অঞ্চলের লোক সংস্কৃতিতে যে-সব নৃত্য-গীত প্রচলিত রহিয়াছে, তাতেও প্রচুর দ্রাবিড়ী ছাপ রহিয়াছে। অনেক ভাষা-তাত্ত্বিকের মতে খোদা বংগ শব্দটাও মূল দ্রাবিড় হইতেই উদ্ভূত। পূর্বে আরাকান উত্তরে ত্রিপুরা ও পশ্চিমে বাকেরগঞ্জ ধরিয়া বিচার করিলে দেখা যাইবে, চাটগাঁই এইসব কৃষ্টি-সংস্কৃতির কেন্দ্র ভূমি ছিল।

তারপরে আসা যাক আরব ও ইসলামের প্রভাবের কথায়। আধুনিক যুগের আলোচনাতেও দেখা যাইবে যে, পাক-বাংলার কৃষ্টি-সাহিত্যের ব্যাপারে চাটগাঁয়ের অবদানের তুলনা নাই। এ বিষয়েও চাটগাঁই পাক-বাংলার পটভূমি। অবশ্য সব সভ্য জাতির কৃষ্টির মতই আমাদের কৃষ্টিও ধর্মভিত্তিক। কাজেই যেদিন বাংলার জনগণের মেজরিটি ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে, সে দিন হইতে সারা মুসলিম-বাংলাই ভাবী পাক-বাংলার কালচারের নার্সারি হইয়া উঠিয়াছে। তবু এ ব্যাপারে আমাদের কৃষ্টি-সাহিত্যের

www.pathagar.com

দিশারী ও পটভূমি একমাত্র চাটগাঁই। এর প্রমাণও সুস্পষ্ট।

প্রথমত পাঠান আমলের সব কয়জন বাংগালী কবি যথা : মোহাম্মদ সগীর, দওলত উযির, বাহরাম খাঁ, সৈয়দ সুলতান, খুরশিদ খাঁ, মোহাম্মদ খাঁ, মোযাম্মেল, মোহাম্মদ কবির প্রমুখ সকলের জন্মস্থান ও কর্মস্থান চাটগাঁ।

দ্বিতীয়ত আরাকানের রাজদরবারের বাংগালী বড়-বড় কবিরা যথা : দৌলত কাযী, আলাওল, মাগনঠাকুর ও আবদুল করিম আসলে চাটগাঁরই লোক।

তৃতীয়ত আরাকান ও ত্রিপুরা রাজ দরবারের অন্যান্য কবিরা যথা : দুনা গাযী, শেখ সাদি, আবদুল হাকিম এবং শেরবায প্রমুখ চাটগাঁর লোক না হইলেও চাটগাঁয় কবিদের দ্বারা অনুপ্রাণিত ও প্রভাবিত হইয়াছিলেন।

চতুর্থত, যদিও আরাকানের রাজারা মুসলমান ছিলেন না, ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী, তথাপি ঐ রাজাদের প্রধানমন্ত্রীরা, যুদ্ধমন্ত্রী ও প্রধান সেনাপতিরা, এমন কি ধর্মীয় বিভাগের মন্ত্রীরা (নবরাজ) সকলেই চাটগাঁয়ের মুসলমান ছিলেন। কোরায়েশী মাগন, সোলেমান, মজলিশ খাঁ এবং আশরাফ খাঁর নাম এঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আরাকান রাজাদের উপর এঁদের এত প্রভাব ও প্রতাপ ছিল যে, ঐ-সব রাজার দরবারী কবি ও পারিষদবর্গ সকলেই মুসলমান ছিলেন। ওঁদের প্রভাবে স্বয়ং রাজারাও ধর্মে বৌদ্ধ হইয়াও সিংহাসনে আরোহণ করিবার সময় তাঁরা মুসলিম নাম গ্রহণে গৌরব বোধ করিতেন। রাজা মেং ফালাং সিকান্দার শাহ, মেং বাদিয়াগ্রি সেলিম শাহ, মেং খামাউং হোসেন শাহ উপাধি ধারণ করেন উঁহাদেরই প্রভাবে। নিজেদের ভাষা বাদ দিয়া রাজারা যে বাঙ্গালী কবি ও বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন, এটাও সম্ভব হইয়াছিল চাটগাঁবাসী ঐসব মুসলমান রাজকর্মচারী ও কবিদের অসাধারণ প্রভাবেই।

পঞ্চমত, তৎকালীন ঐ-সব বড়-বড় কবির ব্যবহৃত বাংলায় আরবী-ফারসী শব্দের প্রাচুর্য ছিল স্বাভাবিক কারণেই। সাধারণভাবে পাক-বাংলার, বিশেষভাবে চাটগাঁ ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের, কথ্য বাংলাতেও আরবী শব্দের প্রাচুর্য বলিয়াই কাব্য-সাহিত্যের ভাষাতেও তাই হইয়াছিল। আরবী ও ফারসী ভাষা তৎকালীন দুনিয়ার সমৃদ্ধশালী ভাষা-সমূহের অন্যতম প্রধান ভাষা ছিল। কাজেই আরবী ফারসীর প্রভাবে আমাদের সাহিত্যও উন্নত ও সমৃদ্ধশালী হইয়াছিল। পাক-বাংলার ভাষায় কি শব্দ-সম্পদে, কি বাক্-রীতিতে, কি শব্দ-প্রকরণে, কি পদ-বিন্যাসে, কি ছন্দ-প্রকরণে, কি সন্ধি-সমাসে, কি উপমা-অলংকারে, কি ধাতু-প্রত্যয়ে, কি মুখরেজ-তালাফ্‌ফুযে এবং ব্যকরণ ও ভাষা-রীতিতে আরবী-ফারসীর এই প্রভাব পড়িয়াছে বলিয়া পাক-বাংলার সাথে সংস্কৃত-প্রভাবিত পশ্চিম-বাংলার ভাষার এত পার্থক্য দেখা যায়।

এই পার্থক্যটুকুই আমাদের তাম্বিক নিজস্বতা, কৃষ্টিক স্বকীয়তা। পরাধীন আমলে বাংলা ভাষার ঐ বৈশিষ্ট্যটুকু ধ্বংস করা হয়। তারই ফলে পশ্চিম-বাংলার বাক-বিন্যাস ও উচ্চারণ-ভংগিকে অভিজাত বলিয়া আমরা গ্রহণ করিয়াছি। স্বাধীন জাতীয় পুনর্জাগরণে বাংলাদেশের সে স্বকীয়তার উদ্ধার আমরা করিব না কি?

ঈদুল-ফেতর, ১৯৭২,

www.pathagar.com

বাংলাদেশের জাতীয় আত্মা

জাতীয় আত্মার স্বরূপ

বাংলাদেশ আজ একটা স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। এই হিসাবে তার একটা জাতীয় ব্যক্তিত্ব ও সত্তা আছে নিশ্চয়ই। কিন্তু সেই সংগে তার একটা জাতীয় আত্মাও আছে কি? রাষ্ট্রীয় সত্তায় আমরা একটা নেশন। আমাদের রাষ্ট্র নেশন স্টেট। কিন্তু এটা আমাদের রাষ্ট্রীয় পরিচয়, দৈহিক বর্ণনা, বস্তুগত পরিচিতি। এই পরিচয়ের বাহিরে, এই পরিচিতির উর্ধ্বে ও এই সত্তার গভীরে আমাদের একটা আধ্যাত্মিক, স্পিরিচুয়াল, অস্তিত্ব আছে কি? তার মানে আমাদের একটা জাতীয় আত্মা আছে কি?

এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া ও পাওয়া খুবই আবশ্যক। খুবই কঠিনও যে যুগে পণ্ডিতেরা মানুষের আত্মাতেই বিশ্বাস করিতে চান না, সে যুগে জাতীয় আত্মার কথা বলিতে যাওয়া নিঃসন্দেহে দুঃসাহসিক কঠিন কাজ। তবে ভরসা এই যে, অনেক রাষ্ট্র-বিজ্ঞানীর মতে ন্যাশনালিজম একটা স্পিরিচুয়াল কন্‌সেপশন। এই হিসাবে প্রত্যেক নেশনের একটা স্পিরিচুয়াল অস্তিত্ব বা আত্মা থাকার কথা। এই ধারণা যেমন স্বাভাবিক তেমনি বস্তুনিষ্ঠ। ইণ্ডিভিজুয়াল বা ব্যষ্টির ব্যক্তিত্বের বা পার্সন্যালিটি ও জাতীয় স্বকীয়তা বা ন্যাশনাল আইডেন্টিটি আছে। এটা মানিয়া নিতে কারও আপত্তি নাই। কারণ রাষ্ট্র বা রাষ্ট্র-জাতি একটা অর্গানিযম, এ সত্য সবাই মানিয়া লইয়াছেন। অর্গানিযম হইলেই যান্ত্রিক ও জৈবিক কারণে তার ইণ্ডিভিজুয়ালিটি বা স্বাতন্ত্র্য থাকবেই, এটাও প্রায় সর্ব-স্বীকৃত কথা। কিন্তু আত্মার কথাটা তেমন সহজও নয়, সর্ব-স্বীকৃতও নয়। কথাটা মেটাফিযিক্যাল বলিয়াই এই দ্বিমত। কিন্তু আমি এই বিতণ্ডায় অবতীর্ণ হইব না। বরঞ্চ আমি ধরিয়া লইব ব্যক্তির জন্য যেমন একটা আত্মার অস্তিত্ব-স্বীকৃতি কল্যাণকর, জাতির জন্যও তাই।

কিন্তু তাতেও আলোচ্য বিষয়টার সংকট মিলে না। বাংগালী জাতির আত্মার সন্ধান পাওয়া তাতেই সহজ হইয়া যায় না। কারণ দুই শ বছরের চিনা বাংলা ছাব্বিশ বছর আগে ভাগ হইয়া গিয়াছে। সেই বিভক্ত বাংলার আজিকার সাড়ে সাত কোটি বাংগালীর জন্যই আমরা নেশনহুডের দাবি করিতেছি। দৃশ্যতই এই সাড়ে সাত কোটি ঐতিহাসিক বাংগালীর অংশ মাত্র, যদিও আমরা বড় অংশ। রেস, গোত্র, এথ্‌নোলজি, নৃতত্ত্ব, ভাষা, খোরাক, পোশাক ও বর্ষগণনা ইত্যাদি দিয়া যে জাতিত্বের বিচার হয়, সে সবের মাপকাঠিতে বাংগালীর সংখ্যা আজ বার কোটি। তবু আমরা বাংলাদেশের সাড়ে সাত

www.pathagar.com

কোটি বাশেন্দা লইয়াই বাংগালী জাতিত্বের দাবি করিতেছি কেন? এ দাবির তাৎপর্য বুঝিতে হইবে। তা বুঝিতে পারিলেই আমরা এই জাতির আত্মার সন্ধান করিতে পারিব।

ব্যাপারটা স্পিরিচুয়াল। তাই বুঝিতে বেগ পাইতে হইবে। স্পিরিচুয়াল হইলেও এটা মেটাফিযিক্স নয়। তাই এটা বোঝা কঠিন হইলেও অসাধ্য নয়। স্পিরিচুয়াল হইলেও জাতীয় আত্মা ধর্মীয় আত্মা হইতে পৃথক। ধর্মীয় আত্মা ও জাতীয় দুইটাই সিম্বলিক হইলেও উভয়েই মধ্যে পার্থক্য মৌলিক। একটা আত্মিক, অপরটা দৈহিক। একটা আইডিয়াল, অপরটা সেকিউলার। একটা ইন্-অর্গানিক, অপরটা অর্গানিক। একটা সত্যনিষ্ঠ, অপরটা বস্তুনিষ্ঠ। একটা হৃদয়ের, অপরটা মস্তিষ্কের।

জাতীয় আত্মা বনাম ব্যক্তি-আত্মা

ব্যক্তির আত্মার সিম্বল ব্যক্তি নিজেই। ব্যক্তিত্বেই ব্যষ্টির আত্মার বর্হিপ্রকাশ। কিন্তু ধর্মীয় আত্মাই হোক আর জাতীয় আত্মাই হোক উভয়টাই সমবেত আত্মা। তেমন আত্মার সিম্বল কি? ধর্ম-দর্শন ও সুফী-আউলিয়া, মুনি-ঋষি; সাধু-সন্ত (সেইন্ট) প্রভৃতি তপস্বীদের মতে মানবাত্মা পরমাত্মারই (ওভারসোল) ক্ষুদ্রতম অংশ। পরমাত্মা (ওভারসোল) হইতেই ব্যক্তি-আত্মার (সোল) আগমন, আবার সেই পরমাত্মাতেই তার বিলয়। 'ইন্না লিল্লাহে ওয়া-ইন্না ইলায়হে রাজেউন'-এ তাঁরা সত্যই বিশ্বাস করেন। এই পরমাত্মাই সকল ট্রুথ, সত্য, হক, এনার্জি, শক্তি ও কুদরতের আধার। ঐ পরমাত্মাই গড, ইলাহি ও ঈশ্বর। সেই পরমাত্মার সন্ধানের সাধনায় যাঁরা সফল হইয়াছেন, তাঁরাই প্রফেট, পয়গাম্বর ও ধর্ম-প্রবর্তক। কাজেই অতি সহজেই বোমা ও বলা যায় যে, ধর্ম-প্রবর্তকরাই ধর্মীয় আত্মার ব্যক্তি-প্রতীক। কোনও এক ধর্ম-সম্প্রদায়ের সকলের সমবেত আত্মা সেই ধর্মের প্রফেটের ব্যক্তিত্বে বিধৃত ও বিকশিত। তিনিই গোটা ধর্ম-সম্প্রদায়ের কলেক্টিভ আত্মার ইমেজ।

কিন্তু জাতীয় আত্মার বেলা কি? কোনও নেশনের জাতীয় আত্মা কি ব্যক্তি-বিশেষের ইমেজের মধ্যে বিধৃত ও বিকশিত হইতে পারে না? নিশ্চয়ই পারে। তা হইতেই হয়। ব্যক্তি-আত্মা ও ধর্মীয় আত্মার মতই জাতীয় আত্মাকেও ইমেজে মূর্ত হইতেই হইবে। ইন্দ্রিয়ে না হইলেও উপলব্ধিতে হইবেই। এবং জাতি মাত্রেরই আত্মা আছে। র্যাশিয়াল জাতিতেও আছে, পলিটিক্যাল নেশনেও আছে। সে আত্মার ব্যক্তি সিম্বলও আছে সেই জাতির ইতিহাসেই। তবে ধর্মীয় আত্মার ব্যক্তি-সিম্বল বা ইমেজ ও জাতীয় আত্মার ব্যক্তি-সিম্বল বা ইমেজের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে। ধর্ম-সম্প্রদায়ের সমবেত আত্মার ব্যক্তি-প্রতীকের সাথে ধর্মানুসারীদের দৈহিক নৈকট্য থাকার দরকার নাই। কারণ সে সম্পর্কের সবটুকুই স্পিরিচুয়াল, ইন্অর্গানিক ও অশরীরী। ধর্মীয় আত্মা ভৌগোলিক সীমা-সরহদ্দের উর্দ্ধে ও বাইরে। কিন্তু জাতীয় আত্মার ব্যক্তি-প্রতীকের সাথে দেশবাসীর দৈহিক সান্নিধ্য থাকিতেই হইবে। কারণ জাতীয় আত্মা অর্গানিক। সে আত্মা বাস করে, ভৌগোলিক সীমার মধ্যে। সে আত্মার ব্যক্তি-প্রতীককেও, কাজেই বাস করিতে হয় দেশের ভৌগোলিক সীমার মধ্যেই।

www.pathagar.com

দুই–একটা নযির লওয়া যাক। বুদ্ধদেব ভারতের লোক হইয়াও চীন–জাপান–বার্মা–ইন্দোচীনের ধর্মীয় আত্মার ব্যক্তি–প্রতীক। হযরত মুসা মিসরের এবং হযরত ঈসা ও হযরত মোহাম্মদ আরবের লোক হইয়াও দুনিয়ার ইহুদী, খৃষ্টান ও মুসলমানদের ধর্মীয় আত্মার ব্যক্তি–প্রতীক। কিন্তু তাঁদের কেউই কোনও জাতি–রাষ্ট্রের আত্মার প্রতীক নন। ঐ ঐ ধর্ম–বিশ্বাসী–প্রধান রাষ্ট্রসমূহের জাতীয় আত্মার প্রতীক সন্ধান করিতে হইবে ঐসব দেশের অতীত–বর্তমান সন্তানদের মধ্যে হইতেই।

এখন বিচার করা যাক, আমাদের নয়া রাষ্ট্র বাংলাদেশের কোনও জাতীয় আত্মা আছে কি না? থাকিলে সে জাতীয় আত্মার ব্যক্তি–প্রতীকও আছেন কি না? থাকিলে সে ব্যক্তি–প্রতীক কে?

দৃশ্যত এসব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন। একটা কারণ আগেই বলিয়াছি। সে কারণ এই যে, ইতিহাসের বাংগালী জাতি দুইভাগে ভাগ হইয়া গিয়াছে। ঐ কথাটারই অপর পিঠটা এখন বলিতেছি। সেটা এই যে, বাংলাদেশের মাটিও ভাগ হইয়া গিয়াছে। এ অবস্থায় যে দেশের মাটি ও মানুষ দুইটাই দ্বিধা বিভক্ত হইয়া গিয়াছে, সে দেশের জাতীয় আত্মাই বা থাকে কি করিয়া? আর সে আত্মার তালাশই বা করিব কোথায়? এসব প্রশ্নের সঠিক উত্তর পাইতে হইলে ব্যাপারটা একটু তলাইয়া বিচার করিতে হইবে।

বাংলা ভাগ হয় নাই

তেমনভাবে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, বাংলার মাটি বা মানুষ কোনোটাই ভাগ হয় নাই। কোনও বস্তু দুই বা ততোধিক ভাগে ভাগ হইবার পর বিভক্ত অংশগুলির উভয়ে পূর্ব নাম ও পরিচয় বজায় রাখিলেই বলা যায় বস্তুটি বিভক্ত হইয়াছে। দেশ ভাগ হওয়া সম্বন্ধেও একথা সত্য। এই অর্থে জার্মানি, কোরিয়া ও ভিয়েৎনাম ইত্যাদি দেশ ভাগ হইয়াছে বলা যায়। কারণ বিভক্ত অংশসমূহ তাদের পূর্ব নাম ও পরিচিতি বহন করিতেছে। ঐসব দেশের মানুষসম্পর্কেও এই কথা সত্য। তারাও তাদের জাতির পূর্ব নাম ও পরিচিতি দাবি করিতেছে। বিশ্ববাসী তা স্বীকারও করিতেছে। কিন্তু বাংলাদেশ সম্পর্কে এ কথা বলা যায় না। ভারতবর্ষ সম্পর্কেও না। ১৯৪৭ সালে ইংরাজ শাসিত ইণ্ডিয়া বাটোয়ারা হইয়া যে দুইটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হইয়াছিল, তাকে ভারত বা ইণ্ডিয়ার দ্বিধা বিভক্তি বলা যায় না। কারণ সে বাটোয়ারায় জার্মানি কোরিয়া ও ভিয়েৎনামের মত ইণ্ডিয়া বা ভারত নামের দুইটি রাষ্ট্র গঠিত হয় নাই। ইণ্ডিয়া বা ভারত নামের একটি রাষ্ট্রই ছিল আগের মতই। শুধু পূর্বেকার ইণ্ডিয়ার কতকাংশ কাটিয়া পাকিস্তান নামে একটি নয়া স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠিত হইয়াছিল। ওটাকে ইণ্ডিয়া বা ভারত বিভক্তি বলা চলে না। পূর্বতন ভারতের সীমা পরিবর্তন ও আকার ক্ষুদ্রকরণ বলা যায় মাত্র।

বাংলাদেশের ব্যাপারটাও তাই। ১৯৪৭ সালে বাংলাদেশে যা ঘটিয়াছিল, সেটা আজকার আলোচনার জন্য অবান্তর। দুই কারণে। প্রথম কারণ ঐ সময়ে বাংলাদেশের

www.pathagar.com

বরাতে যা ঘটিয়াছিল, তা হইয়াছিল এ দেশের মেজরিটির দাবির লাহোর-প্রস্তাবের খেলাফে। দ্বিতীয় কারণ এই যে, লাহোর-প্রস্তাবের সে ব্যতিক্রম এখন দূরীভূত হইয়াছে। বাংলাদেশ আজ লাহোর-প্রস্তাবের দাবি মতই স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হইয়াছে। কাজেই বাংলাদেশের তথাকথিত বিভক্তির বিচার করিতে হইবে ১৯৪৭ সালের রূপ ও চরিত্র দিয়া নয়। আজিকার রূপ ও চরিত্র দিয়া।

এই দিক হইতে বিচার করিলে ১৯৪৭ সালের ঘটনা বাংলা বিভক্তি নয়। সীমা পরিবর্তন মাত্র। সীমা পরিবর্তনে আকার পরিবর্তনও ঘটিয়াছে নিশ্চয়ই। কিন্তু তাকে বাংলা বিভক্তি বলা যায় না। স্মরণাতীত কাল হইতে বাংলার দেহ ও আকারের বহু রূপান্তর ঘটিয়াছে। কখনও বিহার উড়িষ্যা বাংলার সাথে যুক্ত হইয়াছে। কখনো বা রাজমহল, পূর্নিয়া, সিলেট, গোয়ালপাড়া বাংলাদেশ হইতে কাটিয়া নেওয়া হইয়াছে। কোনো-কোনোটা আবার ফেরত আসিয়াছে। এর কোনোটাকেই বাংলা বিভাগ বলা হয় নাই। ১৯০৫ সালের পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশ সৃষ্টিকে বাংলা বিভাগ বলা গেলেও ১৯৪৭ সালের ওটাকে বাংলা বিভাগ বলা চলে না। বাংলাদেশের মাইনরিটি হিন্দুদের স্বাধীন ইচ্ছায় তাদের এক অংশ বাংলাদেশের মাটির খানিকটা অংশ লইয়া বৃহত্তর ভূখণ্ড ভারতে এবং অধিকতর মহান ভারতীয় জাতিতে মিশিয়া গিয়াছে।

এই ঘটনায় বাঙ্গালী জাতিত্বের বরাতে যা ঘটিয়াছে বাংলাদেশের আমিত্ব ও ব্যক্তিত্বের ভাগ্যেও তাই ঘটিয়াছে। কাজেই ব্যাপরটা বোঝা যত কঠিন মনে হয়, আসলে তত কঠিন নয়। ১৯৪৭ সালের বাটোয়ারায় ভারতের 'আমিত্ব' 'ব্যক্তিত্ব' সুতরাং 'জাতিত্ব'ও ভারতেই বিদ্যমান ছিল। তার বিচ্ছিন্ন অংশ 'পাকিস্তান' বা বাংলাদেশে ভারতের সে 'আমিত্ব' বা 'ব্যক্তিত্ব' বা 'জাতিত্বে'র কোনও অংশই আসে নাই। বাংলাদেশের বেলাও তাই ঘটিয়াছে। ব্যক্তির 'আমিত্বের' মতই জাতির 'আমিত্ব' অবিভাজ্য। মানুষের দেহ খণ্ডিত হইলে যে-কোনও খণ্ডের সাথে 'আমিত্ব' যায় না। 'আমার মাথা' আমার হাত' আমার পা' ও 'আমার অন্তরে'র মতই দেশের 'আমিত্ব'ও তার দেহ-খণ্ড হইতে স্বতন্ত্র থাকে। ব্যক্তির মতই দেশেরও 'আমিত্বে'র সাথে থাকে তার আত্মা। এই কারণেই ১৯৪৭ সালের বাটোয়ারায় বাংলার 'আমিত্ব' পড়িয়াছে তৎকালীন পূর্ব-বাংলায়, আজিকার বাংলাদেশে। ঐ সংগে বাংলার জাতীয় আত্মাও আসিয়াছে এখানেই। আজিকার বাংলাদেশই তাই সমগ্র বাংলা। ইতিহাসের বাংলার অতীতের সকল সীমা পরিবর্তনেও যেমন বাংলার 'আমিত্ব' সুতরাং তার আত্মা, আজিকার বাংলাদেশের ভূখণ্ডেই ছিল, আজও তেমনি তার আত্মা এখানেই বিরাজ করিতেছে।

পাঠান আমলের বাংলা

ইতিহাসের পাতা উল্টাইলেই দেখা যাইবে, যে-ভূখণ্ড লইয়া আজ বাংলাদেশ গঠিত, মোটামুটি ও মূলত সেই জনপদই ইতিহাসের বংগ। খৃষ্টীয় চার শতকের গোড়া হইতে এগার শতকের শেষ পর্যন্ত পুণ্ড্র, পাল ও সেন রাজাদের আমলেও এই

www.pathagar.com

ভূখণ্ডের নাম ছিল বংগ। গংগা (ভাগিরথী) নদীর পশ্চিম পারের যে ভূখণ্ডকে আজ পশ্চিম-বংগ বলা হয়, তৎকালে তার নাম ছিল অংগ। ঐ রাজ্য ছিল বরাবর পাটলি-পুত্রের এলাকাধীন বর্তমানের উড়িষ্যা সহ ঐ অংশকে তখন উৎকলও বলা হইত। সেই সময় হইতে ইংরাজ আমলের পূর্ব পর্যন্ত বৌদ্ধ-হিন্দু ও মুসলিম শাসনের মোট দেড় হাজার বছর বাংলার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও কৃষ্টিক কেন্দ্র ছিল মহাস্থানগড়, সোমপুর (পাহাড়পুর), ময়নামতী, রামপাল, বিক্রমপুর, গৌড়, লাখনৌতী, সোনার গাঁ. মুর্শিদাবাদ ও ঢাকা। এ সবই ছিল বিভিন্ন যুগে বাংলাদেশের রাজধানী।

পুরাকালে বাংলাদেশের আকৃতি যাই থাকুক, মুসলিম আমলে ও ইংরাজ আমলে বংগ, কলিংগ, অংগ, পুণ্ড্র, গৌড়, রাঢ় ও উৎকল মিলিয়া একটা যুক্ত দেশ গড়িয়া উঠিয়াছিল। তার মধ্যে মুসলিম-শাসনের ছয়শ' বছরে, বিশেষত মুসলিম আমলের স্বাধীন বাংলাদেশের আড়াই শ' বছরে, হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধের একটা সম্মিলিত জাতি, বর্তমান অর্থের নেশন, প্রায় গড়িয়া উঠিয়াছিল। স্বাধীনতার আমলের তুর্কী আরব ও পাঠান শাসকদের, বিশেষত সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শা ও তাঁর উত্তরাধিকারী সুলতানদের, প্রায় একশ বছরের আমলটা ব্যবসা-বাণিজ্যে ও শিল্প-সাহিত্যে বাংলাদেশের ছিল একটা স্বর্ণযুগ। এই যুগে বাংলাদেশের ব্যবসা-বাণিজ্য পূর্বে মালয়, যাভা, সুমাত্রা, শ্যাম ও চীন পর্যন্ত এবং পশ্চিমে ইস্তাম্বুল,গ্রীস, রোম ও আবিসিনিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ঠিক তেমনি শিল্প-সাহিত্যেও অভূতপূর্ব উন্নতি হয় এই যুগেই। রামায়ণ, মহাভারত ও 'ভাগবত' সংস্কৃত হইতে বাংলায় অনুবাদিত হয় এই সময়ে নবাবদেরই পৃষ্ঠপোষকতা ও অর্থ-সাহায্যে। হলধর মিশ্র; কৃত্তিবাস, কাশীরাম, চণ্ডিদাস, বিদ্যাপতি, মালাধর বসু, বিজয় গুপ্ত,গুণরাজ খাঁ, ধ্রুবানন্দ মিশ্র, কবি কংকন প্রভৃতি কবির জন্ম ও মনসা মংগল, অন্নদা মংগল, বিদ্যা সুন্দর ইত্যাদি বিখ্যাত কাব্য গ্রন্থ রচিত হয় এই মুদ্দতেই। সবার উপর বড় কথা এই যে চৈতন্য দেবের আবির্ভাব হয় এই যুগেই। এখানে শুধু হিন্দু কবি ও ধর্ম পুরুষদের নাম করিলাম। এই যুগে বহু মুসলিম কবিও যে আরবী ফারসী বই রচনা করা ছাড়াও বাংলা-ভাষাতেও অনেক কাব্যগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাঁদের কথা উল্লেখ করিলাম না। কারণ আমার উদ্দেশ্য ঐ যুগের বাংলা ভাষা-সাহিত্যের উন্নতি-প্রগতি দেখান নয়। আমার উদ্দেশ্য, নবাবী আমলে হিন্দু-মুসলিম সহযোগিতার প্রসার-বিস্তার দেখান। শিল্প-সাহিত্যের এই সহযোগিতায় সাম্প্রদায়িক মিলন এমন ঘনিষ্ঠ হইয়াছিল যে, একটি মাত্র দৃষ্টান্তে তার সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়। সে দৃষ্টান্তটি এই যে, চৈতন্যদেবের যে দুইজন শিষ্য ইতিহাসে বিখ্যাত হইয়া আছেন, সেই জগাই-মাধাই সুলতান হোসেন শাহের উযির ছিলেন, তাঁরা ফারসীতে পণ্ডিত ছিলেন এবং পোশাকে-আশাকে সুলতানের উপযুক্ত দরবারী ছিলেন। এটা শুধু শিল্প-সাহিত্যে ও রাজ-দরবারে সীমাবদ্ধ ছিল না। সমাজের ও সরকারের অন্যান্য ক্ষেত্রেও প্রসারিত ছিল। বাংলাদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য হিন্দু-মুসলিম বীরেরা সমবেতভাবে দিল্লী-আক্রমণের সামনে রুখিয়া দাঁড়াইয়াছেন। নবাবী স্তরে রাজনীতিতেও যেমন হিন্দু-মুসলিম সহযোগিতা

www.pathagar.com

স্থাপিত হইয়াছিল, ধর্মের স্তরে আলেম-পণ্ডিত ও সূফী-সাধুদের মধ্যেও তেমনি আধ্যাত্মিক আদান-প্রদান ঘটিয়াছিল। মুসলমানদের সূফীবাদ যেমন হিন্দুদের যোগসন্ন্যাসের অনেক অনুশীলন গ্রহণ করিয়াছে, হিন্দুদের বৈষ্ণববাদও তেমনি ইসলামের সাম্যবাদ, ভ্রাতৃত্ববাদ ও একেশ্বরবাদ বাদ গ্রহণ করিয়াছে। হিন্দুরা যেমন মুসলিম পীর-দরবেশের সম্মান করিত, মুসলমানরাও তেমনি হিন্দু সাধু-সন্ন্যাসীদের সম্মান করিত। হিন্দুদের সত্যনারায়ণ মুসলমানদের সত্যপীর হইয়াছিলেন, না মুসলমানদের সত্যপীর হিন্দুদের সত্যনারায়ণ হইয়াছিলেন, এটা বোঝা কঠিন হইয়াছিল এই উদারতার দরুনই। হিন্দু পণ্ডিতেরা যেমন আরবী-ফারসী ভাষা ও ইসলামী ধর্মশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন মুসলিম আলেমরাও তেমনি সংস্কৃত ভাষায় ও হিন্দু ধর্ম-শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন। ব্যুৎপত্তির জোরে সিলেটের গৌরাংগ ষোল শতকে নবদ্বীপে চৈতন্যদেব রূপে আবির্ভূত হইলেন ইসলাম ধর্মের ভ্রাতৃত্ব ও একেশ্বরবাদ লইয়া। চৈতন্যবাদ হিন্দুদের উপকার কারিয়াছিল দুই দিক হইতে। একদিকে ইসলামের আকর্ষণীয় ও জনপ্রিয় মূলনীতিগুলি গ্রহণ করিয়া হিন্দু ধর্মকে জনপ্রিয় আধুনিক ধর্ম করা হইয়াছিল, অপরদিকে বর্ণাশ্রমের পীড়নমূলক অসাম্যের প্রতিবাদে যে সব হিন্দু ধর্মত্যাগে বাধ্য হইতেছিল, তাদেরে স্বধর্মে ফিরাইয়া রাখিতে পারিয়াছিল। হিন্দুদের মানসিক সান্ত্বনার জন্য বৈষ্ণববাদের এই একেশ্বরবাদকে এবং পরবর্তী কালের রাজা রামমোহনের ব্রাহ্ম ধর্মের একেশ্বরবাদকে বৈদিক একেশ্বরবাদের পুনঃপ্রবর্তন আখ্যা দিয়াছিলেন অনেকেই সংগত কারণেই। সত্য কথা যদিও এই যে বেদের একেশ্বরবাদের সাথে বর্ণাশ্রম-ধর্ম ও ছিল, অথচ চৈতন্যবাদেও ব্রহ্মবাদে বর্ণাশ্রম পরিত্যক্ত হইয়াছিল, তথাপি একেশ্বরবাদের প্রচলন হিন্দু-মুসলিম ধর্মীয় চিন্তার মধ্যে যে নৈকট্য ঘটিয়াছিল, তাতে সন্দেহ নাই। বৈষ্ণববাদের 'সবার উপরে মানুষ সত্য' এই মহাবাক্য ইসলামের আশরাফুল মখলুকাতেরই প্রতিধ্বনি।

মোগল আমলের বাংলা

পাঠান আমলের নির্মিত এই ভিত্তির উপর মোগল আমলের ধর্মীয় উদারতা ও রাজনৈতিক সেকিউলারিযম বাংলার হিন্দু-মুসলিমকে আরও ঘনিষ্ঠ করিয়া তোলে। নবাবদের দরবারে হিন্দু অমাত্য ও হিন্দু রাজা-মহারাজাদের শেরেস্তায় মুসলমান দেওয়ান-আমলা নিয়োগ সুপ্রতিষ্ঠিত নিয়ম হইয়া গিয়াছিল। আরাকানের রোসাং রাজদরবারের রাজ-কবি আলাউল হিন্দী পদ্মাবতীর বাংলা রূপান্তর করিয়াছিলেন। নিজস্ব বৈষ্ণব কবিতাও তিনি রচনা করিয়াছিলেন অনেক। রোসাং রাজ দরবারের বিখ্যাত সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় সৈয়দ মোহাম্মদ খাঁ ও সৈয়দ মুসা খাঁ শুধু আরাকানের রাজাদেরেই মুসলমানী আচার অনুষ্ঠানে, পোশাক-আশাক ও আরবী-ফারসী নাম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেন নাই, নিজেরাও হিন্দু আচার-অনুষ্ঠানে প্রভাবিত হইয়াছিলেন। তাঁরা নিজেরাও 'বসন্ত' ও 'হোলি' উৎসবে যোগ দিতেন। বাংলার নবাব দরবারেও তাই ঘটিত। নবাব সিরাজুদ্দৌলা ও মীর জাফর আলী খাঁ নিজেদের আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-

বান্ধব লইয়া হিন্দুদের হোলি উৎসব উপভোগ করিতেন। হিন্দু রাজা ও অমাত্যদের অনেকেই মুসলমানদের মতো সবুজ পোশাক পরিয়া মোহাররম উৎসবে যোগ দিতেন।

শিল্প-বাণিজ্য ক্ষেত্রে এই হিন্দু-মুসলিম সহযোগিতা বাংলাদেশকে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উন্নত দেশে পরিণত করিয়াছিল। বিশ্ব-বিখ্যাত পরিব্রাজক ইবনে-বতুতা, দিল্লী দরবারের রাজ-কবি আমির খসরু, পর্তুগীজ পরিব্রাজক এডওয়ার্ডো বার্বোসা ও এলডি বার্থেমো, আগ্রার ওলন্দাজ ফ্যাক্টরির চিফ ম্যানেজার ফ্রান্সিস্কো পেলসাবার্ট, ফরাসী চিকিৎসক বার্নিয়ার ও ব্যবসায়ী ট্যাভার্নিয়ার, ইংরাজ পরিব্রাজক রালফ ফিশ, ফিনিশীয় পরিব্রাজক সিয়ার ফ্রেডরিক প্রভৃতি বহু-সংখ্যক বিদেশী প্রত্যক্ষদর্শী দীর্ঘকাল বাংলায় ভ্রমণ ও অবস্থান করিয়াছেন। তাঁরা সকলেই বাংলার অতুলনীয় শিল্প-সম্পদের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। তাঁরা বলিয়াছেন, বাংলার বস্ত্র-শিল্প দুনিয়ার মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। ঢাকার মসলিন বিশ্বের সূক্ষ্মতম সূতী বয়ন-শিল্প। বাংলার রেশম-শিল্প সারা বিশ্বে অতুলনীয়। বাংলার জাহাজ নির্মাণ শিল্প এত উন্নত যে গ্রীস রোম হইতে জাহাজ নির্মাণের অর্ডার আসে বাংলাদেশে। এঁরা সকলে প্রায় এক বাক্যে বলিয়াছেন যে সারা দুনিয়ার সকল প্রয়োজনীয় দ্রব্যের প্রস্তুত ও সরবরাহের সর্ববৃহৎ কেন্দ্র এই বাংলাদেশ।

এই ভাবে চৌদ্দ-পনর শতক হইতে আঠার শতক পর্যন্ত পাঁচ শ বছরের মুদ্দতে রাজনীতিতে, শিল্প-বাণিজ্যে ও ভাষা-সাহিত্যে যে একটা ক্রমবর্দ্ধমান ঘনিষ্ঠতা গড়িয়া উঠিয়াছিল এই অঞ্চলের হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলমানদের মধ্যে, তা শুধু সমাজের উচ্চস্তরে সীমাবদ্ধ থাকে নাই। জনগণের স্তরেও প্রসারিত হইয়াছিল। ফলে তাদের মধ্যে একটা একত্ববোধও নিশ্চয় স্ফুরিত হইয়াছিল। তাতে তদানীন্তন বিশ্বের অন্যান্য দেশের যে ধরনের রাষ্ট্রজাতি বিদ্যমান ছিল, বাংলাদেশেও তেমন একটা জাতি গড়িয়া উঠিতে পারিত। হিন্দু-মুসলিম উভয়েই ততদিনে ভাল-মন্দ দুই কাজেই সহযোগিতা করিতে শিখিয়াছে। দিল্লীর মুসলিম সম্রাট ও মারহাট্টার হিন্দু-বর্গীর বিরুদ্ধে বাংলার হিন্দু-মুসলমান কাঁধে-কাঁধ মিলাইয়া লড়াই করিয়াছে। আবার ক্লাইভের চক্রান্তে হিন্দু-মুসলিম নেতারা ঐক্যবদ্ধভাবেই সিরাজেই বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়া দেশের স্বাধীনতা হারাইয়াছেন।

বাংলার বৈশিষ্ট্য

এটাকে বলা যায় বাংলার বৈশিষ্ট্য। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে ভারতবর্ষে আট শ বছরের মুসলিম-শাসনে শাসক ও শাসিতের মধ্যে বাংলাদেশে যেমন মিশ্রণ, ঐক্য ও সহযোগিতা গড়িয়া উঠিয়াছিল, ভারতের আর কোনও সুবা বা প্রদেশে তেমন ঘটে নাই। আরেকটা বিশেষ লক্ষণীয় ব্যাপার এই যে মুসলিম-শাসনের কেন্দ্র-ভূমি রাজধানী দিল্লী-আগ্রা হইতে বহু-বহু দূরে অবস্থিত হইয়াও বাংলাদেশ একটা মুসলিম-মেজরিটির জনপদ ছিল। মুসলিম শাসকরা রাষ্ট্রের ক্ষমতা বা অস্ত্রের জোর খাটাইয়া ইসলাম প্রচার করিয়াছেন, অথবা অমুসলমান জনগণ রাষ্ট্রীয় সুখ-সুবিধা

www.pathagar.com

ভোগের আশায় পৈতৃক ধর্ম ত্যাগ করিয়া ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে, এই মত ইদানীং মিথ্যা প্রমাণিত ও পরিত্যক্ত হইয়াছে। এই কারণেই বাংলার শাসক-শাসিতের এই অতুলনীয় মিশ্রণ ও বাংলার এই অভূতপূর্ব মুসলিম মেজরিটি, এই দুইটা ব্যাপারেরই ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা হওয়া দরকার। এই সম্পর্কে আমি 'বাংলাদেশের কৃষ্টিক পটভূমি' শীর্ষক প্রবন্ধে যথাসম্ভব বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি। এই প্রবন্ধে তার পুনরুক্তি করিব না। ঐ প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য মাত্র দুইটি তথ্যের দিকে এখানে পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিব। এক, খৃষ্টপূর্ব অন্তত দুই হাজার বছর আগে বাবিলোনীয় সেমিটিক গোষ্ঠীর দ্রাবিড়ী সম্প্রদায় সিন্ধু-পাঞ্জাব হইতে দক্ষিণ ভারত হইয়া বাংলাদেশে আসেন ও বসতি স্থাপন করেন। উত্তর দিক হইতে আগত মংগোলীয়দের সহিত এদের সংমিশ্রণ হয়। এরাই বর্তমান বাংলাদেশের হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলমানদের পূর্ব-পুরুষ। দুই, খৃষ্টপূর্ব দুই শতকে ভারত মহাসাগরে আরব বণিকদের প্রাধান্যের সময় উপকূলীয় অন্যান্য বন্দরের মধ্যে চাটগাঁ বন্দর আরব বণিকদের শ্রেষ্ঠ উপনিবেশ ছিল। ডা. এনামুল হকের মতে এই মুদ্দতে চটগাঁ বন্দর-নগরী উন্নত ও সমৃদ্ধশালী বিশাল জনপদ ছিল। সে নগরে একটি পৌরসভাও ছিল। একজন আরব আমির কর্তৃক এই পৌরসভা শাসিত হইত। এই বন্দর হইতে আরব-ব্যবসায়ীরা বিভিন্ন নদী-পথে উজান দিকে বাংলাদেশ, আরাকান, আসাম ও বিহারের বিভিন্ন নদীবন্দরে ছড়াইয়া পড়িয়াছিলেন। এই অঞ্চলের বাশেন্দা ও আরব-ব্যবসায়ীরা একই সেমিটিক গোত্রের লোক হওয়ায় তাদের সামাজিক মিলনও সহজ ও ত্বরান্বিত হইয়াছিল। এই অবস্থায় আরব ভূমিতে ইসলামের আবির্ভাব হওয়ায় বাংলাদেশ-প্রবাসী আরবরা এবং সেই সংগে স্থানীয় বাশেন্দারাও দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল। এটা ঘটিয়াছিল পশ্চিম-ভারতের সিন্ধুদেশে মোহাম্মদ-বিন-কাসিমের আগমনের অন্তত পঞ্চাশ বছর আগে। বাংলায় মুসলিম মেজরিটির প্রধান কারণ এটাই। ইহা ছাড়া আরও একটি কারণ আছে।

মোগলদের হাতে পাঠানদের ক্রমবর্দ্ধমান পরাজয় সুনিশ্চিত হইবার পর হইতেই বাংলার পল্লী ও সমাজ-জীবনে দুইটা বড় রকমের পরিবর্তন ঘটিতে শুরু করে। এক, পরাজিত ও ছত্র-ভংগ পাঠান সৈন্যেরা আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে শহরাঞ্চল ছাড়িয়া পল্লী গ্রামে আশ্রয় লইতে থাকে। দুই, বিশ্ব ত্রাস তৈমুর লংগের বংশধর মোগলেরা দিল্লীর সিংহাসন দখল করায় উত্তর-পশ্চিম ভারতের বহু সূফী-দরবেশ, আলেম-ফাযেল ও ফকির-কলন্দর প্রাণ ভয়ে সুদূর পূর্ব প্রান্তের মুসলিম প্রধান বাংলাদেশে আশ্রয় লইতেছিলেন। তাঁরাও শহর ছাড়িয়া পাড়া গাঁয়ে আত্মগোপন করিলেন। এই আরব-তুর্কী-পাঠান মুসলমানরা স্বভাবতই জীবিকারূপে কৃষি ও তাঁতের কাজ গ্রহণ করিলেন। এই দুইটা কাজই দুনিয়ার সর্বত্র প্রচলিত বলিয়া দুইটাই তাঁরা জানিতেন। তাই আজও বাংলার মুসলমানদের মধ্যে কৃষক ও তাঁতীর সংখ্যা বেশি। যে সব কাজ তাঁরা জানিতেন না, তা তাঁরা গ্রহণ করেন নাই। এই কারণে মুসলমানদের মধ্যে গোয়ালা, কামার, কুমার হাড়ি-ডোম, মেথর-মুচি মোটেই নাই। এতে এটাও

www.pathagar.com

প্রমাণিত হয়, নিম্ন শ্রেণীর এই সব হিন্দুরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে নাই। এই ভাবে শহরের চেয়ে পল্লী গ্রামেই মুসলমান সংখ্যা বাড়িয়া যায়। ঐ সময়ে বাংলাদেশের বিশাল এলাকা বনে-জংগলে পূর্ণ ছিল। দুঃসাহসী শেখ পাঠানরা এই সব জংলা জমি আবাদ করিয়াছিল। বাংলার মুসলমানরা জংগল কাটিয়া কেমন উর্বরা জমি বাহির করিতে পারে, পরবর্তী কালে আসামে তার প্রমাণ দিয়াছিল। এই কারণে পল্লী-বাংলার মুসলমানদের মধ্যে 'শেখ' ও 'খাঁ' পদবী ও তাদের ভাষায় আরবী ফারসী-তুর্কী শব্দ এত বেশি।

বৈশিষ্ট্যের কারণ

বাংলার হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলিম জনসাধারণের পূর্ব-পুরুষ মূলত দ্রাবিড় হওয়ার কথাটা ইংরাজ আমলের প্রথম হইতেই তলাইয়া যায়। এই সময়ে বাংলার হিন্দু পণ্ডিতদের অনেকে নিজেদেরে আর্য বলিয়া চালাইবার চেষ্টা শুরু করেন। এ সম্বন্ধে একটু পরেই আলোচনা করিতেছি। এখানে শুধু এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে বাংলাদেশের কিছু সংখ্যক ঐতিহাসিক ও সমাজ-বিজ্ঞানী আজ স্বীকার করিতেছেন, বাংলার বাইরের হিন্দুদের সাথে বাঙ্গালী হিন্দুদের মৌলিক পার্থক্য রহিয়াছে। ধর্ম-বিশ্বাস, দেবতার নাম, উপাসনা-প্রণালী আচার-অনুষ্ঠান, ওয়ারিসী আইন, খোরাক-পোশাক এবং মেজাজ-মর্যিতেও বাংলার হিন্দু ও আর্য্য ভারতের হিন্দুদের মধ্যে কোনও মিল নাই। ঐতিহাসিক রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় হইতে শুরু করিয়া স্যার জদুনাথ সরকার, ডা. রমেশ চন্দ্র মজুমদার পর্যন্ত সকলেই এটা স্বীকার করিয়াছেন। ডা. রমেশ চন্দ্র মজুমদার তাঁর 'হিস্টি-অব এনশিয়ান্ট বেংগল' নামক সর্বাধুনিক গ্রন্থের 'অরিজিন-অব-বেংগলিজ' শীর্ষক অধ্যায়ে বাংগালী জাতির আদি কথা লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। এ সম্পর্কে তিনি স্যার বরার্ট রিযূলী, রায়বাহাদুর রমাপ্রসাদ চন্দ, অধ্যাপক প্রশান্ত মহলানবিস ও ডা. বি. এস. গুহ প্রভৃতি নৃতত্ত্ববিদ ও ইতিহাস-বিজ্ঞানীদের পরস্পর-বিরোধী অভিমতের দক্ষ পর্যালোচনা করিয়াছেন। স্যার রবার্ট রিযূলীর অভিমত এই যে সকল ধর্ম-বর্ণের বাংগালীদের আদি পুরুষ দ্রাবিড় ও মংগোলীয়দের মিশ্রণ জাত মানব গোষ্ঠী, যাদের সাথে আর্য্যদের কোনও সংশ্রব নাই। এই মতের প্রতিবাদে রায়বাহাদুর রমাপ্রসাদ চন্দ বলিয়াছেন, বাংলার বর্ণ-হিন্দুরা বৈদিক আর্য্যদের বংশধর নয় বটে তবে তারা পামির মাল-ভূমির অধিবাসী হোমো-আলপিনাস নামে আর্য্যদের এক শাখারই বংশ। নৃতত্ত্ববিদ ডা. বি, এস, গুহ রমাপ্রসাদ বাবুর মতের প্রতিবাদে বলিয়াছেন, মহেঞ্জাদারো ও হরাপ্পায় যে ওমানী-আর্মেনিয়ানরা দীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন, বাংগালীরা তাদেরই বংশোদ্ভূত। অধ্যাপক মহলানবিসের গবেষণার ফল এই যে, নৃতত্ত্বের দিক হইতে বাংলার বাহিরের ব্রাহ্মণদের চেয়ে বাংলার অন্যান্য বর্ণের লোকের সাথেই বাংলার ব্রাহ্মণদের মিল বেশি। তবে বাংলার ব্রাহ্মণদের এক শ্রেণীর সাথে পাঞ্জাবী ও অন্যান্য প্রদেশের উচ্চ শ্রেণীর লোকদের কিছু কিছু মিল রহিয়াছে।

www.pathagar.com

ডা. রমেশ চন্দ্র মজুমদার এই সব মতের তুলনামূলক পর্যালোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে বাংলার বর্ণহিন্দুরা আর্য্যদের বংশধর নহেন। তিনি বলিয়াছেন : "আমরা বহুদিন ধরিয়া বিনাতর্কে এই আত্ম-প্রসাদী বিশ্বাস পোষিয়া আসিতেছিলাম যে আর্য্যরা বাংলা জয় করিয়া এদেশের অসভ্য অধিবাসীদেরে সভ্যতা ও রাষ্ট্রনীতি শিখাইয়াছিল এবং আমরা ব্রাহ্মণরা ও অপরাপর বর্ণহিন্দুরা সেই আর্য্যদেরই বংশধর। কিন্তু আজ এই বিশ্বাসের ভিত্তিহীনতা আমাদের সে আত্মপ্রসাদে প্রচণ্ড আঘাত হানিয়াছে।" ডা. নীহার রঞ্জন রায় 'বাংগালীর ইতিহাস' নামে যে বিশালাকারের গবেষণা-ভিত্তিক পুস্তক লিখিয়াছেন, তাতে তিনি তথ্য-প্রমাণাদি দিয়া এই পার্থক্যের উপর খুবই জোর দিয়াছেন।

পাঠান আমলে সম্রাট আলাউদ্দিন খিলজী সর্বপ্রথম ওলামা প্রভাবমুক্ত রাষ্ট্র পরিচালন শুরু করিয়া যে সেকিউলার রাজনীতির প্রবর্তন করিয়াছিলেন, মোগল আমলে সম্রাট আকবর-জাহংগীরের আমলে যা সজীবতায় দানা বাধিয়াছিল, পশ্চিম উত্তর ভারতের কোথাও তা জনগণের স্তরে সফল না হইলেও বাংলায় তা সফল হইয়াছিল ঐ কারণেই।

ইংরাজ আমলের বাংলা

এই প্রসেসে বাধা ও ভাংগন আসে ইংরাজ আমলের শুরু হইতেই। নয়া শাসকরা খুব স্বাভাবিক কারণেই মুসলমানদেরে দাবাইয়া হিন্দুদেরে টানিয়া তুলিবার সকল প্রকার ব্যবস্থা করেন। তাঁরা চাকরি-বাকরিতে, সহায়-সম্পত্তিতে, ব্যবসা-বাণিজ্যে মুসলমানদেরে তাড়াইয়া হিন্দুদেরে বসাইবেন, এটাও ছিল স্বাভাবিক ও সংগত। কিন্তু এই সংগে তাঁরা ঘোরতর অন্যায় অসংগত একটা পন্থা গ্রহণ করিলেন। সেটা ইতিহাসকে বিকৃত করা। সে বিকৃতি ঘটান হইল মুসলমানদের প্রতি হিন্দুদের মন বিষাইয়া তোলার উদ্দেশ্যে। ছয়শ' বছরের মুসলিম শাসনের ভাল দিকের সাথে কিছু-কিছু খারাপ দিকও ছিল নিশ্চয়ই। ইংরাজরা বাছিয়া-বাছিয়া ঐ সব খারাপ দিকে রং চড়াইয়া ও কল্পনার আশ্রয় লইয়া এমন সব ইতিহাস লিখিলেন যাতে প্রমাণ করার চেষ্টা হইল যে মুসলমানরা হিন্দুর ধর্ম ও হিন্দু নারীর সতীত্ব নষ্ট করিয়াছে। হিন্দুদের ভাষা-সংস্কৃতি ধ্বংস করিবার উদ্দেশ্যে বাংলা ভাষায় আরবী ফারসী শব্দ ঢুকাইয়া তারা ভাষার সতীত্ব নষ্ট করিয়াছে। খৃষ্টান পাদ্রীরা বাংলা ভাষায় প্রচলিত আরবী-ফারসী শব্দ দেখাইবার জন্য ইংরাজীতে বাংলা ভাষার অভিধান রচনা করিলেন। বিশুদ্ধ বাংলায়, মানে সংস্কৃত-বহুল ভাষায়, তাঁরা নিজেরাই সাপ্তাহিক সংবাদপত্র বাহির করিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও মৃত্যুঞ্জয় তর্কালংকারকে দিয়া 'বিশুদ্ধ বাংলা' প্রচলন করিলেন। মোট কথা, হিন্দু-মুসলিম বিরোধ ঘটানোকে ইংরাজরা প্রকাশ্যভাবে সরকারী নীতি হিসাবেই গ্রহণ করিলেন। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে বড়লার্ট লর্ড এলেনবরো বৃটিশ সরকারের নীতি হিসাবে ঘোষণা করিলেন : "মুসলিম রেস্ মূলত আমাদের শত্রু। এ অবস্থায় হিন্দুদেরে সন্তুষ্ট করাই হইবে আমাদের নীতি।' কাজে-কর্মে এই সরকারী

www.pathagar.com

নীতির প্রমাণ পাইয়া ১৮৮২ সালে গোপাল চন্দ্র শাস্ত্রী তাঁর বিখ্যাত 'হিন্দু আইন' নামক পুস্তকের ভূমিকায় লেখেন : 'মহারাণী ভিক্টোরিয়া ডিফেণ্ডার অব হিন্দু ফেইথ।' হিন্দু ধর্ম বৈরাগ্যের ধর্ম। এই ধর্মের উন্নয়নে ইংরাজদের কোন রাজনৈতিক বিপদের কারণ নাই।" প্রসেসটা শুরু হইয়াছিল অনেক আগেই। ১৮১৭ সালে রাজা রামমোহন রায় ডেভিড হেয়ারের সম্মিলিত চেষ্টায় কলিকাতায় প্রথম যে কলেজটি স্থাপিত হইয়াছিল, তার নাম রাখা হইয়াছিল 'হিন্দু কলেজ'। ইংরাজ ঐতিহাসিকদের ইতিহাসের কল্পিত ও অতিরঞ্জিত কাহিনী লইয়া বংকিমচন্দ্র ও রমেশ দত্ত 'ঐতিহাসিক' উপন্যাস লিখিতে লাগিলেন। তাতে তাঁরা হিন্দুদেরে বীর পুরুষ ও মুসলমানদেরে অত্যাচারী কাপুরুষরূপে অংকিত করিলেন। মুসলমানদেরে 'নেড়ে' 'যবন' বলিয়া গাল দিয়া চলিলেন। ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্ত কবিতা রচনা করিয়া এই কাজটিই জনপ্রিয় করিতে লাগিলেন। এটা ত গেল ভাষা-সাহিত্যের কথা। রাজনীতিতেও তাই শুরু হইল। হিন্দু রাজনীতিবিদদের মধ্যে যে নব গোপাল মিত্র মহাশয় 'বাংগালী জাতীয়তাবাদের পিতা' বলিয়া আখ্যাত, তিনি তাঁর রাজনৈতিক সম্মিলনীর নাম রাখিলেন 'হিন্দু মেলা'। বেংগল ল্যাণ্ড-হোলডাস এসোসিয়েশনের মতো নিতান্ত সেকিউলার শ্রেণী-প্রতিষ্ঠানের ইংরাজি মুখপত্রের নাম রাখা হল 'হিন্দু প্যাটিয়ট'। বাংগালী জাতীয়তাবাদের ঠাকুরদাদা (গ্র্যাণ্ডফাদার) বলিয়া পরিচিত রাজানারায়ণ বসু ১৮৭০ সালে 'বেংগল ন্যাশনাল সোসাইটি' নামে যে সমিতি স্থাপন করেন, তাঁর মুদ্রিত 'আদর্শ-উদ্দেশ্যে' লেখা হইল : 'বাংলার হিন্দুদের মধ্যে একতা ও জাতীয়তাবোধ সৃষ্টিই এই সমিতির উদ্দেশ্য।' জনৈক পত্রলেখক সমিতির নামে ও উদ্দেশ্যে এই অসংগতির সমালোচনা করায় 'হিন্দু প্যাটিয়টের' সম্পাদকীয় প্রবন্ধে ঐ পত্র-লেখকের জবাব দেওয়া হইয়াছিল। সে সম্পাদকীয়তে বলা হইয়াছিল : 'বাংলার হিন্দুরা নিজেরাই একটি নেশন। সুতরাং সমিতির নামে ও উদ্দেশ্যে কোনও অসংগতি নাই।' এই মনোভাব মাত্র কয়েক হাজার বছরে হিন্দু জনগণের স্তরে এমন প্রসার লাভ করিয়াছিল যে 'বাংগালী' ও 'ভদ্রলোক' শব্দ দুইটা একান্তভাবে হিন্দু অর্থেই ব্যবহৃত হইতে থাকে। বহু হিন্দু লেখক ও শিক্ষাবিদ নিতান্ত সদুদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়াই বক্তৃতায় বলিতেন ও প্রবন্ধে লিখিতেন : 'আজকাল ভদ্রলোকদের দেখাদেখি মুসলমানদের মধ্যেও শিক্ষা প্রসার লাভ করিতেছে, এটা বড়ই আনন্দের কথা।' পশ্চিম বাংলায় 'বাংগালীপাড়া' ও 'মুসলমানপাড়া' বহুল প্রচলিত শব্দ।

– হিন্দু-চিন্তায় নতুন দিগন্ত

এটা ঘটিবার সংগত কারণও ছিল। সে কারণটাও ছিল দুধারী। এক, বাঙ্গালী হিন্দুর মনে সার্বিক রেনেসাঁ-রিভাইভেলের তীব্র বাসনা। দুই, মুসলিম বিদেশী শাসন মনে করায় তার বিরুদ্ধে বহুদিনের চাপা রোষ-ক্রোধের বিস্ফোরণ। প্রথমটা ছিল স্বাভাবিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা। দ্বিতীয়টায় সাহায্য করিয়াছিল মুসলমানরা নিজেদের আচরণের দ্বারাই। প্রথমটার ব্যাপারে বংকিমচন্দ্র সাহ শক্তিশালী হিন্দু লেখকরা একটা

www.pathagar.com

আধ্যাত্মিক-মানসিক আর্য্য বুনিয়াদ রচনা করিয়াছিলেন। পরিণামে হিন্দু রাজত্বের পুনঃপ্রতিষ্ঠাই 'আনন্দমঠ' রচনার মূল উদ্দেশ্য ছিল বলিয়া স্বয়ং রমেশ চন্দ্র দত্ত 'এনসাইক্লোপিডিয়া বৃটেনিকা'তে লিখিয়াছেন।

পক্ষান্তরে মুসলিম সমাজের উপরের তলার কতিপয় নাইট-নবাব খান বাহাদুর 'বাঙ্গালী মুসলমানের মাতৃভাষা বাংলা নয়, উর্দু, এই শ্লোগান তুলিয়া হিন্দুদের ঐ কাজে সহযোগিতা করিয়াছেন।

এর ফল হইল এই যে আঠার-উনিশ শতকের দেড়শ বছরে ও বিশ শতকের প্রথম দুই দশকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রে-সমাজে, জ্ঞানে-বিজ্ঞানে কৃষ্টি-সাহিত্যে যে বিস্ময়কর উন্নতি সাধিত হইল, তার সবটুকুই ছিল হিন্দুর, মুসলমানের তাতে কোনও শরিকি ছিল না। কাজেই বাংলার হিন্দু ও বাংলার মুসলমান সত্য-সত্যই দুইটি 'জাতিতে' পরিণত হইল। দেশ ও জাতির জন্য যে এটা ক্ষতিকর, হিন্দুদের কেউই যে তা বুঝেন নাই, এবং হিন্দুদের এই মনোভাবের প্রতিবাদ করেন নাই, তা সত্য নয়। নাট্যকার গিরিশ চন্দ্র ঘোষ, ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, রাজনীতিক দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, বিজ্ঞানী আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়—যাঁর তাঁর সময়ে ও এলাকায় এই ভ্রান্ত নীতির তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। কিন্তু বড় বেশি বিলম্ব হইয়া গিয়াছিল। ততদিনে বাংলার ব্যক্তিত্ব, তার স্বকীয়তা ও তার আত্মা হিন্দু হইয়া গিয়াছিল। তবু দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র আশা ছাড়েন নাই। তাঁদের প্রতিবাদ তখনও বাংলার আকাশে-বাতাসে ধ্বনিত হইতেছিল।

ফজলুল হকের আবির্ভাব

এই সময় বাংলার আসল জনতা মুসলমানদের মুখ খুলে। তাদের তরফে মাঠে নামেন ফজলুল হক। দেশবন্ধু ও আচার্য্য রায়ের গলার সুরে সুর মিলাইয়া ফজলুল হক গোটা দেশবাসী জনতার পক্ষ হইতে, বাংগালী জাতির তরফে, কথা বলেন। ১৯১২ সালে সরকারী চাকুরি ছাড়িয়া রাজনীতিতে প্রবেশ করিয়াই তিনি যেন একরূপ উৎপ্রেরণা বশেই বুঝিতে পারেন যে বাংলার জাতীয় প্রতিষ্ঠান হইবে প্রজা-সমিতি। বাংলার জনগণ মানেই প্রজা। বাংগালীকে একটা গণভিত্তিক সংস্থায় সংগঠিত করিবার উদ্দেশ্যে ১৯১৪ সালেই তিনি প্রজা-সমিতি স্থাপন করেন। আগের বছর ১৯১৩ সালে তিনি মওলানা মোহাম্মদ আলীর অনুপ্রেরণায় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগে যোগ দেন। দুইটাই ছিল নিখিল ভারতীয় প্রতিষ্ঠান। তিনি যেন সহজাত বুদ্ধিতেই বুঝিতে পারেন, বাংলার স্বকীয়তা রক্ষা করিতে হইলে বাংলা-কেন্দ্রিক একটা অসাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান অবশ্যই গড়িতে হইবে। তাই পর বৎসরই তিনি প্রজা-সমিতির প্রতিষ্ঠা করিলেন। বাংলার স্বকীয়তা রক্ষার এই প্রয়াসে তিনি চিত্তরঞ্জনের সহযোগিতা পাইলেন।

১৯১৭ সালে বংগীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস সম্মিলনীর সভাপতির ভাষণে চিত্তরঞ্জন দুইটি মূল কথা বলেন : "এক, বাংগালীরা সাত্যিকার অর্থেই একটি নেশন। ভারতীয়

www.pathagar.com

জাতীয়তাবাদ ইউরোপ হইতে ধার করা একটা অভিনব মতবাদ। দুই, বাংগালী নেশনের অবস্থান শহরে নয়, পল্লীতে। গুটিকতক শিক্ষিত লোক নয়, কৃষকরাই আসল বাংগালী জাতি।"

এটা ছিল ফজলুল হকেরও মতো। কাজেই উভয়ে মিলিয়া নিখিল ভারত কংগ্রেসের ঐ সালের কলিকাতা অধিবেশনেই বাংলার জন্য স্বায়ত্তশাসন দাবি করিলেন। প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ভারতীয় অখণ্ডতার বিরোধী, এই যুক্তিতে বালগংগাধর তিলক সে প্রস্তাবের বিরোধিতা করিলেন। কংগ্রেস-সভানেত্রী মিসেস এ্যানি বেসান্ত তিলকের যুক্তি মানিয়া লইয়া স্বায়ত্তশাসনের প্রস্তাবটা বাতিল করিয়া দিলেন। ফজলুল হক ও চিত্তরঞ্জন এর পরের চার বছরও যুক্তভাবে কংগ্রেসের প্রত্যেক অধিবেশনে এই দাবি উত্থাপন করিতে থাকেন। ১৯২১ সালে ফজলুল হক কংগ্রেস ত্যাগ করার পর দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন একাই এই দাবি করিয়া চলেন। ১৯২৩ সালে 'বেংগল প্যাক্ট' করিয়া তিনি বাংগালী জাতির ঐক্য রক্ষার সক্রিয় চেষ্টা করেন। নিখিল ভারত কংগ্রেসকে দিয়া এই প্যাক্ট অনুমোদন করাইবার জন্য পরপর দুই বছর চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হওয়ায় ১৯২৫ সালে দেশবন্ধু মনক্ষুণ্ন ও ভগ্ন-হৃদয় হইয়া পরলোকগমন করেন।

দেশবন্ধুর মনক্ষুণ্ন হইবার কারণ ছিল। বাংলার হিন্দু নেতৃত্বে তখন তিনি ছাড়া বাংলার স্বকীয়তায়, স্বাতন্ত্র্যে ও বাংগালী জাতীয়তায় বিশ্বাসী আর কেউ ছিলেন না। এটা ছিল সত্যই বিস্ময়কর। যে হিন্দু বাংলার সার্বিক নেতৃত্ব বিগত পঞ্চাশ বছর ধরিয়া বাংলার স্বকীয়তা, স্বাতন্ত্র্য ও বাংগালী জাতীয়তার কথা তারস্বরে বলিয়া এবং জোরালো ভাষায় লিখিয়া আসিতেছিলেন, ১৯২৫ সালের দিকে তাঁরাই হঠাৎ সে স্বাতন্ত্র্য ও জাতীয়তার কথা ভুলিয়া গেলেন কেমন করিয়া?

কারণটা অসংগত না

উত্তর অতি সোজা। একদিকে স্বরাজ বা স্বায়ত্তশাসনের, মানে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র-ব্যবস্থার, সম্ভাবনা যতই বাস্তবরূপ ধারণ করিতে লাগিল, হিন্দু-শিক্ষিত ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের কাছে এটা ততই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিল যে বাংলাদেশে স্বরাজ-স্বায়ত্তশাসন মানেই মুসলিম প্রাধান্য। অপর দিকে প্রজা আন্দোলন যতই জোরদার হইতে লাগিল, বাংলার সামন্ততন্ত্র ও তার পোষ্যদের কাছে এটা ততই স্পষ্ট হইয়া উঠিল যে জমিদারি উচ্ছেদে বাংলার অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থায় হিন্দু-প্রাধান্যের অবসান ঘটিবে। পৌনে দুই শ বছরের ইংরাজ শাসনে সামজিক, অর্থনৈতিক ও শিল্প-সাহিত্যিক স্তরে বাংলা যে রূপ ধারণ করিয়াছে, গণতন্ত্রের প্রবর্তনে তা আর থাকিবে না। হিন্দু মধ্যবিত্তের বিচারে এটা হইবে কৃষ্টি-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বাংলার অপমৃত্যু। নব গোপাল মিত্র ও রাজ নারায়ণ বসু পরিকল্পিত ও বংকিম চন্দ্র-রূপায়িত বাংলার জাতীয়তার চেহারা নিশ্চয়ই এটা ছিল না।

এই আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষার একমাত্র শোভন উপায় ছিল একটা বৃহত্তর জাতীয়তায় মিশিয়া যাওয়া। এই বৃহত্তর জাতীয়তাই ছিল ভারতীয় জাতীয়তাবাদ। এই জাতীয়তাবাদে হিন্দু-প্রাধান্য সুনিশ্চিত থাকায় বাংলার হিন্দু-সংস্কৃতিও ছিল সেখানে নিরাপদ। ক্ষুদ্রতর 'জাতি' হইতে বৃহত্তর 'জাতিতে' মার্জ করা নিজেই একটা উন্নতি ও

www.pathagar.com

প্রগতি। সুতরাং 'বাংগালী জাতীয়তাবাদ' ছাড়িয়া 'ভারতীয়' জাতীয়তাবাদ' ধরায় বাংলার হিন্দুদের মনের দিক হইতেও বিশেষ বেগ পাইতে হয় নাই।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুর পর বাংগালী হিন্দুর এই জাতীয় স্বকীয়তা বোধের পরিবর্তন রোধ করিবার মতো ব্যক্তিত্ব রাজনীতিকদের মধ্যে আর কেউ ছিলেন না। রাজনীতিতে মধ্যপন্থী হইয়াও যে আশুতোষ মুখার্জী হিন্দু শিক্ষিত সম্প্রদায়কে প্রভাবিত করিতে পারিতেন, তিনিও ঐ সময়ে পরলোকগমন করেন। রাজনীতিকদের বাইরে ও উর্দ্ধে সে দুইটি ব্যক্তিত্ব বাংগালীর চিন্তা প্রভাবিত করিতেন, তার একজন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, অপরজন আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র। একজন কবি, অপরজন বিজ্ঞানী। স্বভাবতই জনপ্রিয়তা ও প্রভাবের দিক হইতে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন প্রফুল্ল চন্দ্রের চেয়ে অনেক বেশি ব্যাপক। এমন রবীন্দ্রনাথ যেখানে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সমর্থক, সেখানে প্রফুল্লচন্দ্রের বাংগালী জাতীয়তাবাদ টিকিতে পারে না। পারে নাই। তবু বাংলার জাতীয় আত্মার সন্ধান করিতে গেলে এই দুই মনীষীর চিন্তার সংগে সম্যক পরিচয় থাকা দরকার।

রবীন্দ্র চিন্তায় বিশালতা

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন একাধারে কবি, গাল্পিক, ঔপন্যাসিক, চিন্তাবিদ ও দার্শনিক। স্বাপ্নিক কবি হিসাবে তিনি রাজনীতিক ব্যাপারেও ক্ষুদ্র তার চেয়ে বিশালতা, সংকীর্ণতার চেয়ে প্রসারতার পক্ষপাতী ছিলেন। 'সোনার বাংলা'কে তিনি ভালবাসিতেন জন্মস্থান কুটির হিসাবে। তাই বলিয়া তাঁর উচ্চমন ও উদার দৃষ্টি সে কুটিরের বন্দী থাকিতে রাজী ছিল না। স্নেহময়ী কোল ছাড়িয়া বৃহত্তর ক্ষেত্রে ছড়াইয়া পড়িবার বৃত্তি এটা। তাই তিনি বাংগালী জাতীয়তাবাদকে কূপমণ্ডুকতা বলিতেন। 'বাংগালী' থাকাটা তিনি 'মানুষ হওয়া'র পরিপন্থী মনে করিতেন। এই স্নেহের মোহের জন্য বংগ-জননীকে তিনি অভিযুক্ত করিয়াছিলেন। যে বাংলা ভাষাকে তিনি বিশ্ব-সাহিত্যের দরবারে উন্নীত করিয়াছেন, তাকেই তিনি আঞ্চলিক ভাষা আখ্যা দিয়া হিন্দীকেই মহাভারতের রাষ্ট্র ভাষারূপে সুপারিশ করিয়াছেন। উদার ও নিরপেক্ষ কবি মনের যোগ্য কথা। নিজের মাকে যতই ভালবাসি, যতই শ্রদ্ধা করি, যতই বড় মনে করি, তাঁকে ত আর রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট প্রাইম মিনিস্টার করার দাবি করিতে পারি না। রাষ্ট্রীয় দেশ হিসাবে রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের, বিশ্ব-সভ্যতা হিসাবে তিনি আর্য্য সভ্যতার এবং জীবন-দর্শন হিসাবে তিনি বেদান্ত দর্শনের প্রবক্তা ছিলেন। দার্শনিকের মতই তিনি লিখিয়াছেন : 'আমরা স্বাধীনতা চাই না, আমরা চাই মুক্তি।' ১৯১৭ সালে আমেরিকা ভ্রমণ কালে তিনি র্যাশিয়াল ও লিংগুয়িস্টিক ন্যাশনালিজমের কঠোর নিন্দা করিয়া বক্তৃতা দিয়াছিলেন। সেজন্য দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ঐ বছর প্রাদেশিক কংগ্রেস অধিবেশনের সভাপতির ভাষণে রবীন্দ্রনাথের ঐ ভক্তির তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাতে রবীন্দ্রনাথের মত পরিবর্তন হয় নাই। স্বাপ্নিক কবি-দার্শনিক হওয়ার দরুন তাঁর কল্পনার ভারত রাষ্ট্রীয় ভারতের চেয়েও বড় ছিল। সেটা ছিল বৃহত্তর ভারত। বিশ্ব-ভারতীই ছিল তাঁর আদর্শ। এই কারণে তাঁর লেখার মহাসাগরে বাংগালী জাতীয়তা কিম্বা তাঁর বিশাল ব্যক্তিত্বে বাংলার জাতীয় আত্মার সন্ধান করা পণ্ডশ্রম মাত্র। বরঞ্চ উদার সত্য-দ্রষ্টার মতই তিনি উপলব্ধি করিয়াছেন : 'বাংলা একটা নয়, দুইটা'।

www.pathagar.com

জীবন–সায়াহ্নে, মৃত্যুর মাত্র দুই বছর আগে, ১৯৩৯ সালে লিখিত 'ভাষা ও সাহিত্য' শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি লিখিয়াছেন : 'বাংলাদেশের ইতিহাস খণ্ডতার ইতিহাস।'

পূর্ব–বংগ ও পশ্চিম–বংগ, রাঢ়–বারেন্দ্রের ভাগ কেবল ভূগোলের ভাগ নয় অন্তরেরও ভাগ। সমাজেরও মিল নাই। এতকাল যে আমাদের বাঙালী বলা হয়েছে, তার সংজ্ঞা হচ্ছে আমরা বাংলা বলে থাকি।' উল্লেখযোগ্য যে এই সময়ে হক মন্ত্রি–সভার কৃষিখাতক আইন, মহাজনি আইন এবং প্রাইমারি সেকেণ্ডারি শিক্ষা আইনের বিরুদ্ধে গোটা বর্ণহিন্দু বাংলা আন্দোলন করিতেছিল। অথচ এই প্রবন্ধেই রবীন্দ্রনাথ জাতিক সত্তার উপর খুব জোর দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন : 'সেই জন্যে মানুষের সব চেয়ে বড়ো আত্মরক্ষা এই জাতিক সত্তাকে রক্ষা করা।' জাতিক সত্তা কথাটার দ্বারা রবীন্দ্রনাথ জাতীয় স্বকীয়তা বা জাতীয় ব্যক্তিত্বের চেয়ে 'জাতীয় আত্মাই' বুঝাইয়াছেন। কারণ তিনি পরে পরেই লিখিয়াছেন : 'এটা তার বৃহৎ আত্মা। এই আত্মিক ঐক্যবোধ যাদের দুর্বল, সম্পূর্ণ মানুষ হয়ে উঠবার শক্তি তাদের ক্ষীণ।' কবির কথাটা খুবই সত্য। কিন্তু তাঁর কল্পিত জাতিক সত্তার আবস্থান ছিল ভারত তীর্থে। সে কথা তিনি বহু আগেই 'ভারত বর্ষের ইতিহাস' প্রবন্ধে সুস্পষ্ট বলিয়া দিয়াছিলেন। তাতে তিনি বলিয়াছেন : "পাঠান–মোগলের শাসন ভারতবর্ষের ইতিহাস নয়, নিশীথ রাতের দুঃস্বপ্ন কাহিনী মাত্র। মাহমুদের আক্রমণ হইতে লর্ড কার্জনের সাম্রাজ্য গর্বোদগার পর্যন্ত ইতি কথাটা ভারতবর্ষের বিচিত্র কুহেলিকা।' পাঠান মোগলদের আগমনকে তিনি বিদেশী আক্রমণ বলিলেও আর্য্য আগমনকে তা বলেন নাই। রবীন্দ্রনাথের ভারত তীর্থ ঐখানে।

বিজ্ঞানাচার্যের হুশিয়ারি

কিন্তু আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মতই হিন্দু–মুসলিম সম্মিলিত বাংগালী জাতীয়তায় বিশ্বাসী ছিলেন। ১৯৩৮ সালে বাংলা আইন পরিষদে হক মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে এক আসন্ন অনাস্থা প্রস্তাব লইয়া দেশময় হৈ চৈ পড়িয়া গিয়াছিল। এমনি এক দিনে আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র সায়েন্স কলেজস্থ নিজের রুমে সমবেত ভক্তবৃন্দকে ঐ অনাস্থা প্রস্তাব অবিলম্বে প্রত্যাহারের চেষ্টা করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। তিনি ভক্তদেরে বলিয়াছিলেন : "এটা সাধারণ রাজনৈতিক পার্লামেন্টারি প্রশ্ন নয়, এটা বাংগালী জাতির ভবিষ্যতের প্রশ্ন। ফজলুল হক বাংলার হিন্দু–মুসলিম ঐক্যের প্রতীক। আমি কংগ্রেসের ইণ্ডিয়ান ন্যাশনালিজম বুঝি না। আমি বুঝি, বাংগালীরা নিজেরাই একটা নেশন। ফজলুল হকই এই ভবিষ্যৎ বাংগালী জাতীয়তার প্রতীক।" ফজলুল হক কেন বাংগালী জাতীয়তার প্রতীক, সে কথা বুঝাইতে গিয়া আচার্যদের বলিয়াছিলেন : "ফজলুল হক মাথার চুল হইতে পায়ের নখ পর্যন্ত খাঁটি বাংগালী। আর সেই সংগে ফজলুল হক মাথার চুল হইতে পায়ের নখ পর্যন্ত খাঁটি মুসলমান। খাঁটি বাংগালীত্ব ও খাঁটি মুসলমানত্বের এমন অপূর্ব সমন্বয়ই ভবিষ্যৎ বাংগালী জাতীয়তার প্রতীক। একমাত্র ফজলুল হকের মধ্যেই আমি তা দেখিতেছি। ফজলুল হক আমার ছাত্র বলিয়াই আমি এ কথা বলিতেছি না। সত্য কথাই বলিতেছি।" এই প্রতীকের মর্যাদার গুরুত্ব বর্ণনায় তিনি বাংগালীকে হুশিয়ার করিয়া বলিয়াছিলেন : একটা মন্ত্রী "সভার প্রতি আস্থা–অনাস্থারা মত রাজনৈতিক মতভেদের জন্য তোমরা এই প্রতীক ভাংগিও না। যদি বাংগালী তেমন ভুল করে, তবে তাদের বরাতে দুঃখ আছে।"

www.pathagar.com

আচার্যদেবের এই হুশিয়ারিতে কর্ণপাত করা হয় নাই। পরিণাম সম্পর্কে তাঁর ভবিষ্যৎ বাণীর সত্যাসত্য বিচারের সময় হয় ত আজো আসে নাই। কিন্তু বাংগালী জাতীয়তার প্রতীক বলিয়াই তিনি ফজলুল হক সম্পর্কে যে উক্তি করিয়াছিলেন, তা সত্য প্রমাণিত হইয়াছিল আচার্যদেবের ভবিষ্যৎবাণীর দুই বছরের মধ্যেই। ১৯৪০ সালে ফজুলল হক মুসলিম লীগ লাহোর-প্রস্তাব পাশ করাইয়াছিলেন। লাহোর প্রস্তাব যে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার স্কিম ছিল, অখণ্ড ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদী মহাপরিকল্পনার থাবা হইতে বাংগালী জাতিকে রক্ষা করার যে উহাই একমাত্র পথ ছিল, ফজলুল হক জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সে দাবী করিয়া গিয়াছেন। নেতাজী সুভাষচন্দ্র ও তাঁর জ্যেষ্ঠ সহোদর শরৎচন্দ্র সহ বেশ কয়েকজন বাংগালী হিন্দু কংগ্রেস নেতা তা স্বীকার করিয়াছেন। ফজলুল হকের স্কিম বাস্তবায়িত করার চেষ্টাও তাঁরা করিয়াছেন। কিন্তু মহাভারতের মহা জাতীয়তার উন্মাদনার উত্তাল তরংগে তাঁদের কণ্ঠস্বর তলাইয়া গেল। ভারত তীর্থের সাগর তীরে বাংলার নৌকাডুবি হইল। গোটা ভারতের চিন্তানায়ক উনিশ-বিশ-শতকের বাংগালী মনীষার প্রতীক নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সর্বসম্মত রায়ে কলিকাতা কেন্দ্রিক পশ্চিম বংগ জননীর সন্তানত্ব বর্জন করিয়া ভারত মাতার সন্তান হইল। 'মুগ্ধ বংগ জননীর' যে সব 'সন্তান' আর 'বাংগালী' থাকিতে চাহিলেন না, তাঁরা 'মানুষ' হইয়া গেলেন।

এই ভাবে সুরেন্দ্র নাথ, বিপিন পাল, আশুতোষ, চিত্তরঞ্জন, শরৎচন্দ্র, সুভাষচন্দ্র ও বিশেষ করিয়া প্রফুল্ল চন্দ্রের দেখা বাংলার 'জাতিত্ব', 'ব্যক্তিত্ব,' 'আমিত্ব,' 'মন ও 'আত্মার' যে জীবন্ত প্রতীক মহাভারতীয় 'জাতিত্ব', 'ব্যক্তিত্ব' ও 'আত্মার' নিঃসীম দিগন্তে হারাইয়া গিয়াছিল, একমাত্র ফজলুল হকের বেলা তা ঘটে নাই। তাঁর বেলা আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্রের ভবিষ্যদ্বাণী অন্তত অংশত সত্য হইয়াছে। ইংরাজ নির্মিত কলিকাতা কেন্দ্রিক শতবর্ষের বেংগলে বাংলার জাতীয় আত্মার সন্ধান না পাইয়া ফজলুল হক যে জীবন সায়াহ্নে হাজার বছরের বাংলায় সে জাতীয় আত্মার সন্ধানে ঢাকায় ফিরিয়া আসিয়াছিলেন, এটা ঘটিয়াছিল স্বাভাবিক কারণেই। ফজলুল হকের রিডিস্ কভার করা এই বাংলাই ইতিহাসের আসল বাংলা। এটাই আদি বাংলা। বৌদ্ধ আমলের বাংলা। হিন্দু আমলের বাংলা। পাঠান মোগল আমলের বাংলা। তারও আগের দুই হাজার বছরের দ্রাবিড় বাংলা। এটা রাজা-বাদশার বাংলা নয়, জনতার বাংলা। এটা দুর্গ কেল্লার বাংলা নয়, মাটির বাংলা। এটা জমিদারের বাংলা নয়, কৃষক প্রজার বাংলা। এটা মদ মাৎসর্যের বাংলা নয়, ডাল-ভাতের বাংলা। ফজলুল হক দেহে মনে এই বাংলার প্রাকৃতিক, দৈহিক ও মানসিক চরিত্রের পরিপূর্ণ প্রতীক। বাংলার মেঘনা-পদ্মা-যমুনার অবিরাম ভাংগা-গড়া, উত্তাল প্রাকৃতিক ঝড়-ঝঞ্ঝা ও বাংলার পলিমাটির নমনীয়তা সার্বিক ও সামগ্রিক রূপে ফজলুল হকের ব্যক্তিত্বে রূপায়িত। তাই ফজলুল হকই বাংলার জাতীয় আত্মার প্রতীক।

২৭শে এপ্রিল, ১৯৭৩।

সমাপ্ত

www.pathagar.com

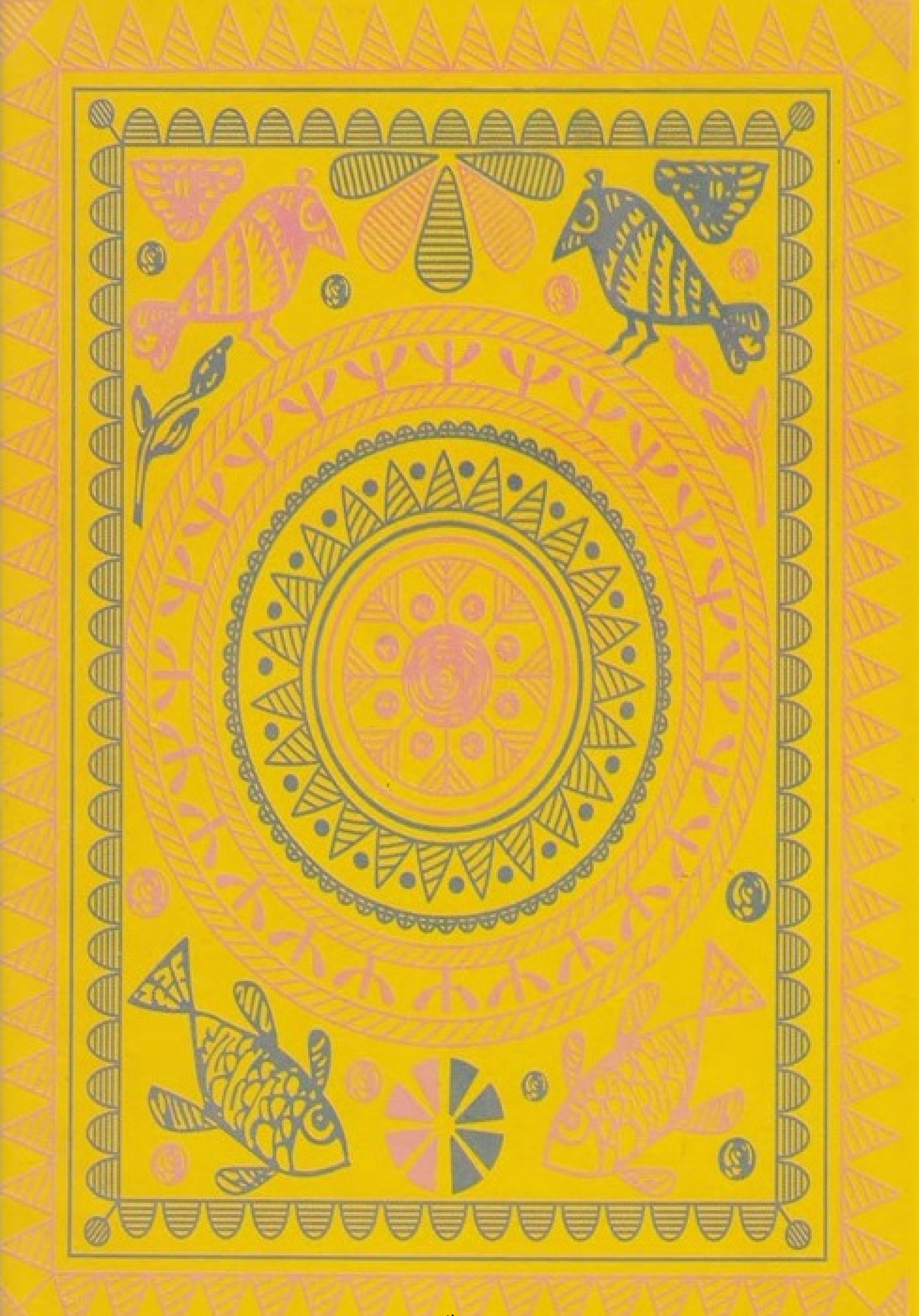

www.pathagar.com